উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

দূরশিক্ষা অধিকার

স্নাতকোত্তর বাংলা

প্রথম সেমেস্টার

আধুনিক বাংলা কাব্য

কোর পত্র – ২০২

পর্যায় – খ

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Postal Address:
The Registrar,
University of North Bengal,
Raja Rammohunpur,
P.O.-N.B.U., Dist-Darjeeling,
West Bengal, Pin-734013,
India.
Phone: (O) +91 0353-2776331/2699008
Fax: (0353) 2776313, 2699001
Email: regnbu@sancharnet.in ; regnbu@nbu.ac.in
Wesbsite: www.nbu.ac.in

First Published in 2019

All rights reserved. No Part of this book may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission in writing from University of North Bengal. Any person who does any unauthorised act in relation to this book may be liable to criminal prosecution and civil claims for damages.

This book is meant for educational and learning purpose. The authors of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the even the Authors has/ have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা

পর্যায় ক

একক ১ - আধুনিক বাংলা কাব্য - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

একক ২ - মেঘনাদবধ কাব্য -মাইকেল মধুসূদন দত্ত

একক ৩ - কবি যতীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা গুলি আলোচনা।

একক ৪ - যতীন্দ্রনাথ ও ভারতী পত্রিকা।

একক ৫ - জীবনানন্দ দাশ- কাব্য যাত্রা।

একক ৬ - জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা

একক ৭ - কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও সুরিয়ালিজম,

আধুনিকতা ও রোমাণ্টিসিজম।

পর্যায় খ

একক ৮ - আধুনিক কবি

একক ৯ - প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

একক ১০ - সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

একক ১১ - বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

একক ১২ - আধুনিক কবি বিষ্ণু দে

একক ১৩ - অমিয় চক্রবর্তী ও আধুনিক কবিতা

একক ১৪ - জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

কোর পত্র ২০২ - আধুনিক বাংলা কাব্য

পর্যায় খ

একক ৮। আধুনিক কবি - প্রেমেন্দ্র মিত্র,সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তী

একক ৯। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা - প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তবিক মনোভাবের প্রকাশ, সাগর থেকে ফেরা, জোনাকি মন,ও ফেরারী ফৌজ কবিতার নামকরনের সার্থকতা ও কবিতার সারমর্ম।

একক ১০। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা - সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র, শাশ্বতী, সৃষ্টির রহস্য, সংবর্ত, প্রতীক্ষা- কবিতার নামকরণের সার্থকতা ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ভিত্তিতে তাঁর কবিতার সারমর্ম।

একক ১১। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা - বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ও কবিতা পত্রিকায় কাব্য সৃষ্টির সাধনা, দয়মন্তী, রূপান্তর, মাছধরা,শিল্পীর উত্তর এবং অনান্য কবিতায় প্রেম ও আধুনিকতার প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব

একক ১২। আধুনিক কবি বিষ্ণু দে - মনস্তাতিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে, বিষ্ণু দে এর কবিতায় ত্রিশ শতকের আধুনিক বিল্পব ঘোড়সাওয়ার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, ও অন্যান্য কবিতার সারমর্ম।

একক ১৩। অমিয় চক্রবর্তী ও আধুনিক কবিতা - শিল্পীত কাব্যিক প্রকাশে অমিয় চক্রবর্তী, সঙ্গতি, বৃষ্টি, মাটি কবিতার সারাংশ ও কবিতায় প্রতীকবাদ এবং ছন্দের ব্যবহার, প্রতীকবাদ, ছন্দ।

একক ১৪। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

একক-৮ আধুনিক কবি

বিন্যাস ক্রম

৮.১ ভূমিকা

৮.২ বুদ্ধদেব বসু

৮.৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র

৮.৪ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

৮.৫ বিষ্ণু দে

৮.৬ অমিয় চক্রবর্তী

৮.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৮.৮ অনুশীলনী প্রশ্ন

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে ত্রিশের কবি বলতে আমরা বিশেষ ভাবে ছয় জন কে বুঝি- জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তী কে। এই কবিরা যেমন অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু কবি রূপে পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিলেন ত্রিশের আগেই, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। কিন্তু সেই পর্বের কবিতায় তাঁদের বস্তুদৃষ্টি, জীবন দৃষ্টি, এবং শিল্প প্রকরণ এমন কোন নিজস্বতা অর্জন করেনি জাতে তাঁদের বলা যায় বাংলা কবিতার নতুন দিশারি।কিন্তু পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে তাঁদের কবিতা অর্জন করেছিল নতুন স্বাতন্ত্র্য। যার ফলে বাংলা সাহিত্যে তাঁদের নাম আধুনিক কবি রূপে। বিশেষ

ভাবে এই পর্বের কবিতা নিয়ে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে। নাম ছিল 'আধুনিক বাংলা কবিতা' এই সংকলনের দুই সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় – উভয়েই একটি করে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছেন।এবং উভয়েই রবীন্দ্র পরবর্তী আধুনিক কবিতার লক্ষন নির্ণয় করেছিলেন নিজের মতো করে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত' হতে সক্ষম ও প্রয়াসী কবিতাই যে আধুনিক কবিতা হয়ে দাঁড়ালো তাতে সংশয় প্রকাশ করা চলেনা। আধুনিক সাহিত্যের যে একটি ভিন্ন চরিত্র গড়ে উঠতে চলেছে তা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।

৮.২ বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

আধুনিক সাহিত্যের যে একটি ভিন্ন চরিত্র গড়ে উঠতে চলেছে তা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সচেতন ছিলেন বুদ্ধদেব বসু।বুদ্ধদেব বসু খাঁটি পূর্ব বাংলার মানুষ। জীবনের প্রথম ২৩ বছর কেটেছে তাঁর নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ঢাকায়। তাঁর বাবা ও মায়ের দিকের সবাই পূর্ব বাংলার। তা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলার যে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সত্তা, তার প্রতি তাঁর কোনো মোহ, সে সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। সে অনাগ্রহ অপ্রকাশ্য নয়_ তাঁর ঘোষিত। পূর্ব বাংলা বলতে পুরো ঢাকাও নয়, তাঁর কাছে পুরানা পল্টন এবং রমনা এলাকা_ যে এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন কৃতী ও খ্যাতিমান ছাত্র। তাঁর ভাষায় : 'পুরানা পল্টনের যে জিনিসটি আমি কখনও ভুলবো না, তা হচ্ছে তার বর্ষার রূপ'। 'পুরানা পল্টন' অথবা 'আমার যৌবনস্বপ্নে সবুজ হয়ে আছে রমনা, ' আমার যৌবন কিংবা 'বাস্তবিক, কী-সুন্দর, এই রমনা, রাতের রমনা! অকর্মণ্য'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নীরদ চৌধুরী বা বুদ্ধদেব বসুর মতামত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ তা বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুকূলে ছিল না। কিন্তু সেজন্য তাঁদের সাহিত্যকীর্তির মূল্য আমাদের কাছে কিছুমাত্র কম নয়।তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বুদ্ধদেব ছিলেন সবচেয়ে পরিশ্রমী ও

বহুপ্রসূ লেখক, মূলত কবি কিন্তু সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই তাঁর বিচরণ স্বচ্ছন্দ। সাহিত্যচর্চা ছিল তার ব্রত_ সাধনার বিষয়; পেশাও নয়, শখও নয়। শুধু নিজে লেখেননি, অন্যদেরকেও লেখালেখিতে দিয়েছেন অকুণ্ঠ উৎসাহ। সমসাময়িক ও অনুজ অনেককে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেছেন। একজন সাহিত্য সংগঠক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল অসামান্য।

যৌবনের শুরুতে বন্ধুবান্ধব মিলে ঢাকা থেকে বের করেছিলেন সাহিত্যপত্র প্রগতি। বাংলা ভাষার মানদণ্ডে প্রগতি যে খুব উন্নতমানের পত্রিকা ছিল, তা নয়। কিন্তু এটি তাঁর প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য স্মরণীয়। বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের 'কুপ্রভাব' থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলাটাও ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ বা ধর্মদ্রোহিতার শামিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রভাবের বাইরে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেওয়াটাও কম বড় সাহসের কথা ছিল না_ যদিও তাঁর সমসাময়িক ও বন্ধুদের কারোই সে শক্তি ছিল না।

শুধু প্রগতি নয়, রক্ষণশীল ও সংকীর্ণমনা সজনীকান্তের শনিবারের চিঠি-র প্রত্যুত্তরে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে ১৯২৯ সালে বের করেছিলেন মহাকাল নামে একটি ক্ষণজীবী পত্রিকা। তবে বয়স্যদের মধ্যে বুদ্ধদেবেরই সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বেশি।

সাহিত্যে সম্পূর্ণ সমর্পিত ছিলেন বুদ্ধদেব। বৈষয়িক বলতে যা বোঝায় তা মোটেই ছিলেন না। একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের নূযনতম যতটুকু প্রয়োজন সেটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। তাঁর কণ্ঠশিল্পী ও কথাশিল্পী সহধর্মিণী প্রতিভা বসু ছিলেন তাঁর 'যোগ্যতমা সঙ্গিনী'। তিনি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেন, 'ঘর-সংসার আমাকেই সামলাতে হতো।' বিত্তবান ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্মরণীয় কীর্তি কবিতা প্রকাশ করতে ব্যয়ে কোনো কার্পণ্য করতেন না। চল্লিশ ও পঞ্চাশের বহু কবিকে প্রতিষ্ঠা দিতে কবিতা-র ভূমিকা বিরাট।

বুদ্ধদেব মূলত কবি। যদিও সাহিত্যের সব শাখাতেই ছিল তাঁর বিচরণ। কৈশোর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি প্রেম বা নারীবিষয়ক কবিতা লিখেছেন অজস্র। তাঁর প্রেমের কবিতা দেহঘনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর কবিতা যৌনতানির্ভর, যেখানে নারীর শরীরই মুখ্য, নারীর অন্য

সব সত্তার মূল্য নেই। তবে তাঁর শরীরী প্রেমের কবিতায়ও তিনি রবীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের বাইরে নূতনত্ব যোগ করতে পারেননি।

মানব-অস্তিত্বের বৈচিত্র্যময় দিকটি তার বিবেচ্য বিষয় ছিল না তাঁর মতো বহুমুখী লেখকের জন্য যা শ্লাঘার বিষয় নয় সীমাবদ্ধতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব কেউই কবি ও কথাশিল্পী হিসেবে কারও থেকে ছোট নন। তাঁর সমসাময়িকরা অনেকেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছেন, জীবনের জটিল বিষয় এসেছে তাঁদের কবিতায়, কিন্তু বুদ্ধদেব থেকে গেছেন একই জায়গায়। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনায় অধিকাংশ মানুষের জীবন বিড়ম্বিত। সুতরাং এই জগৎকে বদলানো দরকার। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা চান পরিবর্তন। পরিবর্তনের জন্য যাঁরা কাজ করেন সেই রাজনৈতিক-সামাজিক নেতাদের তাঁরা তাঁদের লেখায় উৎসাহিত করেন। বুদ্ধদেব একেবারেই তাঁদের বিপরীত। যেমন জীবনবিমুখ বুদ্ধদেবের উচ্চারণ:

জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;
হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।
যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,
আধঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথমা, অজিত দত্তের কুসুমের মাস, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের আমরা বা প্রিয়া ও পৃথিবী এবং বুদ্ধদেবের বন্দীর বন্দনা-র মধ্যে কোনটি বেশি কাব্যগুণসম্পন্ন, তা পাঠক ও সমালোচকেরা বিচার করবেন। তবে সম্মিলিতভাবে বাংলা কবিতায় তাঁরা যোগ করেছেন নতুন মাত্রা।

বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের পরিমাণ বিপুল। তাঁর ভাষা স্নিগ্ধ, চরিত্রের সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত। কবিতার মতো কথাসাহিত্যেও তিনি ব্যক্তিজীবনের চিত্রকর_ সামাজিক জীবনের নয়। সামাজিক জীবনের সমস্যার চেয়ে ব্যক্তির প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা-রিরংসাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য। বুদ্ধদেবেরই সমসাময়িক কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা বাংলা উপন্যাসের দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। তারাশঙ্করের ভাষার দুর্বলতার জন্য সমালোচনা করেছেন বুদ্ধদেব।

কিন্তু পাঠক কর্তৃক তিনিই তো গৃহীত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের গল্প-উপন্যাসও বুদ্ধদেবের চেয়ে বেশি পঠিত। যৌনতা তাঁদের উপন্যাসেও আছে। অচিন্ত্যর বেদে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, '...দুঃখ বোধ করেছি, কোনো কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে, বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনাসক্তি। সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক, এক্ষেত্রেও। ...' কথাটি বুদ্ধদেবের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বুদ্ধদেবের অনুবাদের কাজ অসামান্য এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ফরাসি ভাষায় অভিজ্ঞ কবি অরুণ মিত্র যাই বলুন, বুদ্ধদেবের বোদলেয়ার অনুবাদ বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও। দুই বাংলার পঞ্চাশ ও ষাটের কবিযশোপ্রার্থীদের কাছে বুদ্ধদেবের বোদলেয়ার ছিল বাইবেলের মতো। তাঁর ভূমিকাও রচনা হিসেবে অসামান্য। তা ছাড়া রিলকে, হোয়েল্ডারলিন এবং কালিদাসের অনুবাদও অক্ষয় কীর্তি। যৌনতাবাদী কবি ও কথাশিল্পী ডিএইচ লরেন্সের কিছু কবিতারও তিনি তর্জমা করেছেন। সব অনুবাদই ভালো।

সমালোচক হিসেবে বুদ্ধদেবের অসামান্য খ্যাতি। তাঁর কোনো কোনো সমালোচনামূলক প্রবন্ধ মূল্যবান। তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও উপন্যাস নিয়ে তাঁর যে কাজ 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য' এবং 'কবি রবীন্দ্রনাথ' তা তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁর সব মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতাকে তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তার সপক্ষে শক্ত যুক্তি দাঁড় করাতে পারেননি। ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন মাত্র। বুদ্ধদেবের ভাষায় :'তাঁর রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চলতিকালের জীবন অথবা কথ্য ভাষার আস্বাদ নেই। তাঁর কাব্যের সমগ্র পটভূমি মধ্যযুগ ও পুরাকাল থেকে সংগৃহীত :বাঁশি, ধান, পদ্মফুল ও নৌকো; গেঁয়ো পথ, বটের ছায়া ও মাটির প্রদীপ; রথ, রাজা ও রাজপুরী এ ধরনের সামগ্রী তাঁর রচনায় এমন অজস্র ও পুনরাবৃত্ত যে, এক হাজার পংক্তি পড়ে উঠেও এই তথ্যটা বোধগম্য না-ও হতে পারে যে, কবির অর্ধেক জীবন বিশ শতকে অতিবাহিত হয়েছিলো, এবং একটি বড় অংশ আধুনিক মহানগরগুলিতে। তাঁর মনের মানচিত্রে রঙিন হয়ে আছে ঔপনিষদিক অরণ্য, গুপ্তযুগের

উজ্জয়িনী ও পদ্মাতীরবর্তী বাংলার নিসর্গ, কিন্তু_ স্বল্পসংখ্যক গদ্য রচনা বাদ দিলে তাঁর জন্মস্থল ও পৈতৃক বাসভূমি কলকাতা স্থান পায়নি। তিনি আক্রান্ত হননি আধুনিক নাগরিক জীবনের কোনো চরিত্র লক্ষণে; ... '

বুদ্ধদেব বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ, আর যা-ই হোন, দার্শনিক-কবি নন' এবং একই অনুচ্ছেদে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলি সূত্র বেরিয়ে আসে :ঔপনিষদিক ও বাউল-বৈষ্ণবের দৃষ্টিভঙ্গি, অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদ, উনিশ-শতকী পাশ্চাত্য মানবধর্ম ও রোমান্টিকতা, এমনকি আঠার-শতকী যুক্তিবাদ; বলাবাহুল্য, এর কোনো কোনোটি পরস্পরবিরোধী।'

বুদ্ধদেব ছিলেন অবিচল কমিউনিস্ট ও বামপন্থাবিরোধী। যদিও একটি সময় বামপন্থী প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আরও কয়েকজন অ-বামপন্থীর সঙ্গে। তবে সমাজতন্ত্রবিরোধী হলেও বামপন্থী বা মার্কসবাদী লেখক-কবিদের লেখাকে মূল্য দিয়েছেন। বামপন্থী কবিদের কবিতা 'কবিতা'য় ছেপেছেন। তাঁর কবিতা ভবন থেকে মার্কসবাদী বিষ্ণু দে, সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মনীন্দ্র রায়ের কবিতার বই বের করেছেন। সাহিত্যিক দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন, সব রকম রাজনীতি থেকেই তিনি দূরে থেকেছেন, বাম রাজনীতি থেকে আরও বেশি। তা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালে 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম' এবং 'সোভিয়েত রাশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি' শীর্ষক দুটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ওই সময় 'সভ্যতা ও ফ্যাসিজম'-এ বলেছিলেন :

'একদিকে জার্মানি ও ইটালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ, অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের সাধনা। এই দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড় রকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিলো।'

বুদ্ধদেবের কয়েকটি কাব্যনাট্য রয়েছে। তাঁর কাব্যনাট্য 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম। তবে বন্ধু হিসেবে আবু সয়ীদ আইয়ুব তাকে যে স্থান দিয়েছেন, তার সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধদেবের স্মৃতিকথামূলক রচনা ও ব্যক্তিগত নিবন্ধের সাহিত্যিক মূল্য অসামান্য।

তাঁর কোনো একখানি বই দিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে বিচার করা সমীচীন হবে না। তাঁর বিপুল রচনাসম্ভারে মধ্যে মূল্যবান সাহিত্যকর্মের পরিমাণ কম নয়। তবে তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য শুধু নয়, তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য। আধুনিক বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে ঋণী।

৮.৩ প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

কবি, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, সম্পাদক। জন্ম ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশিতে। পৈতৃক নিবাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বৈকুণ্ঠপুরে। পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র ভারতীয় রেলওয়াতে চাকরি করতেন। মাতার নাম সুহাসিনী দেবী।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কলকাতার সাউথ সাবার্বন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক (১৯২০) পাস করে সাহিত্য-সাধনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। ১৯২৩ সালে প্রবাসীতে ‘শুধু কেরাণী’ ও ‘গোপন চারিণী’ নামে দুটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং গল্প দুটি নিয়ে কল্লোল পত্রিকা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করে। ফলে সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর খ্যাতি বেড়ে যায়। সাহিত্য-সাধনার প্রথমপর্বে তিনি ‘কৃত্তিবাস ভদ্র’ ছদ্মনামে লিখতেন। তিরিশের কল্লোল যুগ যে কয়টি উজ্জ্বল ডিঙ্গা ভাসিয়ে ছিল উজানে, তার মধ্যে একটি অবশ্যই প্রেমেন্দ্র মিত্রের। ওই বিদ্রোহী কালের সর্বশ্রেষ্ট সব্যসাচী বুদ্ধদেব বসু। তারপরই আসে প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এই নামগুলো। এরা সকলেই শিল্পী হৃদয়ের আপন ঐশ্বর্যে কমবেশি ঋদ্ধ করেছেন তাদের দ্রোহচিহ্নিত রচনাবলী।

কল্লোলীয় বিদ্রোহের একটা শক্ত সমর্থ শৈল্পিক প্ল্যাটফর্ম ছিল। সুতরাং বিরুদ্ধাচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই চিরসজীব রোমান্টিক স্বপ্নের উদ্ভাস এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। এ স্বপ্নের রহস্য মধুর পথ ধরে অগ্রসর হয়েই রবীন্দ্রোত্তর যুগের কল্লোল ডিঙ্গা ভরে নিয়ে এসেছিল অদৃষ্টপূর্ব সহিত্যসম্ভার; স্বাদে ও গন্ধে আনকোরা, তরতাজা। সহযাত্রী অন্যান্য লেখকের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও ওই আচ্ছেদ্য রোমান্টিকতার অংশীদার।

বিচিত্র সৃষ্টিশীল রচনার উদ্দাম স্রোতে নেমেছিলেন বিশেষভাবে দুজন বুদ্ধদেব আর প্রেমেন্দ্র। মনের তেজ, সাহস এবং সুরুচি এদের রচনাকে দিয়েছে গভীর ঐশ্বর্য ও

দীপ্তি। তবে খানিকটা লাজুক আর উদাসীন স্বভাবের মানুষ প্রেমেন্দ্র মিত্র কাজ করে গেছেন খুব নিঃশব্দে, অনেকটা জীবনানন্দের মতোই। শিল্পীর নিবৃত অহঙ্কারকে রেখেছেন নিভৃতেই। প্রকাশিত হতে দেননি। কল্লোল পর্যায়ে শুধু যে কবিতার জন্মান্তর ঘটে, তা নয়। কথাসাহিত্য সমেত সাহিত্যের অন্যসব শাখাতেও সংঘটিত হয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বাস্তব গোটা বাংলাসাহিত্যই তখন নবীনতার জোয়ারে স্নান করে উঠেছিল। উত্তররৈখিক ওই সাহিত্য আন্দোলনে মনীষা মিছিলকে একটি নতুন তাৎপর্য দেয়ার লক্ষ্যে সামনের সারির বুদ্ধদেব বসু কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে রকম প্রকাশ্য ভাবচঞ্চল উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ঠিক সেভাবে প্ল্যাটফর্মে আসেননি। তবে ভেতরে ভেতরে তিনি যে তাদের কারও চাইতেই কম আক্রান্ত ও উদ্দীপিত ছিলেন না, তার সাহিত্যকর্মের বিচিত্র বিপুল সমাবেশই তা প্রমাণ করে। শুধু কাব্যকৃতির কথা বিবেচনা করলে তিরিশের সুবিদিত পঞ্চ নক্ষত্রের পাশেই প্রেমেন্দ্রের স্থান। কিন্তু আমার মনে হয়েছে সব্যসাচী প্রতিভা হওয়ার কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবি ইমেজকে কিছুটা খাটো করে দেখা হয়। অবশ্য প্রেমেন্দ্র মিত্র একটা সময় কথাসাহিত্যে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন। কবিতায় তার অপ্রতিরোধ্য লিরিক মেজাজ এবং হৃদয়গ্রহীতা; বলা চলে, বহুজনাদৃত হয়ে উঠতে পেরেছিল। পাশাপাশি কথাসহিত্যে তার যে অসামান্য সিদ্ধি তাতে কবি প্রেমেন্দ্র এবং গল্পকার প্রেমেন্দ্রের মধ্যে কে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই তর্ক উঠতেও খুব বেশি দেরি হয়নি। প্রসঙ্গত, তার ‘পাঁক’, ‘মিছিল’ প্রভৃতি উপন্যাস এবং ‘সাপ’, ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’, ‘শুধু কেরানী’, ‘ভবিষ্যতের ভার’ প্রভৃতি গল্পের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সমকালীন অবক্ষয়, হতাশা ও বেদনার শিল্পশোভন অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় তার সাহিত্যে। বিশেষ করে উপন্যাসে ও ছোটগল্পে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা জরুরী প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন ২৬-২৭ বছরের যুবক তখন (১৯২৮-২৯) মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়কার অর্থনৈতিক ধাক্কা মার্কিনমুলুক ও ইংল্যান্ড ঘুরে ভারতবর্ষের অর্থনীতিকেও আঘাত করেছিল প্রচন্ডভাবে। বিকাশশীল ধনতন্ত্রের অপ্রতিরোধ্য শনিপ্রভাবে ভারতবর্ষে তখন চলছে মর্মান্তিক সঙ্কট। বেকার সমস্যা এবং অকল্পনীয় দ্রব্যমূল্য বিপর্যয় দেখা দেয় চারদিকে; এরপর যে

ধাক্কাটি আরও তীব্রভাবে আঘাত করে তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ যখন শেষ হলো, প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন চল্লিশ পেরিয়েছেন। একজন লেখকের জন্য যৌবন ও মধ্য বয়সের এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ সময়েই সাধারণত তার সম্ভাবনার সব দরজা ধীরে ধীরে খুলে যায়। দেশকালের ওই অস্থির ঘটনাবহুল স্রোতে স্নাত প্রেমেন্দ্র মিত্র। অতএব জীবনকে সমগ্রতার জালে ধরতে চেয়েছিলেন। ফলে একসঙ্গে সাহিত্যের একাধিক মাধ্যমে কাজ করতে পেরেছেন সাধ্য অনুযায়ী। জীবনের গম্ভীর, বিষন্ন চেহারা প্রেমেন্দ্রের গল্পে এমনভাবে ও ভঙ্গিতে উপস্থাপিত যে, পাঠক তাতে সাড়া না দিয়ে পারে না। তার পাত্রপাত্রীরা সময়ের কুটিলতা দ্বারা লাঞ্ছিত। তাদের অসহায়তা দেখে পাঠকের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু পরাজয়ের গ্লানি বা অপরাধবোধ দ্বারা প্রেমেন্দ্রের চরিত্ররা তাড়িত নয়। ধরা যাক, শুধু 'কেরানী' গল্পের টাকা-পয়সাকেন্দ্রিক ট্রাজিক পরিণতির কিংবা 'ভবিষ্যতের ভার' গল্পে হেডমাস্টার সাহেবের অভাবনীয় দারিদ্র্য সঙ্কটের কথা। এসব রচনা লেখকের অনুভূতির প্রাজ্ঞ-প্রকাশ ঘটিয়েছে উজ্জ্বলভাবে। একটি বিশেষ প্রতীতিতে নিজস্ব ভাবনা ও দর্শন যোগ করে। তাকে তাৎপর্যময় করে তোলা, আধুনিক গল্পকারদের জন্য এ এক বড় দায়িত্ব। গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র দায়িত্বটি পালন করেছেন সামর্থ্যমতো এবং বহুলাংশে সফলও হয়েছেন।

কাব্যসাহিত্যে হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনার স্থানই যে সবচেয়ে বড়, জীবনানন্দ দাশই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। কবিস্বভাবের দিক থেকে প্রেমেন্দ্র জীবনানন্দ ঘরানার। কবিতায় বুদ্ধির স্থানকে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ ও অমিয় চক্রবর্তী খুব পাত্তা দিয়েছিলেন। অমিয়র আধ্যাত্মিকতাময়, স্বাধীন শব্দশৈলীর আপাত ঔদাসীন্যে দে'র কবিতায় ভাব-সঙ্গতির কঠিন নিগড়ে তা ঠিকই উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। মূলত হৃদয়বাদী প্রেমেন্দ্র মিত্র; অতএব, যুক্তিনিষ্ঠ শব্দের ধ্বনি মাধুর্যে মুগ্ধ না হয়ে নিজেকে প্রধানত কল্পনাভাবনার সৌন্দর্যে সমর্পিত করেছেন। এজন্য দেখা যায়, স্বরবৃত্ত ঢঙ্গে লেখা তার কবিতাগুলো একই ছন্দে রচিত অমিয় চক্রবর্তীর অনেক কবিতার চেয়ে বেশি মর্মস্পর্শী।

‘হাওয়া বয় শনশন, তারারা কাঁপে/হৃদয়ে কি জং ধরে/পুরনো খাপে!’ (জং, কাব্যগ্রন্থ, ‘সাগর থেকে ফেরা’)

প্রচলিত নৈতিকতাকে আঘাত করতে হবে কিংবা যা কিছু পুরনো তাকেই আক্রমণ করতে হবে। এরকম চরমপন্থীসুলভ বিশ্বাসে আস্থা ছিল না প্রেমেন্দ্র মিত্রের। মুক্ত মানসতার অধিকারী এই সহজ সরল মানুষটি জীবনের কাছ থেকে উপার্জন করেছেন অসম্ভব সহিষ্ণুতা এবং ঔদার্য। ফলে তার কবিকল্পনা শুধুই সহিত্যনির্ভর বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি, তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখা প্রশাখায়ও। তবে ওই সব ক্ষেত্রেও সৃষ্টিশীল কল্পনা ভাবনাকে ছাপিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তিনি গল্পে যেমন বর্ণনার অনাবশ্যক দীর্ঘায়তনের বিরোধী ছিলেন, তেমনি কবিতায়ও মিতকথনের পক্ষপাতী ছিলেন। তার কাব্যে বাকরীতির আশ্চর্য সুন্দর প্রয়োগ অবশ্যই লক্ষ্য করার মতো। ‘নীল! নীল!/সবুজের ছোঁয়া কিনা, তা বুঝি না,/ফিকে, গাঢ়, হরেকরকম কমবেশি নীল।’ (সাগর থেকে ফেরা/ঐ)

একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, ছড়াকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, গীতিকার ও সম্পাদক এই ব্যক্তিটি প্রাণের বিপুল ক্ষুধা মেটাতে গিয়েই এতগুলো সৃজনপ্রবাহের বহু বিপ্রতীপ পাঁকে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। ফলে পরিণত বয়সে একটি বা দুটি সাহিত্য মাধ্যমে প্রবলভাবে নিজেকে লিপ্ত করা তার পক্ষে আর হয়ে উঠেনি। তাছাড়া এতসব শিল্পবীজ একত্রে ধারণ করে সেগুলোকে সতেজ স্বাস্থ্যবান বৃক্ষে রূপান্তরিত করার মতো পরাক্রান্ত প্রতিভা ছিল না প্রেমেন্দ্র মিত্রের। তা সত্ত্বেও কবিতা, ছোটগল্প আর কিশোর সাহিত্যে তার অবদান কম নয়।

তিরিশের বুদ্ধিজীবী চার কবির সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী শিল্পাদর্শ থেকে অনেকখানি সরে এলেও প্রেমেন্দ্র তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘প্রথমা’তেই উল্লেখযোগ্য নিজত্বের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। বইটি কল্লোল যুগের সব লক্ষণই ধারণ করে আছে।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যিক পরিণতি তার কল্পনা-মনীষার সমূহ উৎকর্ষ ফুটে উঠেছে ‘সাগর থেকে ফেরা’ গ্রন্থে। আমার বিবেচনায় এটাই তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতার বই। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি ‘হে পৃথিবী, কোথায় যাবো? ক্লান্ত/আকাশে চা’ই সেখানে উদভ্রান্ত/আমার মন, গহন বন, ফুরায় না।’ এমন চেতনাগভীর, রহস্যাক্রান্ত অথচ অনাড়ম্বর উচ্চারণ আজকের ক’টি কবিতায় পাওয়া যাবে? যারা কবিতা বানায় প্রেমেন্দ্র তাদের দলে নেই; ছিলেন না কখনও। ললিত ছন্দে হৃদয়ের একান্ত গোপন কথাটি তিনি খুব আন্তরিক অথচ উদাসীন ভঙ্গিতে বলে গেছেন। তার কাব্যে এমন এক দূরস্পর্শী সারল্য আছে যে, পড়তে পড়তে আমরাও যেন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাই বৃষ্টিধোয়া দিগন্তের বিস্তীর্ণ নীলে নীলে। সমুদ্রের গভীর কল্লোল নয়, তার কবিতা মনে করিয়ে দেয় হ্রদের শান্ত ঝিলমিল বৈকালিক নীরবতা। জীবন রহস্যের এই সাতিশয় অন্তর্মুখী, অবাক প্রকাশের কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বেঁচে আছেন পাঠকের হৃদয়ে। বেঁচে থাকবেন আরও অনেক অনেক দিন।

৮.৪ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১- ১৯৬০)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০১ সালের ৩০ অক্টোবর কলকাতা শহরের হাতিবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মায়ের নাম ইন্দুমতি বসুমল্লিক। সুধীন দত্তের বাল্যকাল কেটেছে কাশীতে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কাশীর থিয়সফিক্যাল হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। পরে কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ১৯২২ সালে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য ও আইন বিভাগে ভর্তি হন। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর কবিতায় আবেগের চেয়ে প্রজ্ঞা, কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতা এবং ভাবালুতার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহুল পরিমাণে বিধৃত। ফলে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। এর কারণ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানস্থ হওয়া এবং কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও ভাবনা প্রকাশের বাহন করে তোলা। এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘কাব্য সংগ্রহ’র ভূমিকায় লিখেছেন বুদ্ধদেব

বসু, ‘সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো বলে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো বলে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে সে-পর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, ‘‘পরিশ্রমী হও।’’ এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।’

শিক্ষা ও রুচিবোধ যাঁকে মার্জিত ও আবেগের সংহতি দিয়েছে, তাঁর পক্ষে প্রগলভতায় ভেসে যাওয়া দুরূহ। সুধীন দত্তের কবিতায় এমন এক মার্জিত রুচির প্রলেপ ছড়ানো যাকে দুর্বোধ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না, সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাতে হয়। এ কথা সত্য তাঁর কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রীতিপূর্ণ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; যা গড়ে ওঠে দীক্ষিত পাঠকের ক্ষেত্রে।

প্রবুদ্ধি ও হৃদয়াকুতি এ দুয়ের মিথস্ক্রিয়ায় যে কবিতার সৃষ্টি, সে কবিতা পাঠকের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে না কিন্তু চিন্তা জগতে সসুক্ষ্ম অভিঘাত সৃষ্টি করে। তাঁর কবিতা বিশেষভাবে পূর্বকল্পিত সৃষ্টি; কোনোভাবেই আকস্মিক ঘটনা কিংবা তাৎক্ষণিক অনুভূতির তরল প্রকাশ নয়। ‘কবিতার নির্মাণ : সুধীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে অশ্রুকুমার শিকদার উল্লেখ করেছেন, ‘সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন উদ্ভিদের অচিন্তিতপূর্ব নিয়মে সম্পাদিত হয় না। তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি স্থাপত্যের মতো পূর্বপরিকল্পিত। বাস্তুশিল্পী যেমন ব্লুপ্রিন্ট বা নকশা তৈরি করে তারপর সৌধনির্মাণে হাত দেন, তেমনি এই কবির প্রতিটি কবিতার পিছনে আমরা এক পূর্বকল্পনা বা নকশার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইটের মতো শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার এক একটি স্তবক। ন্যায়ের পরম্পরায় সেই স্তবকগুলি সাজিয়ে নির্মিত হয় তাঁর এক একটি কবিতা। কবিতাগুলি যেন সঙ্গীত বেদনায় মুখর এক একটি কক্ষ। অনেকগুলি কবিতা নিয়ে এক-একটি কাব্যসংকলন-

যেন এক-একটি মহাল। সেই সব মহাল নিয়ে এই মহিমাময় কাব্যের সৌধ।'

অশ্রুকুমার সিকদারের এই মূল্যায়ন যথার্থ; কিন্তু ইটের মতো শব্দ সাজিয়ে নির্মাণের যে অভিমত, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এ কথা মেনে নিলে সুধীন্দ্রনাথকে কবিতা বিনির্মাণকলার একজন কৌশলী বলেই মনে হয় এবং প্রকৃত কবির যে বৈশিষ্ট্য ও অভিধা, তা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে প্রজ্ঞার স্মারক করে তুলেছেন। চিন্তাশূন্য কল্পনাবিলাসিতার বিপরীতে অবস্থা নিয়েছে তাঁর কবিতা। সঙ্গত কারণে অপ্রস্তুত পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার রস আস্বাদন অনায়াস-সাধ্য নয়। একথা অস্বীকার যায় না তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মিথ ও পাণ্ডিত্যের সংশ্লেষ। এর অন্য কারণও রয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞান-মনস্ক। প্রমাণ ছাড়া অন্তঃসারশূন্য বিষয়ের প্রতি কোনো মোহ ছিল না। বস্তুসত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপে কবিতা সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কেবল ভাবের জগতে বিচরণ করে, যুক্তিহীন স্বপ্নচারিতায় প্রতিভার অপচয় সময়ের অপব্যবহারে ছিলেন অনীহ। যা কিছু দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাকেই কবিতায় রূপান্তর করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়-আশয় হয়ে উঠেছে খুব তুচ্ছ বিষয়ও, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গির আভিজাত্যে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি। 'উটপাখি', 'কুক্কুট' নিয়ে কবিতা লিখেছেন তেমনি লিখেছেন দর্শন, সমাজ, রাষ্ট্র, অধ্যাত্ম-সংকট নিয়েও। কিন্তু এসব কবিতাকে কোনোভাবেই বিষয়ের অনুগত করে তোলেননি। তাঁর কবিতা যেমন দর্শনে আক্রান্ত নয়, তেমনি ধর্মীয় বাণী প্রচারের অনুষঙ্গও নয়। বরং কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতায় নিখিল নাস্তির সন্ধানও পেয়েছেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শব্দের অনুষঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জড়বাদী দুটি জিনিস তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একটি হচ্ছে তিনি যে নাস্তিক একথা বারবার বলতে চান। এই বলাটা তো কবিতা হয় না। কিন্তু এই বলাটাকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন কবিতায়। ''হয়তো ইশ্বর নেই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ'' বলে তিনি একটা পরিতোষ লাভের

চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি সত্যিই অনাথ কি না এগুলো নিয়ে দার্শনিকরা চিন্তাভাবনা করুন, কিন্তু কবি এগুলো নিয়ে কথা বলবেন এটা ভাবতে আমাদের অসুবিধা লাগে এবং এটা একটা বক্তব্য মাত্র। এ বক্তব্যের নানা রকম প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি কবিতায়।'

সুধীন্দ্রনাথের ঈশর চিন্তা নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান অস্বস্তি বোধ করেছেন। কারণ সুধীন দত্ত যেমন নিখিল নাস্তির জয়গান গেয়েছেন, তেমনি সৈয়দ আলী আহসান আস্তিক্যকে করেছেন শিরোধার্য। ফলে বিশ্বাসের দিক থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর ছিলেন বলেই সুধীনদত্তের দার্শনিক অভিজ্ঞা সৈয়দ আলী আহসান নির্মোহ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে অনীহ ছিলেন। সুধীনদত্তের শিল্প -বা কাব্য সিদ্ধি নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান নিঃসংশয়; কিন্তু আদর্শিক বৈপরীত্যের কারণে তাঁর প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হতে পারেননি। একই রকম অপ্রসন্ন ছিলেন দীপ্তি ত্রিপাঠীও। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক গবেষণা-প্রবন্ধের শুরুতেই লিখেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাঁর কাব্য কোনো আশ্বাসের আশ্রয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় না। সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমনকী আধুনিক কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ যদিও তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয় কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা নৈরাশ্যভারাতুর নয়নে অবলোকন করছেন।' আধুনিক যুগে মানুষের প্রতি মানুষ প্রশ্নহীন আস্থা স্থাপন করতে পারে না বিচিত্র কারণে। জীবন-যাপনে যেখানে অনিশ্চয়তা, যুদ্ধ বিগ্রহে যেখানে মুহূর্তে লাখ -লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, সামান্য কারণে যেখানে মানুষ খুন হয়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের নাগরিকদের পেছনে গুপ্তচর লেলিয়ে দিয়ে রাখে, আণবিক বোমার আঘাতে এক-একটি ভূখন্ড মুহূর্তে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়, যেখানে ঐশীশক্তির কোনো নিদর্শন দেখা যায় না, সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞান-মনস্ক কবি সংশয়ী হবেন; এটাই স্বাভাবিক। সুধীন দত্ত এই স্বভাবের জাতক। 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যের 'হৈমন্তী' কবিতায় লিখেছেন, 'বৈদেহী

বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়'। এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হতাশা আর ভালোবাসার জন্য কাকুতি এবং সবশেষে না-পাওয়া বেদনা। তাঁর মনে হয়েছে, চরাচরে চিরায়ত বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, নেই কোনো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোনো শক্তিও। ফলে তিনি আর 'শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে' সময় ব্যয় করবেন না। এই উপলব্ধি নিছক ধর্মবিদ্বেষ বা আস্থাহীনতা থেকে উদ্ভূত নয়, নয় নাস্তিক্যের চেতনা থেকেও। তাহলে অন্যত্র (চপলা কবিতায়) উচ্চারণ করতেন না, 'জনমে জনমে, মরণে মরণে, / মনে হয় যেন তোমারে চিনি।' নিখিল নাস্তিক বহুজনম বা পুনর্জ বিশ্বাস করবেন কোন ভিতের ওপর নির্ভর করে?

সমাজ-জীবনে সত্য-মিথ্যার অস্তিত্ব আছে; কিন্তু এই সত্য-মিথ্যা আপেক্ষিক, না শাশ্বত? যদি যুক্তিবোধ এবং বাস্তবতার নিরিখে সত্য-মিথ্যা নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে সত্য এবং মিথ্যা দুটি আপেক্ষিক পদ মাত্র; দুটিই সাপেক্ষ পদ। একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। মানবজীবনে এ ধরনের তর্কের সামাজিক কি আর্থিক, কোনো মূল্য নেই। কিন্তু শিল্পের প্রশ্নে বিশেষত কবিতায় সত্য-মিথ্যার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সত্য পরিবর্তনশীল ক্রমবির্ধমান ও সমাজাশ্রয়ী।' অর্থাৎ সত্যের কোনো চিরন্তন রূপ নেই। কবিতায় এ সত্য বা বাস্তবতার প্রসঙ্গ আরও সূক্ষ্মভাবে এসেছে। বাস্তবতা হলো একটি বস্তুকে মানুষ কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে? মানুষের উপলব্ধি এবং বোধের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে কোনো একটি বস্তুর গুণাগুণ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও। কবিতা মানুষের উপলব্ধিজাত বিষয়গুলোর একটি। তাই কবিতার সত্য এবং বস্তুসত্য কোনোকালেই এক ছিল না, এখনো নয়। সময়, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের ধরন সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ। জীবন ও সংসার সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি স্পষ্ট, কিন্তু ওই অভিজ্ঞান প্রকাশে সংশয়ী। ফলে তাঁর চেতনার উপরিতল সম্পর্কে 'নাস্তিপ্রবণ' বলে শনাক্ত করা হয়। মহাশূন্যের দিকে তাকালে তাঁর মনে হয় 'নির্বাক নীল, নির্মম মহাকাশ'। কল্পনাপ্রবণ কবির কাছে নীল যেখানে রোম্যান্টিকতার প্রতীক, বুদ্ধিবাদী কবির কাছে সেখানে কেবল নির্মম। অথচ 'নাম' কবিতায় শুরুতে তাঁকে অস্থির ও অধীর মনে হয়।

কাঙ্ক্ষিতাকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য কালক্ষেপণ করার ধৈর্য নেই তাঁর। কাঙ্ক্ষিতের অভাবে 'অসহ্য অধুনা' এবং 'ভবিষ্যৎত বন্ধ অন্ধকার', ফলে তার 'কাম্য শুধু স্থবির মরণ'। চাওয়ার সঙ্গে সব সময় পাওয়ার সমন্বয় ঘটে না। হয়তো তাই, এই অস্থিরতা। হয়তো এ কারণেই এই উচ্চারণ 'বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত / ক্ষণিক পুষ্পের লোভে।' কিন্তু এ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির নিকট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

৮.৫ বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২)

কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রসমালোচক ও শিল্পানুরাগী। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই কলকাতার পটলডাঙ্গায় তাঁর জন্ম। পিতা অবিনাশচন্দ্র দে ছিলেন অ্যাটর্নি। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে বিষ্ণু দে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ (১৯৩০), সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স (১৯৩২) এবং থেকে ইংরেজিতে এমএ (১৯৩৪) ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে ১৯৩৫ সালে কলকাতার রিপন কলেজে যোগদান করেন। পরে (১৯৪৪-১৯৪৭), মৌলানা আজাদ কলেজ (১৯৪৭-১৯৬৯) ও কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। বাংলা সাহিত্যে একসময় উপেক্ষিত ও বিতর্কিত মার্কসবাদ তিরিশের কবিদের আবেগে মনন যুগিয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ পর্বের কবিরা নিজেদের অ্যান্টি-রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রদর্শন ত্যাগ করে নৈরাশ্যবাদী ভাবধারায় কবিতা চর্চার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসিস্টবিরোধী ভূমিকায় দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বিষ্ণু দেও এ পথে শামিল হন, এ ধারায় ক্রমশ তার শৈল্পিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ রবীন্দ্রবিযুক্তির প্রত্যয়ে বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে যে ভাবাদর্শে তার কাব্যসৌধ নির্মাণ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পশ্চিমা জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং পূর্বসূরি জারিত। তার কবিতার বিমুগ্ধ পাঠে ধরা পড়ে মার্কসীয় মতাদর্শ। সমকালীন যুগযন্ত্রণা এবং আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয় এবং

স্বদেশ চিন্তাও তার কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। বেঁচে থাকার তাগিদে এ পর্বের কবিরা মানুষের মৌলক আকাঙ্খার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা তুলে আনতে সচেষ্ট থেকেছিলেন তাদের কবিতায়। যা বিশ্বসাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃত। তবে মার্কসীয় দর্শনতাড়িত হলেও বিষ্ণু দে নিজে কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি সচেতনভাবেই কবিতায় দর্শন ও বিজ্ঞানের মিশেল ঘটিয়েছেন। তার কবিতায় যেমন আছে নিসর্গ চেতনা তেমনি আছে ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রবল উপস্থিতি। আছে মিথ-পুরানের সফল প্রয়োগ। তৎকালীন ভারতবর্ষে সমাজবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণে সাংস্কৃতিক ধীমানরা বিদেশী সাহিত্যে নিজেদের মুক্তি খুঁজেছিলেন। এ ধারায় অগ্রবর্তী কবি বিষ্ণু দের অধিকাংশ কবিতায় মার্কসীয় আদর্শের তাত্ত্বিক ঘোষণা স্পষ্ট হয়। তিনি মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক চেতনা ভিন্ন মানবিক চেতনার বিজয় অসম্ভব। সুতরাং বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে তার কবিতায় মৃত্যুহীন মানুষের জয়গাঁথা রচিত হয় অনায়াসে- "অমর দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,/ মুঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।/ হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তিদ্বার,/ দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার!"

বিষ্ণু দের স্বদেশপ্রেম একদিকে ঐতিহ্যবাহী অন্যদিকে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী। যা একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে আদর্শিক ভিত্তিতে জনগণতন্ত্রবাদী। তিনি ইতিহাসচেতনার পথে বিশ্বযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূটকৌশল, ঔপনিবেশিক শাসন ও বৈশ্যতান্ত্রিক দোদুল্যমান ভারতীয় মধ্যবিত্তের ভূমিকা বিষয়ক বোধ ও অভিজ্ঞতার আলোকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে স্থিত হয়েছেন। ফলে তিনি কবিতায় তুলে ধরতে সচেষ্ট থেকেছেন ফ্যাসিস্ট শক্তির নিষ্ঠুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তিবাদী মানুষের প্রবল প্রতিবাদ। শ্রেণীশোষণ ও ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় আশা করেছেন।

৭ নভেম্বর কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেন-

"সেই তিক্ত বঞ্চনার, বাণিজ্যলক্ষ্মীর রক্তাতুর
সাম্রাজ্যের অভিসার ধূলিস্মাৎ প্রাণের বিপ্লবে।

স্বাধিকারে মুক্তি আজ, ন্যায়যুক্তি-প্রতিষ্ঠ জীবন"।

নাগরিক বৈদগ্ধের বিপরীতে তিনি এঁকেছেন সুস্থ জীবনের ছবি। তার প্রগতিচেতনার মূলে বিকশিত হয় সাধারণ মানুষের জয়গান ও সমাজচেতনার নিবিড় ধারাপাত যা সন্দীপের চর কবিতায় প্রাণস্রোতস্বিনী নদীর প্রতীকে উপস্থাপন করেন। তিনি কবিতার খাল কেটে দেশ-বিদেশের জলস্রোতের মিশ্রণে মানবমৈত্রীর বোধ রচনা করেন। সাম্যের সংগীত সত্য করতে গিয়ে কট্টর মার্কসবাদীদের সঙ্গে আদর্শিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়লেও তিনি শ্রেণীচেতনার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। বৈকালিক কবিতায় তিনি বলেন- ফিরে যাই সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ/ দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান/ তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু/ লাখো কৃষাণ/ ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে/ ওড়ে নিশান।.../ বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে/ অমর প্রাণ/ বীরদল চলে হাজারো মজুর/ লাখো কৃষাণ।

তার কবিতায় স্তবক পরম্পরায় আপাত-সম্পর্কহীন বিন্যাস ও বিমূর্ততা আধুনিক কবিতার এক অনিবার্য শিল্পফসল হিসেবে চিহ্নিত। তার প্রথম দিকের কবিতা সন্দীপের চর এবং উর্বশী ও আর্টেমিস গ্রন্থের কবিতায় ফরাসি প্রতীকবাদ আশ্রিত প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যা টিএস এলিয়টের কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ফরাসি প্রতীকবাদের সম্পর্কের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন আর্থার সায়মন্স। দ্য সিম্বলিস্ট মুভমেন্ট ইন লিটারেচার গ্রন্থে সায়মন্স মালার্মে প্রচলিত শব্দের কাম্য বিকল্প এবং মূল অর্থ থেকে দূরে সরে যাওয়া শব্দরাশির উপর্যুপরি বিন্যাস-এর কথা বলেন। কবিতার প্রতিপাদ্য ও অর্থ খুঁজতে থাকা পাঠকের হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তিনি এ দুটি প্রবণতার উল্লেখ করেন। বিষ্ণু দের উর্বশী ও আর্টেমিস-এ পরম্পরাহীন স্তবক বিন্যাস যে মালার্মে এবং এলিয়টের পংক্তি বিন্যাস প্রভাবিত এ কথা বলা অসঙ্গত হয় না। তবে মার্কসীয় দর্শন গ্রহণের পর তিনি ধীরে ধীরে স্বাদেশিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্যসৌধ নির্মাণ করেন। কবি বিষ্ণু দের কাব্যাদর্শ থেকে বামপন্থী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা গভীর প্রেরণা ও সমর্থন লাভ করেছেন বলেও ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

বিদেশী সাহিত্যের বিপুল পাঠে বিষ্ণু দের মানসলোক পরিশীলিত। ফলে এলিয়ট ও এজরা পাউন্ডের কাব্যচিত্রকল্প ও বাক্যবিন্যাসের সংহতিও তার কাব্যজগতে ব্যাপক প্রভাবসঞ্চারী। কবিতায় তার দর্শন এবং শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের ঋজুতা ও দৃঢ়তা দীক্ষিত পাঠককে টানে। জীবনানন্দ দাশ পাঠকের মননকে ধূসর রহস্যের জগতে নিয়ে যান, নৈরাশ্যবাদী করে তোলেন, কিন্তু বিষ্ণু দে তেমনটি নন। বিষ্ণু দের কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার নিজস্ব যুক্তিবাদী দর্শন ও সামাজিক কল্যাণবোধ। একজন কবিও যে চিন্তার সুস্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও যুক্তিবাদী দর্শনের মাধ্যমে কবিতায় অতলস্পর্শী সাফল্য অর্জন করতে পারেন, বিষ্ণু দে তার উজ্জ্বল উদাহরণ। যে কারণে তার কবিতায় ব্যবহৃত শব্দসমবায়ে এক ধরনের সৌম্য রুচির সন্ধান মেলে। কট্টর মার্কসবাদী সংস্কৃতি অঙ্গনের কেউ কেউ এলিয়টকে অবক্ষয় ও প্রতিক্রিয়াশীল কবি হিসেবে চিহ্নিত করলেও বিষ্ণু দের অভিমত ছিল এর বিপরীতে। তিনি এলিয়টকে আধুনিক সাহিত্যের মহৎ কবি মনে করতেন। মনে করতেন বাস্তব জীবনের রূপকার এবং বস্তুবাদী চৈতন্যের ধারক। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ব্যাপক ও প্রচ্ছন্ন সহমর্মিতা এবং এ প্রভাবের সদর্থক দিকের পাশাপাশি বিষ্ণু দের কবিতায় জটিলতার দিকটিও লক্ষ্যণীয়।

৮.৬ অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬)

কবি, গবেষক ও শিক্ষাবিদ। জন্ম ১০ এপ্রিল, ১৯০১ শ্রীরামপুর, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ। তাঁর পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী আসামের গৌরীপুর রাজ্যের দীউয়ান ছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাস (১৯২১) করে শান্তিনিকেতনের গবেষণা বিভাগে যোগদান করেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি লাভ (১৯২৬) করেন। পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (১৯২৬-১৯৩৩)। তিনি ১৯৩৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজে যোগ দেন এবং ১৯৩৭ সালে সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিফিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৮-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করেন। এ

সময়ের মধ্যে তিনি ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত হাওয়ার্ড, বস্টন ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্য ধর্ম ও সাহিত্যে অধ্যাপনা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কবি ইয়েটস, জর্জ বার্নাড'শ, আলবার্ট আইনস্টাইন, রবার্টফ্রস্ট, আলবার্ট সোয়ইটজর, বোরিস পাস্তেরনাক, পাবলো কাসালস্ প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। প্রায় সব ক'টি মহাদেশের অসংখ্য দেশে নানাবিধ কর্মসূত্রে তিনি ভ্রমণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে বক্তৃতা দিয়েছেন। ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার কয়েক শীর্ষ কবিরই অন্যতম একজন যে তিনি সে কথা আলোচনার বিষয় নয়। আলোচনা যা করা যায়, এবং পুনঃ পুনঃ করা যায়, তা হলো অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা। কবিতায় তিনি আধুনিক তো বটেই, বিশেষ অর্থে কিছুটা আধ্যাত্মিক, সার্বজনীন অর্থে অনেকটা আন্তর্জাতিক। বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যখন গগনবিস্তারী, রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে কেউ কেউ যখন স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক, নিজস্ব কিংবা ধার করা নতুনত্ব আনয়নে প্রাণান্ত, তখন রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে কাছে থেকেও, রবীন্দ্রবলয়ের খুব ভেতরে থেকেও, রবীন্দ্রপ্রসূত শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল কাটিয়েও কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব মুক্ত আধুনিক হয়ে ওঠার বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী। অবশ্য এ কথাও সত্য যে তাঁর মানস গঠনেও যাঁর প্রভাব সবচাইতে বেশি তিনি রবীন্দ্রনাথ। অমিয় নিজেই বলেছেন, 'তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) কাছে আমার জীবন দর্শনের পূর্ণতা পেয়েছি'। মানুষকে দেখবার চোখ, ভালোবাসার শক্তি, দেশ সম্পর্কে চেতনা, শুদ্ধ যুক্তি, বিশ্বমানবকে আপন করবার প্রেরণা। আমার অস্তিত্বের মূলেই তিনি। আবার এ কথাও সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরূহের ছায়াতলে থাকতে থাকতে আপন ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের মানসে তিনি এক সময় শান্তিনিকেতন ছেড়ে পশ্চিমা বিশ্বে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের পণ্ডিত ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.ফিল ডিগ্রিধারী এই কবি আমেরিকার বোস্টনসহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্যধর্ম ও সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এবং এ সময় তিনি বিশ্বখ্যাত আধুনিক কবি ইয়েটস্, রবার্ট ফ্রস্ট, বরিস পাস্তেরনাক; নাট্যকার বার্নার্ড শ', মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রমুখ

মনীষী মানবের সান্নিধ্যে আসেন। এমনিতেই রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বমানবের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন দীর্ঘকাল, অহিংস আন্দোলনের কিংবদন্তি মহাত্মা গান্ধীর সাথে সখ্য ছিল; তার ওপর বিশ্বভ্রমণ এবং ওইসব বিশ্বমনীষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থান; এসবই অমিয় চক্রবর্তীর কবিতারাজিকে একটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল এনে দিয়েছিল-এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়। ফলে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল সমগ্রতাবোধের উপলব্ধি।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় উপমার উপস্থিতি অভাবিত রকমের অল্প! কোনো কোনো কাব্যে নেই বললেই চলে ! আমরা জানি, কবিতা কেবল বক্তব্য বা বর্ণনা নয়, চিত্র অঙ্কনও। এবং সব কবিই এই চিত্র অঙ্কন করেন। চিত্র অঙ্কনের অভিনবত্বই একজন কবির বড়ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। আর এই চিত্র অঙ্কনে কবিতার যে নান্দনিক উপাচার সর্বাধিক কাজে লাগে তা হলো উপমা। উপমা মানে তুলনা। প্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের অভিনব তুলনার মাধ্যমে একজন কবি তাঁর উপভোগ্য চিত্রকল্পগুলো তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। অমিয় চক্রবর্তীও ছবি এঁকেছেন। অনেকের তুলনায় একটু বেশিই এঁকেছেন; কিন্তু আর সকলে যেখানে ছবি আঁকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই উপমার আশ্রয় নিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী সেখানে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, বর্ণনার পর বর্ণনা শানিয়ে চিত্রের পর চিত্র অঙ্কন করেছেন।

অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে যেমন হয়; প্রথম কবিতার বইটি পুরোপুরি নিজস্বতামণ্ডিত রূপ পায় না। অমিয় চক্রবর্তীর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্য কবিতাবলী (১৯২৪-২৫) এবং উপহার (১৩৩৬)-এর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য। তৃতীয় কাব্য খসড়াতেই (১৩৩৬) অমিয় চক্রবর্তীর কবিত্বশক্তির স্বতন্ত্র্য উদ্ভাসন। সমকালের কষ্টিপাথর, কবি-সম্পাদক-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু এই বইটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, বিস্ময়কর বই : খুলে পড়ে বসলে পাতায়-পাতায় মন চমকে ওঠে। বাংলা কবিতার পাঠকের কানের ও মনের যতগুলো অভ্যেস আছে, তার একটাও প্রশ্রয় পায় না, বরং প্রহৃত হয়। কিছুরই সঙ্গে এ কাব্য মেলে না; সুধীন্দ্রনাথ বা বিষ্ণু দে-র মতো 'দুরূহ' কবির পাঠাভ্যাসও বিশেষ কাজে লাগে না এখানে। এ একেবারেই আধুনিক, একেবারেই অভিনব। বলতে

ইচ্ছে হয়, উগ্র রকমের আধুনিক। সময়ের প্রেক্ষাপটে কথাগুলো কতটুকু সত্য ছিল তা বুদ্ধদেব বসুর চাইতে বেশি আর কারও জানবার কথা নয়। পরবর্তী কবিতার বই এক মুঠোও খসড়ারই অনুরণনপ্রায়। কিন্তু সে সব কথা নয়, এই গদ্যের শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবির কতিপয় পঙক্তিকে আলোচনায় আনবার চেষ্টা করব।

অমিয় চক্রবর্তীর বর্ণনামাত্রিক অভিনবত্বের প্রথম নিদর্শন সমুদ্র কবিতায় দেখি সমুদ্র হয়ে উঠেছে একটি বিরাট কারখানা, ব্যাপকতর কর্মপ্রবর্তনা।

নীল কল। লক্ষ লক্ষ চাকা। মর্চে পড়া। শব্দের ভিড়ে
পুরোনো ফ্যাক্টরি ঘোরে।
নিযুত মজুরি খাটে পৃথিবীকে
বালি বানায়, গ্রাস করে মাঠ, ছেড়ে দেয়, দ্বীপ রাখে,
দ্বীপ ভাঙে; পাহাড়, প্রবালপুঞ্জ, নুনযন্ত্রে ঘর্ঘর ঘোরায়।

কিন্তু কেবল যান্ত্রিক অভিনবত্ব নয়, সমুদ্র যে সৌন্দর্যেরও অপার উৎস সে দৃশ্যও আমরা পাই উপমাহীন বর্ণনাবিচিত্রতায়। তবে সমুদ্র অপেক্ষা পুকুরের চিত্রই অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম শিল্পসুষমায় অঙ্কিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর কলমে। যেমন ছোটো জলের আয়না :

টুকরো আকাশ লুকিয়ে রাখো
বুকে ঢাকো।
এখন দুপুর
হাওয়ায় ছোটে মেঘের কুকুর,
শূন্য ফ্রেমে বাঁধো, বাঁধো, ধরো আলোর জালে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাকে বলা হয় ‘দৃষ্টির দর্শন’। সব কবিই দেখেন। এবং দেখাকেই তুলে ধরেন কাব্যিক চিত্রময়তায়। অমিয় চক্রবর্তীও যা দেখেছেন তা-ই তুলে ধরেছেন। এবং তাঁর দেখার মধ্যে এক ধরনের দার্শনিক অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে। না হলে তাকে দর্শন বলা হবে কেন? ট্রেনের জানালা দিয়ে তিনি দেখেছেন মধ্যাহ্নে আদিম অচেতন/মাটির বিস্তৃতি। (চলন্ত)। জাহাজে চলতে চলতে এঁকেছেন সমুদ্র। দেখেছেন

আরও অনেক কিছু। বলা যায়, বিশ্বভ্রামণিক হিসেবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই অবিকল তা তুলে ধরেছেন কবিতায়। বলেছেন, আমি দ্রষ্টা। দেখে চলে যাব। কোথাও দৃষ্টির আনন্দ, কোথাও নয়। দৃষ্টির এই আনন্দ কিংবা আনন্দহীনতার দ্বারাই কবি একটার পর একটা পঙক্তি রচনা করেছেন কেবল বর্ণনার বৈচিত্র্যকে সঙ্গী করেই। আকাশ, চাঁদ, সূর্য, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, মাটি, অন্ধকার প্রভৃতি প্রকৃতির প্রায় সব উপাদানই আছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। কিন্তু বাংলার প্রায় সকল কবিই যখন ওইসব প্রাকৃতিক উপাচারকে সাজিয়েছেন অন্য কোনো বস্তু বিষয়, ভাব বিষয় বা প্রাকৃতিক বিষয়ের সঙ্গে তুলনা বা উপমার আশ্রয় নিয়ে, অমিয় চক্রবর্তী তখন তুলনা বা উপমার কাছে না গিয়েই ছবি এঁকেছেন। বাংলা কবিতার অত্যন্ত জনপ্রিয় তুলনাসূচক অব্যয় শব্দ 'মতো'র ব্যবহার নেই বললেই চলে। অন্তত তাঁর প্রধান কবিতাগুলোর দিকে তাকালে এই সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে চাঁদকে অজস্র উপমায় সাজিয়ে চিরকাল পূজা দিয়েছেন বাঙালি কবি, সেই চাঁদের বেলাতেও এর ব্যাত্যয় হয়নি। রাত্রের মাস্তুলে মেঘে ছিন্ন চাঁদ ঝোলে কিংবা দিগন্ত দেয়াল বেয়ে সূর্য ওঠে,/রাত্রি হয়; এর মতো পঙক্তিগুলো তো সে কথাই কয়। এক মুঠো কাব্যের বৃষ্টি কবিতার পুরোটাই বর্ষার বৈচিত্র্যময় চিত্ররূপায়ণে ভরা।

প্রথম স্তবকটি এ রকম –

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যাম রোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায়-শিরায় স্নানে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে।।

এই কবিতাটি নিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, বর্ষা সম্বন্ধে একাধিক উৎকৃষ্ট কবিতা তিনি লিখতে পেরেছেন, আর তার মধ্যে বৃষ্টির স্থান সর্বোচ্চে। এতে দৃশ্যমান নূতনত্ব কিছু

নেই, কিন্তু আমাদের মনকে এ গভীরভাবে আবিষ্ট করে। অভিজ্ঞান বসন্ত কাব্যের জল কবিতাতেও পাই বৃষ্টির এক অনিন্দ্য চিত্র। বৃষ্টি সেখানে আকাশশুক্তি থেকে জানালার কাঁচে ঝরে পড়া কণা কণা মুক্ত। এছাড়াও বৃষ্টিচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর একাধিক কবিতায়। এবং উপমা ছাড়াই। বসন্তের বৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন, আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।/মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার/অবিরহ,/সেই সৃষ্টিক্ষণ/স্রোতঃস্বনা/মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা/ প্রশস্ত প্রাচীর নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,/এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, কবিতা তাঁর সরল বক্রচালের জিনিস, অস্বাভাবিকতার যতটা ভ্রান্তি উজিয়ে তোলে মনের ভিতর তার চেয়ে তা সহজ ও স্বাভাবিক। (উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য)। কেউ কেউ অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাকে সবচাইতে জটিল ও দুর্বোধ্য বলে জানালেও, এবং কোনো ক্ষেত্রে তাঁর কবিতায় জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার ছাপ থাকলেও সহজ ও স্বাভাবিক উপাচারের বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না ছন্দ ও পঙক্তি বিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বাধীনতা নিয়ে নেয়া এই কবির কবিতায়। যেমন, যৌগিক কবিতায় দেখি,

ভরা পাকা ধান; হলুদ শর্ষে। কাজ, কত, লোকের,
যুগের চেষ্টা জড়ানো আমার দুপুর-ভরা কাজ।
অকেজো মাসে গরু চরেচে মাঠে, দেখি বাঁকের
আল-পথে লোক চলেছে, দূর মন্দিরের উঠেছে ধ্বজ।
কিংবা, চেতন স্যাকরা'তে-
শিমু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি
মা-বোনকে খাওয়ায়-দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগলে,
তৎপূর্বাবধি রান্নার পাকে ক'ষে ঘোরাও; নিজে ভাগলে
শক্ত সিনেমার সিটে, ইতরপ্রাণের গিল্টি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড্, মোক্ষের পিল্টি
ভোলায় ধিক্কার, সন্ধ্যেটা কাটে;

হাওয়া শিরোনামে বিস্ময়কর এক পরাবাস্তব কবিতা লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ, আর তাঁর সময়ের অমিয় চক্রবর্তী হাওয়াকে তুলে ধরেছেন সরল বিস্ময়বোধিতায়।

... বড়ো বড়ো হাওয়া
গাছ ওপড়ায়, সমুদ্র ঝাঁকায়, যাতায়াত
করে দৈত্য তবু দেখা যায় না। আশ্চর্য।
কম বহুদূর হাঁটে না শূন্যে। আবার ছোটো হাওয়া
নিঃশ্বাসে; জুঁই ফুলের চারধারে
কচি কুঁড়ি নাড়ে, মোমবাতির আলো ঠেলে
প্রাণ দিয়ে প্রাণের বাহিরে যায়;... আশ্চর্য।

অবশ্য উপমাহীন এই সহজতা, স্বাভাবিকতা কিংবা সরল বিস্ময়বোধের মাঝেও আছে এক ধরনের অসাধারণ জীবনদর্শন। বড় বাবুর কাছে নিবেদন নামক কবিতায় যখন দেখি, থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,/ধানের মাড়াই, কলা গাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।/মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা,/সুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা;/গঙ্গার ভরা জল; ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়াতীর/-হায়, এ-ও তো ফেরা-ট্রেনের কথা।

তখন বুকের ভেতরে কোথায় যেন ছ্যাৎ করে ওঠে। চোখের দেখার আড়ালে অপর এক দর্শনের বেদনা বড় হয়ে দেখা দেয়। এ রকম সরল দৃশ্য দেখতে দেখতে জটিল জীবনভাবনারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় বাস্তবিক, আটপৌরে, বিরহান্ত, হারানো, মাঠ, চিরদিন, অন্ন দাও, পৃথিবী প্রভৃতি অগণিত কবিতায়। অমিয় চক্রবর্তীর খসড়া ও এক মুঠো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য আছে এর মধ্যে-বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে আছে এর সঞ্চরণ। (নবযুগের কাব্য)। কিন্তু কেবল খসড়া কিংবা এক মুঠো নয়, পারাপার, পালাবদল, ঘরে ফেরার দিন, অমরাবতীসহ সকল কাব্যেই কম-বেশি অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য এবং বৃহৎ বিশ্বের মধ্যে তার সঞ্চরণ লক্ষ্য কার যায়। এবং এ কথাও পুনরুল্লেখ্য যে, অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্য প্রকাশ করতে গিয়ে, তার মধ্যে বৃহৎ বিশ্বের সঞ্চরণ উপলব্ধি করাতে গিয়ে

পঙক্তির পঙক্তিতে, কবিতার পর কবিতায় যে চিত্ররাজি তিনি অঙ্কন করেছেন তা আশ্চর্যজনকভাবে অনেকটাই উপমাবিরল কাব্যবাচনে। এমনকি যেখানে সকলেই অনিবার্য রকমেই উপমার প্রত্যাশা করেন সেখানেও।

বাংলাদেশের কবিতা বয়সের হিসাবে দেখতে দেখতে ষাটের কোঠা পেরিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবত কবিতার সার্বিক চরিত্র, তার আধুনিকতা, সার্থকতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নেহাত কম হয়নি। এ জাতীয় বিচার-ব্যাখ্যার প্রবণতা সাধারণত দশকভিত্তিক। তিরিশের দশকের কবিতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ থেকে দশকওয়ারি বিচার-বিবেচনার প্রবণতা শুরু কিনা বলা কঠিন। তবে ওই সূত্রে ওই ধরনের বিচার মোটামুটি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে মনে হয়।

কিন্তু সময়ের সুনির্দিষ্ট প্রাচীরঘেরা এ জাতীয় বিচার কবি ও কবিতার জন্য সব সময় যুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে নির্দিষ্ট দশকপর্বে যদি কবিতার চরিত্রগত সুস্পষ্ট মূলধারা তৈরি না হয়। তেমন ধারা চল্লিশে গড়ে উঠলেও শেষার্ধে এর চরিত্র বদল ঘটে। অন্যদিকে তিরিশের কবিতার কোনো দশকনির্ভর চরিত্র দেখা যায় না। কবিতা তখন পুরোপুরি স্বতন্ত্র ব্যক্তিমেধানির্ভর। যেমন একদিকে তিরিশের রবীন্দ্রনাথ একক পিরামিড, অন্যদিকে নবপঞ্চ আধুনিক সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব ও বিষ্ণু দে এবং আরও দু-একজনে স্বতন্ত্রধারায় নিজ নিজ মেধায় কাব্য স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন।

তাই তিরিশের কবি বলতে তাদেরই বুঝি যারা ওই সময়-পর্বে কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে তিরিশের কবিতা বলতে এক স্রোতধারার কবিতা বোঝায় না বরং একাধিক ব্যক্তিনির্ভর স্বতন্ত্রধারা বোঝায়। তিরিশের কবিতা তাই দশক চেতনা বা দশক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত নয়, যেমন দেখা যায় চল্লিশের যুগ চেতনানির্ভর কতিবায়। সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়েও আদর্শগত ধারার একসূত্রে গাঁথা।

আমাদের মনে হতে পারে যে বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, ও প্রেমেন্দ্র মিত্র - এঁদের কবিতারচনার বিরাট বৈচিত্র্য থাকলেও সময় ও চেতনার চর্চায় এঁদের একটি ধারা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ১৯৬০-এর দশকে বাংলা ভাষায়

যিনি কবিতা লিখতে আসছেন, তাঁর সামনে কোন্ উত্তরাধিকার দাঁড়িয়ে রয়েছে তা বিবেচনা করলে আমরা দেখব যে পঞ্চাশের কবিরা তখন হৈ চৈ শুরু করলেও তাঁদের নিজস্ব কাব্যস্বভাবের কবিতা তখনও দানা বাঁধেনি, আর চল্লিশ যেন বড়ো ম্রিয়মাণ এক দশক, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বিরাট বলয়ের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারা কাব্য আন্দোলনের নায়ক বলতে তখন কেবল তিরিশের কবিরাই। সেই সময়ে বঙ্গের প্রচলিত ধারার কবিদের কবিতার মধ্যে তখন নাগরিক জটিলতা ও সংকটের চিত্রকল্প দানা বাঁধেছে। সমসাময়িক বা সামান্য অগ্রজদের মধ্যে যাঁদের আমরা প্রধান কবি বা কাব্যধারার প্রবর্তক হিসেবে চিহ্নিত করি, তাঁদের কবিতার প্রধান রূপকল্পে জীবনানন্দের ঝংকার, কিংবা তখনকার জায়মান রাজনৈতিক মুক্তিচেতনার স্পন্দন। সেখানে কাড়ানাকাড়া বা রণভেরীর তুলনায় ক্লারিনেটের সুর শুনি, পাশ্চাত্য মার্গসংগীতের মতন তার চলন, অনেকটা যেন সুধীন্দ্রনাথের অর্কেস্ট্রা কবিতার ভিতর দিয়ে দেখা কনসার্টের রূপবর্ণনা।

মজার কথা হলো, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান, ফ্রেজারের নৃতত্ত্ব, প্ল্যাঙ্ক-বোর-আইনস্টাইনের পদার্থবিদ্যার জগৎ, মার্কসীয় সমাজবিজ্ঞান - এগুলি যুক্তিবাদী মনের যে প্রস্বর নিয়ে এগিয়ে চলে, সেখানে তো রোম্যান্টিক ধারার থেকে সরে আসার একটা সচেতন চেষ্টা লক্ষ্য করাই স্বাভাবিক। তাই, জীবনানন্দের ‘আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হ’য়ে আকাশে আকাশে’ পড়ে শিউরে ওঠার উদাহরণ সম্ভবত ভালো লাগারই কথা তাঁর, জীবনানন্দ তো আর রোম্যান্টিক কবি নন। সে-অর্থে যুক্তিবাদ তো তাঁর উত্তরাধিকারেরই অংশ। কবিতায় তাঁর দীক্ষাপ্রস্তুতির মূলেই রয়েছে এই যুক্তির জগৎ, যখন তাঁর চারপাশে বহমান কাব্যচর্চার জগতে একধরণের লিরিকাল সারল্য আমাদের অন্য একধরণের ভালো লাগায় আচ্ছন্ন করে। ‘রবীন্দ্রব্যবসা’ ছেড়ে আধুনিকেরা ‘সমুদ্রের দিকে’ যাত্রা করেন নতুন দিগন্তের প্রত্যাশায়। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ: ‘বাঙালি কবির পক্ষে, বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে, প্রধানতম সমস্যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য প্রচুর- কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুস্তর; দৃশ্যগন্ধস্পর্শময় জীবনানন্দ আর মননপ্রধান অবক্ষয় চেতন

সুধীন্দ্রনাথ দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, আবার এ-দুজনের কারো সঙ্গেই অমিয় চক্রবর্তীর একটুও মিল নেই। তবু যে এই কবিরা সকলে মিলে একই আন্দোলনের অন্তর্ভূত, তার কারণ এঁরা নানা দিক থেকে নতুনের স্বাদ এনেছেন; এদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ এই একটি ধরা পড়ে যে এঁরা পূর্বপুরুষের বিত্ত শুধু ভোগ না-করে, তাকে সাধ্যমতো সুদে বাড়াতেও সচেষ্ট হয়েছেন, এঁদের লেখায় যে-রকমেরই যা-কিছু পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথে ঠিক সে-জিনিসটি পাই না। কেমন করে রবীন্দ্রনাথকে এড়াতে পারবো- অবচেতন, কখনো বা চেতন মনেই এই চিন্তা কাজ করে গেছে এঁদের মনে; কোনো কবি, জীবনানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে সরে গেলেন, আবার কেউ-কেউ তাঁকে আত্মস্থ করেই শক্তি পেলেন তাঁর মুখোমুখি দাঁড়াবার। এই সংগ্রামে-সংগ্রামই বলা যায় এটাকে, এঁরা রসদ পেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভান্ডার থেকে, পেয়েছিলেন উপকরণরূপে আধুনিক জীবনের সংশয়, ক্লান্তি ও বিতৃষ্ণা। এঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধসূত্র অনুধাবন করলে ঔৎসুক্যকর ফল পাওয়া যাবে; দেখা যাবে, বিষ্ণু দে ব্যঙ্গানুকৃতির তির্যক উপায়েই সহ্য করে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে; দেখা যাবে সুধীন্দ্রনাথ, তাঁর জীবনভুক- পিশাচ-প্রমথর, রাবীন্দ্রিক কাব্যবিন্যাস প্রকাশ্যভাবেই চালিয়ে ছিলেন, আবার অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথেরই জগতের অধিবাসী হয়েও, তার মধ্যে বিস্ময় আনলেন প্রকরণগত বৈচিত্র্যে, আর কাব্যের মধ্যে নানা রকম গদ্য বিষয়ের আমদানি করে। অর্থাৎ এঁরা রবীন্দ্রনাথের মোহনরূপে ভুলে থাকলেন না, তাঁকে কাজে লাগাতে শিখলেন, সার্থক করলেন তাঁর প্রভাব বাংলা কবিতার পরবর্তী ধারায়।'

অর্থাৎ 'রবীন্দ্রেতর' হওয়ার সংগ্রামে এই সব আধুনিক কবি রবীন্দ্র-ব্যতিক্রমী মন ও মর্জি, ভাষা ও ভঙ্গির অবলম্বন করেন। এর প্রমাণ তাঁদের প্রাথমিক কাব্যপ্রয়াসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে: জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপালক' (১৯২৭) ও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬); সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'তন্বী' (১৯৩০); বিষ্ণু দে-র 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩); বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা ও অন্যান্য কবিতা' (১৯৩০); প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' (১৯৩০) ইত্যাদি।কল্লোলের পরও বাংলা কবিতায় পরিবর্তন কিছু কম হয়নি। কল্লোলের অব্যহিত পরই 'পরিচয়' ও 'কবিতা' পত্রিকা আধুনিক বাংলা কবিতার

বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে।বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদকীয় নেতৃত্বে কবিতা লেখার কাজটি হয়ে উঠেছিল রীতিমতো একটি আন্দোলন, যার মুখপত্ররূপে উজ্জ্বল প্রকাশ ‘কবিতা’ পত্রিকার। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল আধুনিক বাংলা কবিতার সগৌরব অবয়ব নির্মাণ। আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ‘কবিতা’ পত্রিকা বন্ধ করে দেন বুদ্ধদেব। ১৯৩৫ থেকে শুরু, ছাব্বিশ বছরের আয়ু ‘কবিতা’র , যেন ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে দ্রুত নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে অন্তর্হিত হলো। বিরোধ আর বৈপরীত্যের মধ্যে বিরল সমন্বয়ের কৃতিত্ব সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর। আধ্যাত্মিকতার পাশে রাজনৈতিক-দর্শন, নাগরিক-বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যের মাঝে প্রকৃতি তন্ময়তা, পদ্যছন্দের পাশে গদ্যছন্দ, রোমান্সনির্ভর কবিতার পাশে বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন, অতিন্দ্রীয় চেতনার পাশে ইন্দ্রিয়ঘন উচ্ছ্বাস- সবকিছুই প্রশ্রয় পেয়েছে ‘কবিতা’র পাতায়। তাই আমরা বলতেই পারি, বাংলা কবিতা কখনো বন্ধ্যা হয়ে যায়নি। আমাদের সৌভাগ্য, বাংলা কবিতার সূচনায় রয়ে গেছে পরম সৌগতের ছোঁয়া। কারণ তার নবজন্ম আধুনিক যুগের প্রধান ছয় কবিদের হাতে, তাঁদের মধ্যে একজন উজ্বলময় ধ্রুব জীবনানন্দ ও অনান্য পাঁচজন নবপথের চিরনতুন জ্যোতিষ্ক।

৮.৭ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম ‘সাগর থেকে ফেরা’।

২- বিষ্ণু দের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

বিষ্ণু দের একটি কাব্য গ্রন্থের নাম ‘চোরাবালি’।

৩- বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতার নাম উল্লেখ কর।

বুদ্ধদেব বসুর একটি কবিতার নাম ‘কঙ্কাবতী’।

৮.৮ অনুশীলনী প্রশ্ন

মন্তব্য

১- আধুনিক কবি হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে নিয়ে মনোভাব কি ছিল?

২- সাহিত্যিক হিসাবে বিষ্ণু দের ভূমিকা নির্ণয় কর।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

কোরক সাহিত্য পত্রিকা,

সাগর থেকে ফেরা-কাব্য গ্রন্থ,

বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন।

একক-৯ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা

বিন্যাস ক্রম

৯.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তবিক মনোভাবের প্রকাশ

৯.২ সাগর থেকে ফেরা, জোনাকি মন, ও ফেরারী ফৌজ

কবিতার নামকরনের সার্থকতা ও কবিতার সারমর্ম।

৯.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

৯.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৯.১ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তবিক মনোভাবের প্রকাশ

আধুনিক বাংলা কাব্যের এক অনন্য অসাধারন শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র। কল্লোল যুগের শিল্পী হয়েও তিনি তাঁর কাব্যে ও সাহিত্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন সমস্যা কে রূপ দিয়েছেন। নতুন যুগের সংশয়,অবিশ্বাস,বিদ্রোহ,বিক্ষোভ, তাঁর সাহিত্যে ধরা পড়েছে। তাঁর বিক্ষোভের সঙ্গে নজরুলের বিক্ষোভের মিল আছে। তিনি চিরকাল ভগ্ন হৃদয় লাঞ্ছিত উৎপীড়িতদের জন্য স্বপ্ন স্বর্গের অনুসন্ধান করেছেন। সেই জন্যই অন্নদাশকংর রায় তাঁর সমন্ধে লিখেছেন- ‘premnedra is a broken hearted dreamer, still hoping for the best from the revolution’ তাঁর সাহিত্যে রয়েছে গভীর বাস্তব চেতনা এবং অবিরাম প্রশ্নময়তা।

তাঁর কাব্যগ্রন্থ গুলি হল- ‘প্রথমা’ (১৯৩২), ‘সম্রাট’ (১৯৪০), ‘ফেরারী ফৌজ’ (১৯৪৮), ‘কখন মেঘ’ (১৯৬০), ‘সাগর থেকে ফেরা’ (১৯৫৬), ‘হরিণ চিতা চিল’ (১৯৬১), ‘অথবা কিন্নর’ (১৯৬৫), ‘সঙ্গীর নিকটে’ (১৯৭২) ইত্যাদি।

মানুষ নিজেদের পারস্পরিক প্রয়োজনেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে, জীবনের প্রয়োজনে এবং জীবিকার তাগিদে একত্রিত বা সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের একটি পরিচয়ে বা কাঠামোতে আবিষ্কার করে সামাজিক জীব হিসেবে। তখন থেকেই মানুষ, মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে চিন্তা করতে শুরু করে। এভাবেই মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে। তাই দেখা যায় যে, সমাজ একটি আদিম সংগঠন। অর্থাৎ আদিম সময়কাল থেকেই মানুষ সমাজ বা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায় অর্থাৎ তখন থেকে সমাজ বা সমাজব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। সাহচার্যপ্রিয়তা, অস্তিত্ব রক্ষা, সাহায্য-সহযোগিতা, সামাজিকীরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। অর্থাৎ সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যখন বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখন সমাজ জীবনের সূত্রপাত ঘটে। তাছাড়া, সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়বস্তু ও গবেষণারক্ষেত্রকে সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া দেখা যায় যে, মূলত সমাজ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের আচরণ ও মনোভাবের পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষের বিচ্ছিন্ন থাকার মানসিকতা পরিবর্তন তাদের সংঘবদ্ধ করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা দার্শনিক চষাড় অবশ্য বলেছেন -'সমাজ সৃষ্টি হয়েছে পারস্পর্যের নীতির উপর ভিত্তি করে।' এই নীতি অবশ্যই পরিবর্তনের নীতি একথা স্বীকার্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণভাবে সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজবদ্ধ মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সমাজ কাঠামোর যে কোনো পরিবর্তনকে বুঝতেন। যেখানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি কারণে মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মনোভাব, মূল্যবোধ, আশাআকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত সমাজে পরিবর্তিত হয়। তাঁর মতে, 'সামাজিক পরিবর্তন হলো কোনো জাতির জীবন ব্যবস্থার রূপান্তর, পরিবর্তন ও সংশোধন।প্রেমেন্দ্র মিত্র মনে করেন

মন্তব্য

সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সমাজ সৃষ্টির পরপরই শুরু হয়েছে। কেননা হাজার বছরের বিবর্তনের ধারায় আজ বর্তমান সমাজে এসে আমরা উপনীত হয়েছি। আজকের সমাজব্যবস্থা এই বর্তমান অবস্থায় উপনীত হওয়ার পেছনে অবশ্য সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো পারস্পরিকভাবে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। পরিবর্তনের সাথে আধুনিকীকরণ ও উন্নয়নের যোগ দৃঢ়, যদিও পরিবর্তন সকল সময় উন্নয়ন নির্দেশ করে না, পরিবর্তনের অবোন্নয়নও ঘটে বা ঘটেছে অনেক সময় বা প্রতিনিয়তই ঘটছে আমাদের সমাজব্যবস্থায়। তাছাড়া সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রের পরিবর্তন বা রূপান্তরের সমন্বিত রূপটিই সমাজ হিসেবে আখ্যায়িত। সমাজ সম্পর্কিত ধারণাগুলো আবার কয়েকটি বিষয়ের দিক নির্দেশ করে যা কাঠামো, সম্পর্ক এবং প্রক্রিয়া। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান এবং ভূমিকার ভিত্তিতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয়।তাঁর মতে সমাজে বসবাস করতে গিয়ে বিভিন্ন সদস্য হিসেবে মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, ভাব বিনিময়, আচার-আচরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপিত করে। আর কাঠামো এবং সম্পর্ক এই দু'য়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠে প্রক্রিয়া বা একটি সমাজ। এই সমাজকে তিনি দুইভাবে বিবেচনা করে থাকেন এক -সনাতন সমাজ, দুই -আধুনিক সমাজ। এই উভয় প্রকার সমাজই আবার বিভিন্ন উপ- বাস্তবিক সমাজে বিভক্ত। তিনি বাস্তবিক্তাকে ফেলে শুধু অবশ্য সেই উপ-সমাজের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন এমন প্রত্যাশা করা যাবে না।

মূলত, সমাজ সম্পর্কে তাঁর মোটামুটিভাবে সনাতন ও আধুনিক সমাজের কিছুটা ধারণার আলোকপাত করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এক, সনাতন সমাজ, সনাতন বা ঐতিহ্য হলো চিরাচরিত অভ্যাস, প্রথা, মনোভাব ও জীবন পদ্ধতি বা ধারা যা দীর্ঘদিন ধরে মানব সমাজ ও জীবনে প্রথিত। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সনাতন সমাজ পুরনো বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি নির্ভর। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে অনেকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের সমাজগুলোকে সনাতন সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। দুই, আধুনিক সমাজ। আধুনিক সমাজ বলতে, ঐতিহ্যের ধারাকে অর্থাৎ পরিবর্তনের ধারাকে সঙ্গতি বিধান করে যে সমাজ বর্তমান পরিবর্তিত জীবন ধারায়

পুরনো অভ্যাস, প্রথা বা রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে পেছনে ফেলে বা ভেঙে ফেলে বর্তমান উন্নীত ধারায় অগ্রসর হয়ে ওঠে তাকেই আধুনিক সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ড্যানিয়েল লারনার বলেন, আধুনিক সমাজের কয়েকটি সূচক নির্দেশ করে যা -নগরায়র, শিল্পায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ও রাজনৈতিক ব্যাপক জনঅংশগ্রহণ, গণতন্ত্রায়ণ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দৃষ্টি থাকে এবং যে সমাজ জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শক্তির উৎকর্ষ বিধান ও সার্থক জীবন যাত্রার মান উন্নত করেছে তাকেই আধুনিক সমাজ বলে। মাঙ ওয়েবারের মতে, যুক্তিভিত্তিক ও আইনভিত্তিক নেতৃত্বের দ্বারা শাসিত সমাজই হলো আধুনিক সমাজ। অন্য কথায়, আধুনিক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ হলো আধুনিক সমাজ। এছাড়াও, আমরা দেখতে পাই যে, রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি অবিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হচ্ছে সমাজ। কাজেই সমাজের অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে এবং এর ধারা প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। একটি সমাজের সংস্কৃতি, চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা মনোভাব প্রভৃতি সামাজিক দিকে পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজবদ্ধ মানুষ পরিবর্তন ঘটিয়েছে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর। তাছাড়া অর্থনীতির এই হাত ধরেই আবার রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে।

তৎকালীন সমাজের সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপ-ব্যবস্থাকে পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, দিক-নিদের্শনার জন্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি প্রণয়ন বা আইন তৈরি যা কিছু আছে তা আবার রাজনৈতিকভাবেই সম্পাদিত হয়ে আসছে বা হয়ে থাকে। তাই, মানুষের মাঝে উন্নত সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চাহিদা জাগ্রত হয়ে ওঠেছিল। তাই যে, কোনো ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন যে কোনো কারণেই ঘটুক না কেন তা অবশ্যই সামাজিক পরিবর্তন হিসেবে বিবেচ্য। এইতো গেলো সমাজ ও বাস্তবতা সম্পর্কে এবং সমাজ ও বাতবতা পরিবর্তনের সম্পর্কে কিছুটা ধারণামাত্র। এবার আসা যাক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তব চেতনার বিষয়।তাঁর কবিতায় বাস্তব চেতনা বিষয়টি আসলে কী অথবা আমরা কিভাবে দেখবো কবিতায় সমাজচেতনা

বলতে আসলে ঠিক কি অনুধাবন করা হয়ে থাকে। বাস্তবিক মূল্যবোধের যে প্রকাশ, তাই এক অর্থে বাস্তব চেতনা। বাস্তব চেতনাকে আমরা মূল্যবোধের এই বিশাল প্রেক্ষাপটেই দেখতে পারি যা নিঃসন্দেহ। বাস্তব চেতনার এই প্রেক্ষপটের দিকটি বিভিন্ন আলোচনার একটি সংলাপের মতো তাই এর যথাযথ মূল্যায়নের অভাবে সাধারণ কবিতা পাঠকরা কবিতায় সমাজচেতনার দিকটি ঠিক কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তা সঠিকভাবে ভেবে দেখার বিষয়। আসলে, কবিতা যেহেতু চেতনাগত দিক দিয়ে শিল্প-সাহিত্যের প্রথমেই অবস্থান করে, তাই মানুষের মন এবং অগ্রসর সমাজ বিকাশের সাথে সাথে কবিতা তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কতটুকু পালন করতে পেরেছে তার মূল্যায়নও একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার সামিল। এই কথাটি সর্বকালের কবিতার জন্য সত্যও বটে। না হলে যেকোন কালেই কবিতা মানুষের কাছে কুয়াশার মতো আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। তাই কবিতার দায়ের প্রশ্নটি এসেই যায়। কবিতার দায়ের সাথে কবির দায়কে তো আর অস্বীকার করার কেনো কারণ বা উপায় আপাত দৃষ্টিতে নেই। কিন্তু, এই দায় আবার অনেকেই আছেন ঠিক দায় হিসেবে বিবেচনা করেন না তারা ঠিক শিল্পের জন্য শিল্প রচনার বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু কবিতা কেবল, ব্যক্তি মনের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি এবং সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ এই যৌক্তিক নিরিখে আর কবিতাকে আটকানো সম্ভব নয়। একজন কবির কবিতায় সামগ্রিক কর্মে তার চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধের রূপায়ন কিভাবে রসায়িত হবে এবং এই রূপায়নের মাধমেই যে রসসৃষ্টি হবে যা জীবন ঘনিষ্ঠ শব্দাবলীর অন্বেষণে সৌন্দর্যে এবং রসবোধের নিমিত্তে কবিতায় সমাজচেতনার দিকটি জাগ্রত হবে বাস্তবতার নিরিখে সে আশা করাই যেতে পারে। লুনাচারস্কি বলেছেন, লেখক নিজে যে শ্রেণীর অন্তর্গত সেই শ্রেণীর মনস্তত্ত্ব কোনো না কোনোভাবে সাহিত্যে সর্বদাই প্রতিফলিত হয়'। তাই দেখা যায় যে, একজন কবি কবিতায় সমাজচেতনার প্রতি এই দায়বদ্ধতার কথা চিন্তা না করে পারেন না। সমাজের চরম সঙ্কটকালেও একজন কবি নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না, ধনী-নির্ধনের দ্বন্দ্ব যখন চূড়ান্তে এসে যখন পৌঁছায় তখন একজন কবিকেও নির্ধনের পক্ষে এসে দাঁড়াতে হবে, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

একজন কবি সমাজ থেকে, গণজীবন ও গণসংগ্রাম থেকে বহুদূরে সরে গিয়ে বসবেন আপন ঘরের ও মনের দরজা বন্ধ করে এমনটা নিশ্চয়ই আশাতীত নয় কখনো। কেননা একজন কবি তো মানুষও বটে এবং সেতো সমাজেরই একটি অংশ হিসেবে সামাজিক জীব। যতো আত্মসমাহিত হোক না কেন তার জীবন ও মন, সমাজের সঙ্গে সে নানা নিবিড় সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং সমাজের জীবনপ্রবাহ, তার গভীর তলাবাহী নানা স্রোত ও ধারার সংঘাত আসন্ন বিপ্লবের আবর্ত, বিপ্লবান্তিক যে সমাজের পলি পড়ছে কোনো এক অলক্ষ্য পাড়ে তার বিবিধ কল্পচ্ছবি, তার বিচিত্র অনুপ্রেরণা এ সমস্তকে তিনি এড়িয়ে চলতে পারেন না। তাই সমাজের বৃহত্তর জীবন ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে একজন কবি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন তা তার কবিতায় প্রভাবিত না হয়ে পারে না সে প্রভাব যতোই সূক্ষ্মই হোক, যতো পরোক্ষ ও দুর্নিরীক্ষ্যই হোক না কেন। কিন্তু একজন কবির সমাজচেতনা শুধু নঞর্থক হলে চলবে না। কোনো সামাজিক আদর্শ আমাদের অনুপ্রাণিত করবে তার জন্যে চোখ মেলে তাকাতে হবে সমাজ বাস্তবতার দিকে। যে সমাজব্যবস্থায় আমরা বসবাস করছি তার দোষ এবং পাপের লম্বা ফর্দ করা যেতে পারে এবং অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য থেকে আরম্ভ করে কুরুচি, দুর্নীতি, এবং যুদ্ধপ্রীতি পর্যন্ত তুলে ধরতে হবে। সংগ্রামে কর্মীর চেয়ে ভাবুক, রাষ্ট্রনেতার চেয়ে শিল্পরচয়িতার বা কবির দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়। বস্তুতপক্ষে, আরো বেশি কারণ একজন কবির মন হচ্ছে সমাজের সূক্ষ্মতম বীণাতন্ত্র। সামাজিক দুঃখের আওয়াজ সর্বাগ্রে ধ্বনিত হবে সেই বীণার তারে এবং তারই ঝংকার সাড়া জাগাবে দেশজোড়া মানুষের চিত্তে এই তাঁর অভিপ্রায়। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের পথও একজন কবিকেই সকলের আগে দেখতে হবে এবং সকলকে দেখাতে হবে যা সহযোগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা একজন কবি যেহেতু সমাজেরই অংশ এবং এই অংশীদারীত্বকে তিনি অস্বীকার করতে পারে না বা এড়িয়ে যেতে পারেন না। কারণ একজন কবি তিনি সমাজ থেকেই কিন্তু সমাজের অশুভ মনোভাব, অসৎ আচার-আচরণ, অনৈতিকতা ইত্যাদি কবিতায় তুলে ধরেন বা ধরবেন। এজন্যই হয়তো বলা হয়ে থাকে যে, তিনি কবি হিসাবে বাস্তবিক মূল্যবোধের সবচেয়ে অগ্রবর্তী শিল্পের ধারক। সমাজ পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে

আমরা বুঝতে পারবো যে, ইতিহাস স্থির বসে নেই। তা অবশ্যই অগ্রসরমান এবং এই পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা -চেতনা, ভাবনা ক্রমে আরো পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠছে বা ওঠবে এটাই স্বাভাবিক এবং নেতিবাচক সকল প্রকার ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে শ্রেণীগত বৈষম্য অতিক্রম করে কবিতা তার সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের সৎ সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে, ইতিহাস অবশ্য সেই কথাই বলে বা বলবে এটা বলা যেতে পারে। কেননা সার্থক কবিতা সৃষ্টির জন্যে আমদের কবিদের মনে সেই চেতনাই বারবার জাগ্রত হয়ে ওঠেছে বা ওঠবে। শুধুমাত্র শান্তি বা সুন্দরের বাণী নয় এবং এই বাণী কেউ আর শুনতে রাজি নয়। বাংলা কবিতার দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে আদি কবিতা থেকে শুরু করে আজ অবধি জীবনবাদী সমাজচেতনার বাক্যবলীর উচ্চারণ লক্ষ্য করা গেছে কবিদের কবিতায় তা কখনো সচেতনে বা অবচেতনে। সমাজচেতনায় উজ্জীবিত কবিতার যে ধারা তাও আছে বাংলা কবিতায় যা বীজ থেকে চারা গজিয়ে পত্রপুস্পফুলের সুশোভিত মহীরূহে পরিণত হয়ে আসছে বা ভবিষ্যতেও হবে। মূলত সমাজ বাস্তবতার নিরিখে গণমানুষের চিন্তা-চেতনা ক্রমে অগ্রসরমান হয়ে ওঠছে বা ভবিষ্যতেও হবে। কারণ সমাজচেতনায়, জীবনের মূল্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের সমন্বিত ভাষা হয়ে উঠাই কবিতার সার্থক রূপায়ন।প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় বাস্তব চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর জীবন উপলব্ধি যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে তা বলা যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে সময় একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রতিটি কাল বা দশকেই কবিরা তার স্ব-স্ব সময়ের বা কালের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। এই প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই তার সময়ের বা কালের সামাজিক চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ বা বিশ্বাস ভাঙার মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। না হলে আমাদের কবিদের কবিতায় বাস্তব চেতনা জাগ্রত হতো না। তাছাড়া,তাঁর কবিতায় মানুষের জীবনযাপন যদি বাঙময় হয়ে না ওঠে তবে কবিতার নিজস্বতা হবে অচল।একজন কবিকে তার সমাজের আশপাশের মানুষের জীবনযাপন সম্পর্কে দৃষ্টি দিতে হয়েছে বা হবেই। সমাজের নানান অসঙ্গতি, দুঃখ-দুর্দশা, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, হতাশা, সর্বপোরি সামাজের মানুষগুলোর বাস্তব জীবন প্রবাহ সম্পর্কে অবগত থাকার চেষ্টা করতে হচ্ছে বা চেষ্টা করতে হবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় অবশ্য সেই দিকটিই বিবেচ্য বিষয়।এই ক্ষেত্রে সমাজ বাস্তবতার নিরিখে কবি তাঁর কবিতায় সমাজ বা মূল্যবোধের দিক দিয়ে বাস্তব চেতনার প্রতিফলন কবিতায় ধারণ করেছেন বা কবিতায় তুলে এনেছেন ঠিক তেমন কিছু কবিতার আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করবো আলোচ্য আলোচনাতে।

প্রাচীন যুগে যখন ধর্মই ছিল মানুষ ও সমাজের অন্যতম প্রধান উপাদান তখনও ছিল কবিদের সামাজিক উপলব্ধি। যেহেতু ধর্মই ছিল সামাজিক ও মানুষের অন্যতম উপাদান এবং তা ছিল সমাজ ও মানুষের জন্যেই, সেহেতু এ ধর্মকে নিয়েই কবিদের মাঝে গড়ে ওঠেছিল সামাজিক প্রতিরোধ। তাই আমরা দেখতে পাই যে, চর্যাপদের কবিগণ তাদের ধর্মতত্ত্বের কাব্যভাষ্য রচনা করতে গিয়ে উপমা ও প্রতীক হিসেবে তৎকালীন সামাজিক উপাদানগুলোকেই বেছে নিয়েছিলেন। আর এ কারণের চর্যাপদগুলোর মধ্যে দিয়ে আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস পরিলক্ষিত হতে দেখি। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলা কবিতার বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় যে, মধ্যযুগের ক্ষেত্রেও এ ধারার মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। চলমান ধারায় কবিতায় সামাজিক প্রতিফলনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন না এলেও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, জীবনীকাব্য ইত্যাদিতে সামাজিক ইতিহাস ছাড়াও একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদ এবং প্রতিবাদী ভূমিকার রূপায়ন ছিল লক্ষণীয় বিষয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে রূপায়িত সমাজ জীবন, মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের বিদ্রোহী ব্যক্তিত্ব যা সর্বজন বিদিত। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার ছোঁয়ায় মধ্যযুগের পর্দা টানার ইতিহাস শেষ হয়ে যায়। সূচনা হয় আধুনিক যুগের। কিন্তু আধুনিক যুগে এসেও কবিতায় সামাজিক ভূমিকার অবতারণা আরও প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিদ্রোহ। বিশেষ করে তার রচিত কাব্যে মানবতার জয়গান, নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত সমাজ বাস্তবতায় কবিতা আরো শিল্প সমৃদ্ধ রূপায়ন ঘটে। এরও কিছুকাল পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার রচিত কবিতায় ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে মূলত তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের চিত্র এঁকেছেন। এরপর, বাংলা কবিতার জগতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষ পর্যন্ত মনস্তাত্তিক দ্বন্দ্বের

অবসান ঘটিয়ে সামাজিক জীবনবাদী কবিতায় ফিরে আসেন। তারপর থেকেই তিনি লিখলেন 'দুইবিঘা জমি' এবং আরো বেশ কিছু কবিতা যা সমাজের অসংগতির বিভিন্নরূপ পরিগ্রহেরই প্রতিফলিত রূপ। তার আরেকটি কবিতা 'রাজমিস্ত্রি'। কবিতাটিতে তিনি একজন রাজমিস্ত্রিরির জীবন-কাহিনী তুলে ধরেছেন। কবি বুঝাতে চেয়েছেন, সমাজের মানুষগুলোর একটা বিশেষ শ্রেণীর জীবনকথা। যারা শুধু দিনের পর দিন সারাটি জীবন শুধু কর্মের মধ্যেই জীবনযাপন করে থাকে। শুধুমাত্র নিজেদের দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন আহারের প্রত্যাশা ছাড়া আর কোনো চিন্তাই করে না। অথচ এর জন্যে তাদের কতো কষ্ট করতে হয়ে থাকে। তারা আর কোনো অধিকার পাবার কথা চিন্তা করে না, এই চিন্তা না করার ফলে তারা প্রতিনিয়তই শোষণের শিকার হচ্ছে। শুধুই শোষকের তাড়া খেয়ে বেড়ায়। থাকে না শোষকের বিরুদ্ধে কথা বলার শ্রেণীগত সংগ্রাম বা প্রতিবাদ করার মতো কোনো ভাষা। এই নীরবতার কারণেই শাসকরা আরো বেশি শোষণের সুযোগ পায় বা নিচ্ছে। ফলে, শাসকদের বদল ঘটলেও শোষকদের বা শোষণের হাত থেকে সমাজের নিম্ন এই সকল শ্রেণীগুলোর মুক্তি মিলে না। মূলত রবীন্দ্রনাথ সমাজের একটি শ্রেণীর ভেতর দিয়ে সমাজের সাধারণ মানুষের একেবারে তৃণমূল জীবনযাপনের কথাই তুলে ধরেছেন সমাজের বাস্তবিক দিকে বিবেচনা করে।প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে তাঁর কাব্যে, সংশয়, সন্দেহ, যুক্তি, প্রশ্ন, বিদ্রোহ,বিক্ষোভের রূপ দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধদেব বসুর মত প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে বন্দী মানব আত্মার জন্য দুঃখিত। তিনি চিরকাল ভগ্ন হৃদয় উৎপীড়িত লাঞ্ছিত দের জন্য স্বপ্ন স্বর্গের অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু কি করে তা মর্ত্যে প্রতিষ্ঠা সম্ভব বা আদও সম্ভব কিনা বা সে বিষয়ে তিনি চিন্তা করেননি।তাঁর কাব্যে হুইটম্যানের আবেগ ধর্মী উচ্ছাস শোনা যায়, এলিয়টের মনন ধর্মী সংহতি অনুপস্থিত। আত্মবিরোধ এবং অনিকেত মনোভাব এইটি আধুনিক কাব্যের প্রধান লক্ষন যা তাঁর কবিতায় দেখা যায়।

কবি পৃথিবীর হত চৈতনের আশাহত তরঙ্গ থেকে উদ্ভূত, তাই তাঁদের বিশ্ববোধ প্রশান্তিতে স্থিত হতে পারেনি। তিনি অন্যায়-অসমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পৃথিবীর

সন্তান; কিন্তু তাঁদের চোখে এক নতুন মানববিশ্বের সবুজ স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত দেখার গরজে তারা সমাজের বিধিবিধান ও মূল্যবোধের আশ্রয়গুলোকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেছেন। আবার এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে তিনি বিশ শতকের সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রবাহ ও বিশ্লেষণধর্মিতা অবলম্বন করেন; অন্যকথায় প্রেমেন্দ্র মিত্র মার্কসের সমাজচিন্তা ও ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বে আস্থা রাখেন। তাঁকে তিরিশোত্তর কালে 'সমাজসচেতন কবি' বলে তাদের অভিহিত করা হতো। অবশ্য এ-সময় মার্কসবাদের প্রসারের অন্যতম কারণরূপে চিহ্নিত করা হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধকে। এ-যুদ্ধকে কবি ন্যায়-অন্যায়ের পরীক্ষা এবং ইতালি ও জার্মানীর ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের দ্বন্দ্বরূপে চিহ্নিত করেন। ফলে কাব্যজগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ভারতীয় রাজনীতি ও কবিতায় এর প্রভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়।এবং তাঁর কবিতাতেও এই রূপ জাগরিত হয়।কালের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার রূপান্তরও সম্পন্ন হয়ে যায়। বিশ শতকের বিশ্ব ও সমাজ সংগঠন অর্থনীতিবিদদের ভাষায় ধনবাদী বা Capitalist সমাজব্যবস্থা নামে পরিচিত; আর সমাজতাত্ত্বিকগণ নামকরণ করেছেন ইন্দ্রিয়বেদী বা Sensuous সভ্যতা। বলা বাহুল্য, এই সভ্যতা যন্ত্রভিত্তিক। বিজ্ঞান উদ্ভাবিত এই যন্ত্র যেমন ধনসম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলোকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে চলেছে, তেমনি স্থান ও কালকে জয় করে তা সমগ্র পৃথিবীকেও অবিশ্বাস্য রকমে ক্ষুদ্র করে ফেলেছে। আর এই ক্রমবর্ধিষ্ণু রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম মানুষের চিন্তায় ও প্রচলিত বিশ্বাসে পরিবর্তন, সনাতন মূল্যবোধের ক্ষয় ও নতুনতর আচরণের উদ্ভব ঘটে। ফলে এই সমাজ মানুষকে মানবিক সত্তা থেকে বঞ্চিত ও বিচ্যুত করে তাকে নিছক এক বস্তুতে পরিণত করেছে যার মূল্য ধনোৎপাদনে প্রয়োজনীয় বস্তু বা পণ্য অপেক্ষা কম। সুতরাং এই মানুষকে শোষণে, অত্যাচারে, পীড়নে, অস্বীকারে কোনো বাধা নেই; আর যন্ত্রের যেহেতু কোনো বিবেক নেই, সেহেতু মানুষের প্রতি এবং বিধি ব্যবহারে বিবেকের কোনো দংশন নেই। এমন পরিবেশে ভাল,মন্দ, সুন্দর,কুৎসিত, স্থূল,সূক্ষ্ম ইত্যাদির বিচারও যেনো কেমন হাস্যকর। সবকিছুই অস্তিত্বশীল, অথচ কোনো কিছুরই যেনো

কোনো সর্বসম্মত মূল্য নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় তাই বেশির ভাগ সময় দেখা যায় জীবনের সমস্ত দিকে সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়ে সৃষ্টি হয় এক নৈরাজ্যকর রাজত্ব। এই রাজত্বের চিত্রাবলী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কবিতায় অঙ্কিত হয়ে আছে। এই সময়ই ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশে আধুনিক কবিতার প্রকৃতি ও প্রবণতার মৌলিক পরিবর্তন ও প্রসার ঘটে। আধুনিক বাংলা কবিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশ্চিমের যুদ্ধ-সংঘাত ও আধুনিক কবিতা দ্বারা প্রভাবিত ও সম্প্রসারিত তা তাঁর কবিতার প্রধান চিত্র।'কল্লোল' পর্বের এই কবিদের লক্ষ্য মূলত দুটি দিকে প্রবাহিত; এক .সচেতনভাবে 'রবীন্দ্রোত্তর হওয়া', দুই .নিজস্ব কাব্যলোক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। 'কল্লোলে'র লেখকদের মানসিকতার পরিচয় মেলে জীবনানন্দ দাশের আলোচনায় : "কল্লোলের লেখকেরা মনে করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ অনেক সার্থক কবিতা লিখেছেন - কিন্তু তিনি যাবতীয় উল্লেখ্য বিষয় নিয়ে কবিতা লেখবার প্রয়োজন বোধ করেননি যদিও তাঁর কোনো-কোনো কবিতায় ইতিহাসের বিরাট জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়; তিনি ভারত ও ইউরোপের অনেক জ্ঞাত ও অনেকের মনে শাশ্বত বিষয় নিয়ে শিল্পে সিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের নানা রকম সংকেত রয়েছে যা তিনি ধারণ করতে পারেননি বা করতে চাননি।" সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সমকালের সাথে রবীন্দ্রনাথের দূরত্ব সম্পর্কে বলেন :"এ-কথা না মেনে তার উপায় নেই যে প্রত্যেক সৎকবির রচনাই তার দেশ ও কালের মুকুর, এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে যে-দেশ ও কালের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাদের সঙ্গে আজকালকার পরিচয় এত অল্প যে উভয়ের যোগফলকে যদি পরীর রাজ্য বলা যায়, তাহলে বিস্ময় প্রকাশ অনুচিত।" অন্যদিকে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবীন্দ্রদ্রোহের ফলে 'নতুন পথ' ও 'নতুন পৃথিবী'র সন্ধান পেয়েছেন : "ভাবতুম, রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শেষ, তাঁর পরে আর পথ নেই, সংকেত নেই। তিনিই সবকিছুর চরম পরিপূর্ণতা। কিন্তু "কল্লোলে" এসে আস্তে আস্তে সে-ভাবকেটে যেতে লাগল। বিদ্রোহের বহ্নিতে সবাই দেখতে পেলুম যেন নতুন পথ, নতুন পৃথিবী। আরো মানুষ আছে, আরো ভাষা আছে, আছে আরো ইতিহাস। সৃষ্টিতে সমাপ্তির রেখা টানেননি রবীন্দ্রনাথ তখনকার সাহিত্য শুধু তাঁরই বহুকৃত লেখনির হীন অনুকৃতি হলে

চলবে না। পত্তন করতে হবে জীবনের আরেক পরিচ্ছেদ'।কালের রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার রূপান্তরও সম্পন্ন হয়ে যায়। বিশ শতকের বিশ্ব ও সমাজ সংগঠন অর্থনীতিবিদদের ভাষায় ধনবাদী বা Capitalist সমাজব্যবস্থা নামে পরিচিত; আর সমাজতাত্ত্বিকগণ নামকরণ করেছেন ইন্দ্রিয়বেদী বা Sensuous সভ্যতা। বলা বাহুল্য, এই সভ্যতা যন্ত্রভিত্তিক। বিজ্ঞান উদ্ভাবিত এই যন্ত্র যেমন ধনসম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলোকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করে চলেছে, তেমনি স্থান ও কালকে জয় করে তা সমগ্র পৃথিবীকেও অবিশ্বাস্য রকমে ক্ষুদ্র করে ফেলেছে। আর এই ক্রমবর্ধিষ্ণু রূপান্তরের অবস্যাম্ভাবী পরিণাম মানুষের চিন্তায় ও প্রচলিত বিশ্বাসে পরিবর্তন, সনাতন মূল্যবোধের ক্ষয় ও নতুনতর আচরণের উদ্ভব ঘটে। ফলে এই সমাজ মানুষকে মানবিক সত্তা থেকে বঞ্চিত ও বিচ্যুত করে তাকে নিছক এক বস্তুতে পরিণত করেছেন যার মূল্য ধনোৎপাদনে প্রয়োজনীয় বস্তু বা পণ্য অপেক্ষা কম। সুতরাং এই মানুষকে শোষণে, অত্যাচারে, পীড়নে, অস্বীকারে কোনো বাধা নেই; আর যন্ত্রের যেহেতু কোনো বিবেক নেই, সেহেতু মানুষের প্রতি এবং বিধি ব্যবহারে বিবেকের কোনো দংশন নেই। এমন পরিবেশে ভাল,মন্দ, সুন্দর,কুৎসিত, স্থূল, সূক্ষ্ম ইত্যাদির বিচারও যেনো কেমন হাস্যকর। সবকিছুই অস্তিত্বশীল, অথচ কোনো কিছুরই যেনো কোনো সর্বসম্মত মূল্য নেই। জীবনের সমস্ত দিকে সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়ে সৃষ্টি হয় এক নৈরাজ্যকর রাজত্ব। এই রাজত্বের চিত্রাবলী প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কবিতায় অঙ্কিত হয়ে আছে। এই সময়ই ইউরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশে কবির বাস্তবিক আধুনিক কবিতার প্রকৃতি ও প্রবণতার মৌলিক পরিবর্তন ও প্রসার ঘটে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পশ্চিমের যুদ্ধ-সংঘাত ও আধুনিক কবিতা দ্বারা প্রভাবিত ও সম্প্রসারিত।

বিশ্বব্যাপী বিশ শতকীয় মার্কসবাদের উত্থান বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে বিবিধ ব্যঞ্জনা। মার্কসবাদে প্রভাবিত বাঙালি কবি লেখকদের রচনায় চেতনে অবচেতনে প্রকাশিত হয়েছে মার্কসীয় সাম্যবাদ। পৃথিবীজুড়ে লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক শিল্প-আন্দোলন ও সমকালীন নানা তাত্ত্বিক অনুষঙ্গ। যুগধর্ম ও

সমকালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো লেখকের চিরকালীন বৈশিষ্ট্য। অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার কারণেই সাম্যবাদী ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। এছাড়া আদিম সাম্যবাদী ধারণায় দেখা যায় যে, মার্কসবাদীদের মতে, মানুষের প্রাথমিক সামাজিক সংগঠনের রূপ ছিল যৌথ এবং সাম্যবাদী। জীবন রক্ষার জন্যে উৎপাদনের উপায়গুলো তখনো খুবই অনুন্নত। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাক্তিতে ব্যাক্তিতে সম্পর্ক ছিল অপরিহার্যরূপে সামাজিক ও সমষ্টিগত। উৎপাদিত বা সংগৃহীত খাদ্য সম্পদের ভোগও ছিল সমষ্টিগত। কালক্রমে এই সাম্যবাদী ধারণা বজায় রাখা যদিও কঠিন হয়ে পড়ে। তখনই আদিম সাম্যবাদী সমাজের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে দাসসমাজের ভ্রূণ। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ভাষ্য হচ্ছে, 'সত্যযুগে সর্বাধিক বিকাশপ্রাপ্ত দাসপ্রথার প্রথম উন্মেষ থেকেই শোষক ও শোষিতে সমাজে শ্রেণীভেদ ঘটে। পরিণামে আদি সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে সেখানে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটেছিলে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ রক্ষার প্রয়োজনে আবার রাষ্ট্রযন্ত্রেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এঙ্গেলস অবশ্য ইতিহাসের যুক্তি বিচার করে বলেছেন যে, প্রাচীন যুগে রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাস দমনের জন্য দাসমালিকদের রাষ্ট্র, যেমন সামন্ততন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস ও পরাশ্রিত কৃষকদের বশে রাখার জন্যে অভিজাতদের সংস্থা এবং আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্র পুঁজিকর্তৃক মজুরিশ্রম শোষণের হাতিয়ার। কিন্তু সাম্য, সাম্য শব্দটি এখন একটি সামাজিক ও আইনগত ধারণা। আইনানুগভাবে সমাজে সবার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ থাকবে এটাই সাম্যের প্রকৃত অর্থ। অর্থাৎ সাম্যের সাধারণ অর্থ হলো সমতা। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা মতে, সাম্য অর্থ সব বিষয়ে সমতা বা অভিন্নতা বোঝায় না। সাম্য বলতে বোঝায় সবার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার সমতা। লাস্কির মতে, সাম্যের অর্থ সবার সমান ব্যবহার বা একই কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিকই শুধু নয়, এর সঙ্গে ন্যায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এ ধরনের সমতা বা সমাবস্থা কখনো সঠিকভাবে প্রদর্শিত হতে দেখা যায়নি। মানব সভ্যতার প্রারম্ভকাল থেকেই একদল আরেক দলকে শোষণ করে এসেছে। যা বর্তমান অবস্থায় এসেও অনেকটাই বিরাজমান। এভাবে

একে অন্যের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কখনো প্রতিবাদ বা কখনো প্রতিরোধ ও হানাহানির পর্যায়ে আমূলিত হয়েছে। এজনই মানুষের মাঝে সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও মৈত্রিবন্ধন রচনার জন্যে যুগে যুগে নানা মনীষী সাম্যের কথা বলেছেন। একটি বৈষম্যহীন ও শোষণহীন সমাজ ও রাষ্ট্রেকাঠামোর পরিকল্পনা করে মনীষীগণ মানুষের মুক্তি কামনা করেছেন। ইতিহাসে তাঁকে ‘ইউটোপিয়ান’ সমাজতন্ত্রী নামে অভিহিত করেছে।প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সাম্যবাদী অমোঘ বাস্তবের সাথে জড়িত। তাঁর কবিতা আধুনিক সাম্য বাদী বাস্তবের দুর্বোধ্য ধারার প্রেক্ষা পটের সাথে যুক্ত। তাঁর কবিতা স্পষ্ট, অকপট, এবং বলা চলে শিল্পস্বভাবে মসৃন।কবির ভাবনার জানালায় যা দেখা মেলে তা চিত্রকল্প। রূপক, উপমার পাশাপাশি চিত্রকল্পও পাঠক বা সমালোচকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়া জরুরী। কেননা, চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবির নিজস্ব ঢং প্রকাশ পায়। কবিতার শরীরে অনাকাঙ্খিতভাবে চিত্রকল্প ঢুকে পড়লে কবিতার গঠনশৈলী বিকৃত হয়। কবিতা হয়ে ওঠে জটিল। তখন কবিতাকে আধুনিক বা উত্তর-আধুনিকতার দোহাই দিয়ে কবিতাকে তুলে ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর কবিতা অর্থবহ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।আধুনিকতার চাদর জড়িয়ে কবিতার দুর্বলতা আড়াল করা মানেই ঐ কবির আগামীর পথ রুদ্ধ করে দেওয়া তা তিনি জানতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অতি অপরিচিত কবির কবিতাটি বেশ মানোত্তীর্ণ, কিন্তু পরিচিত কবি বা সমালোচকের কাছে সেটি কবিতাই হয়ে ওঠেনি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বলে রাখা জরুরি যে, তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা তার নিজস্ব আলোয় আলো ছড়িয়ে থাকে। কিন্তু কবির দৃষ্টিভঙ্গি বা বোধের কাছাকাছি পৌঁছানো বেশ কঠিন। কেননা, এ বিষয়ে বিস্তর গঠনমূলক গবেষণা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। আধুনিকতা বা উত্তর-আধুনিকতা শব্দ দুটিই মানুষের সৃষ্টি, আমরাই আমাদের প্রয়োজনে এই শব্দদ্বয়কে সাহিত্যের পিঠে চড়িয়েছি। মূলত বিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যামূলক ভিত্তিতে বোঝানোর জন্যই এমন সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। সাথে সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতাকেও এই সরলরৈখিক উপপাদ্যের প্রমাণচিত্রে অহরহ অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। কিন্তু তা বলে তাঁর কবিতার শরীর

কাটা-ছেঁড়া করে কবিতার নিজস্ব ঢং বা গতি হারায়নি। সেই সাথে ছন্দচর্চা কবির কবিতার নিজস্ব ছন্দ। জোর করে হলেও, কবিতার নিজস্ব ছন্দকে মাটি চাপা দিয়ে তার ওপর অন্য ছন্দ বা ঢং প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ব্যস্ত হননি। উল্লেখ্য যে, তিনি জানতেন শিকড়কে বিসর্জন দিয়ে গাছের মগডালে ফল আশা করা বোকামি। সুতরাং, অতি-বাস্তবতার নামে কবিতাকে দিনে দিনে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য তিনি করেননি।অ্যান্ড্রিয়াস হুইসেন উত্তর-আধুনিকতাবিষয়ক একটি আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, 'উত্তর-আধুনিকতার অস্পষ্ট অবয়বহীন ধারণা এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই শব্দটির অপরিবর্তনশীল ব্যবহারে শব্দটির অস্পষ্ট অর্থ আমাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' একইভাবে, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি' গ্রন্থে 'আধুনিকতা ও উত্তর-আধুনিকতা' বিষয়ে বলেছেন, 'সমালোচকরা উত্তর-আধুনিকতার ব্যাখ্যায় কেউই একমত নন। এই উত্তর-আধুনিকতা একধরনের নব্যরীতিবাদ বা তার থেকেও নতুন কিছু।'

আধুনিক কবিতার নামে কবিতাকে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন বা গন্তব্যহীন করা উচিৎ নয় তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় স্পষ্ট। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সমকালীন কবিদের হাত থেকে যেসব কবিতা বেরিয়ে আসছে; সেসব কবিতায় আরও বেশি দর্শন, বোধ ও গঠণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণ। সাথে প্রাঞ্জলতা এবং সহজবোধ্যতাও প্রাধান্য পায়। কারণ কবিতা হলো কবির মনন ও মেধার সংমিশ্রণ। এই সংমিশ্রণের কোনো কাল নেই। জীবনবোধ ও নাগরিক-দাবীর কথা কবিতায় উঠে আসে অবলীলায়, নির্ভয়ে। কবিতা কোনো ব্যক্তি বা দেশের একমাত্র সম্পদ নয়, বরং তা বিশ্বসকলের। কবিতার মাধ্যমে বন্ধন তৈরি হয় মানুষ ও মানবতার। কবিতায় বাস্তবিকতা তুলে ধরতে হলে কবিকে আত্মসচেতন হতে হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রগতির স্বপক্ষে, মানুষের স্বপক্ষে। তিনি মূলত স্বাদেশিক কিন্তু ফলত বিশ্বনাগরিক। জগৎ ও জীবন প্রসঙ্গে কবি কথা বলেছেন সব কালেই।কবি সেই সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠেছেন নিজের সম্পর্কেও। বস্তুত বাস্তবিক কবির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি আত্মসচেতন।' সুতরাং, কবিতায় বাস্তবিকতা স্থান পেল কি পেল না তা পাঠক কিংবা সমালোচকেরা নির্ধারণ করবেন, কবির এ বিষয়ে মাথা ব্যথা করা জরুরী

নয়। কবির কাজ হলো কবিতার নন্দনতত্ত্বকে গুরুত্ব দেওয়া। তাহলে কবিতায় দুর্বোধ্যতা বা জটিলতা প্রসঙ্গটি দূরে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে, কবিতার নন্দনতত্ত্ব বা নান্দনিকতা কবির স্বকীয় বোধের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এই সংযোজনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিখনের প্রয়োজন নেই বললেই চলে। প্রয়োজন, কবিতার প্রেমে কামাতুর হওয়া, ধ্যানমগ্ন হওয়া। কবিতার জন্য অপেক্ষা করা। একটি কবিতার জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করা। সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। কবিতাকে পেশা নয় নেশা হিসেবে গ্রহণ করা। কবিতার নেশাকে নবায়নযোগ্য করে তোলা। কেউ কাউকে হাতে ধরে কবিতা শিখিয়ে দিতে পারে না। কবিতার হাতেখড়ি বলে কিছু নেই।প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা আধুনিক মানুষের মনোলোকের অন্ধকার সর্পিলতায় আমাদের টেনে নিয়ে যায় না। তাঁর কবিতা দ্বন্দ্বময় জীবনাবর্তের উপর এক ঝলক আলোক রশ্মির বিকিরণ ঘটায়। কবি বিশ্বাস যেন কবিতা লেখা হয় কবির গভীরতম স্তর থেকে। বন্ধন মুক্তির এক যন্ত্রণাময় উপলব্ধির প্রেরনা থেকে। কবিতা কবির আত্মমুক্তির সাধনা। শুধু তাই নয়, সহজ কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, আত্মমুক্তির সাধনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানব সমাজের বাস্তবিক মুক্তির সাধনাও। বাস্তব জগতের অসংখ্য ক্রূর সর্পিল আবর্ত থেকে মুক্তির নিশানাও দেবার চেষ্টা করতে হবে একজন সৎ কবিকে। এবং কবি যদি একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর অন্তরের উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন তবে নিতান্ত সরল কথা গুলিও বাজিয়ে তুলবে কবিতার সুর এবং ফুটিয়ে তুলবে জীবনের সত্য বাস্তব ছবি।

৯.২-সাগর থেকে ফেরা, জোনাকি মন, ও ফেরারী ফৌজ

কবিতার নামকরনের সার্থকতা ও কবিতার সারমর্ম-

প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিন্তার নিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবোধ ও অন্যান্য অনুসঙ্গগুলোসহ কবিতা নিয়ে ভাববার অখণ্ড অবসর শৃঙ্খলিত হয়েছে। সে কারণে ব্রিটিশ শাসনাধীন আমলে কবিতায় ঠাঁই পেয়েছিল শূন্যতাবোধ, চিন্তার দারিদ্র্যতা ও সর্বশেষ অস্বস্তিকর অস্থিরতা। চার্চ কেন্দ্রিকতাকে ভেঙে ঊনিশ শতকের ইউরোপীয় কবিতার যে যজ্ঞানুষ্ঠান হয়েছিল,

তাতে জোসেফ এপস্টেইনের প্রবন্ধে এই শূন্যতাবোধ সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মে। তার কিছু বৈশিষ্ট্য এরকম- অনেক সমকালীন কবিতা সম্মান পাবার যোগ্য। তবে সীমিত ও নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে সে কবিতা খুবই কম পঠিত হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা মোটেও বুদ্ধিজীবীদের নৈমিত্তিক খোরাকের পরিহাস নয়।তাঁর কবিতা তার মধ্যমঞ্চের ভূমিকা থেকে এখন নিজে নিজেই অন্তর্হিত হয়ে কার্যকারিতা করেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা অস্বাভাবিক, অদ্ভুত এক চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ। কবি ও প্রাবন্ধিক ওয়েন্ডেল বেরির ভাষায়, 'এ সময়ের অর্থাৎ আধুনিক কবিতার ক্ষয়প্রবণতাটি সাধারণত ভাষার এক অপরিহার্য বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। ভাষার এই ক্রমবর্ধমান আস্থাহীনতার সমান্তরালে একইকালে ক্রমবর্ধমান বিভাজন প্রক্রিয়াটির সহাবস্থান।' এ সমস্ত অভিযোগ ইউরোপীয় কবিতার জন্য ইউরোপীয় কবি ও সমালোচকদের। এই উপমহাদেশের কবিতার যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল তা তিনি সঠিক সময়ে ধরতে পেরেছেন। কোনো কোনো কবিতা ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। তার পিঞ্জরার মধ্যে তোতাপাখি প্রকাশিত হওয়ার পর প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পরে বাংলা ভাষী। আমরা আজ অবধি জানতে পারিনি কৃষ্ণভূষণ বল, বিষ্ণুবিভু ঘিমেরী ও মাধব ঘিমেরীকে। যে সমাজ শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে মানুষ ও জনপদকে বাঁচতে সাহায্য করে। এ ধারার কবিতায় পাওয়া যায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়। সমাজগীতি, নৃত্যগীত ও ফসল উৎসবের গান লক্ষ করা যায়। সংস্কৃতি ও হাজার বছরের ধর্মাবলম্বী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিল বলে সুবিশাল ভারত ক্রমাগতপৃথক হতে শুরু করে। ভারতীয় ঐতিহ্যধারার কবি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর কবিতায় ছিল প্রাচীন বর্বর ভাষীর নিকটতম ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং পালিত আচার অনুষ্ঠান। ভারতবর্ষ, বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ রাজনৈতিক দোলাচলে গঠিত এশিয়ার একটি দেশ। আমদের সংস্কৃতি স্বাজাত্যবোধ ইতিহাসের ভিন্ন মাত্রায় প্রবাহিত হলেও অভিন্ন একটি সুরের মূর্ছনায় নিমজ্জমান জাতীয়তাবোধ। এই দেশ মুসলিম হিন্দু, হিন্দু বৌদ্ধ জাতির সমন্বয়ে একটি অভূতপূর্ব দেশ। এই জায়গায় জন্মেছে গদ্য সাহিত্যের তিলকরত্ন লেখক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর। যিনি পশ্চিমা সাহিত্যের যাবতীয় অনুষঙ্গকে স্বীকার করে

এসেছে প্রথম থেকে। বিরোধিতা করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদকে। অথচ আমরা অবগত নই কিংবা মনোযোগ নেই সমাজের নিকটবর্তী শিল্প-সাহিত্য নিয়ে। এমন কি আমাদের মনোযোগ নেই, ভারতীয় স্থানীয় সাহিত্যে কি উলট-পালট হচ্ছে। কিন্তু কবিতার টানাপোড়েন আছে এবং তাতে খুলে যায় তৃতীয় মাত্রার চোখ-

নীল ! নীল !

সুবুজের ধোঁয়া কিনা, তাও দুঝিনা,

ফিকে গাড় হ্রেক রকম

কম-বেশি নীল!

তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল

ক'টা গাঙ চিল.....

(সাগর থেকে ফেরা)

এই কবিতায় আধুনিক মেজাজ আছে বটে, কিন্তু তার সাথে দুর্বোধ্য , স্পষ্ট কিন্তু রহস্যহীন , সুগম এবং সৌন্দর্যময়। খুব সুগম্য কবিতা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কবিতার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তাঁর কবিতা ঐতিহ্য ভারাতুর। বলা হয়ে থাকে তাঁর কবিতার সঙ্গে বাংলা সামাজিক পরিণতির অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সে সময়ের অন্যতম কবি। আমরা কখনো আমাদের উপমহাদেশের কবিতা কিংবা ভারত মহাদেশের স্থানীয় কবিতার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিনি। কারণ প্রথম উপনিবেশ মোগল আমলের রাজ কবি এবং সভাকবিদের রাজ-রাজাদের স্তুতি, কবিতায় বিষয় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সম্ভার নিয়ে আসতে পারেনি। দ্বিতীয় উপনিবেশ ব্রিটিশ শাসনামলেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হয়। কবিতায় ও গদ্যে ইউরোপীয় সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঢুকে নকল আভিজাত্য প্রকাশ পেতে থাকে। ফলে কবিতা হয়েছে ধর্মীয় জিগির, ধর্মীয় অনুশাসনের দলিল।

কবিদের ধারাবাহিকতায় আধুনিক জটিল সময়গ্রন্থিকে উন্মোচন করে সম্প্রসারিত করেছে ভাষা ও বিষয়। অপর অংশ লোকায়ত জীবনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রকাশ করে যাচ্ছে নিজস্ব মহিমায়। এতে কবিতার ভাষায় দ্বিগুণ শক্তি এসেছে। বিষয়ে বৈভব

ছড়িয়েছে। নতুন উদ্দীপনায় নিজস্ব সংস্কৃতি ইতিহাসের ভেতর থেকে এক জাতীয় অসাম্প্রদায়িক চেতনার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এটি তৈরি করে দিয়েছে প্রথম অংশ, যারা বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিকতাকে বরমাল্য পরিয়েছেন। তিনি শুধু আমাদের অর্জনের কথা বলতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর সমগ্র জেলায় ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঁচ হাজার কবির নিশ্চয় পঞ্চাশ লক্ষ কবিতা লেখা হয়েছে। তাঁর উল্লেখিত এই কবিতা গুলি কোনো নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে। তাঁর রচিত কবিতার রোদেল দুপুরে আমাদের ক্রম অগ্রসরমান স্বপ্ন প্রলম্বিত হয়েছে। শিক্ষিত ও চিন্তাশ্রিত করেছে সময়কে। আমি মনে করি কবিতার চোখ কোনো স্বপ্ন দেখা ও দেখানো ছাড়া কোনো শক্তি নেই। বিশ্বযুদ্ধ উত্তর কবিরাও স্বপ্ন দেখিয়েছে বিধ্বস্ত বিশ্বকে পুনর্গঠিত করার, সাহস যুগিয়েছে নতুন দর্শনের আলোকে একটি যুগোপযোগী বিশ্ব তৈরি করার। প্রতিবাদের আগুনে ঝলসে উঠেছে কবির শব্দের ব্রহ্মাস্ত্র। আবার কখনো অনুভূতির প্রবল স্নিগ্ধ শব্দগুচ্ছ নিয়ে নান্দনিকতার সৌকর্যে পরখ করেছেন অনাবিল সৌরভকে। এভাবে তাঁর কবিতা যুগে যুগে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। কবিতা সাহিত্যের সবচে' অনুভূতিপ্রবণ প্রপঞ্চের মধ্যে সর্বোত্তম। এটি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার লেখককুল যেমন স্বীকার করেছেন। স্বীকার করেছেন সাহিত্যের বাইরে সংবেদনশীল পাঠক। পাঠকের রায়ে কবিতা কখনো দুর্বোধ্য, আবার কখনো সচল বহতা নদীর মতো স্নিগ্ধ। এটি সত্য যে সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতার মধ্যে আছে। একটি জনপদের প্রতি বর্গমাইলে যদি তিন সহস্র মানুষ বাস করেন, তিন সহস্র মানুষের মধ্যে ১০ জন কবিতার পাঠক পাওয়া যাবে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে পারে।

বিশ ও ত্রিশ শতকের আর্থসামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন চাহিদা ও যোগান আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। চাহিদা ও যোগান এক সাথে স্থিত না হওয়ায় যুবকদের মধ্যে অস্থিরতা বেড়েছে। প্রকৃতপক্ষে কবিতা বোঝা ও গ্রহণের স্বাদ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তৈরি করেছিলেন, সেই মনোবৃত্তি পরিবর্তন হলেও সমৃদ্ধ মনন তৈরি হতে সাহায্য করেনি। মানুষের কিছু প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপর চালাকি বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কবিতার জন্য কোনো মনোনিবেশ গড়ে তোলেননি।

আবার একথা না বললেও অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় যে, রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় শরীরে ঢুকেছে হিংস্রতা, শব্দসন্ত্রাস। ফলে কবিতা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি থাকেনি। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' থেকে যে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের গুণমুগ্ধ সরলতা সেটি ঊনিশ শতক পরবর্তী কাব্যধারায় ছিল দুষ্প্রাপ্য। কথা হলো, ঊনিশ শতকের রবীন্দ্র সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের চালচিত্র আজকের প্রযুক্তিনির্ভর অগ্রবর্তী সমাজ ও জনপদে কী রূপ নিয়ে আসতে পারে? কতটা সারল্যের গুণ থাকলে এই জনপদের মানুষ আবার কবিতামুখী হবে? প্রশ্ন জাগে কবিতা কি সবার জন্য? না কি কবিতা যে লেখে আর কবিতা যে পড়ে সে রকম কয়েক জনের জন্য? সম্ভবত সব সমাজে কবিতার পাঠক ও শ্রোতা কম ছিল বলে কবি হোমার এক সময় ইউরোপ থেকে ঘোষণা দিয়েছিল যে- কবিতা পড়া ফুটবল খেলার মতোন সহজ হোক। অবাক না হয়ে থাকা যায় না যে, কবিতার এসথেটিকস্ নিয়ে চূড়ান্ত সব বই লেখা হয়েছে ইউরোপে। কবির ধারণা ছিল কবিতাকে জনমুখী করার জন্য কবিতা আর সহজ হবে না। সম্ভবত এ দায়িত্ব কবিরা নেবে না। সাধারণ মানুষের চিন্তা ও স্বপ্ন থেকে কবিরা আলাদা মাত্রার স্বপ্ন দেখেন বলেই তো তারা কবি। প্রেমেন্দ্র মিত্র পিছিয়ে পড়া জনপদকে টেনে তুলেছিলেন, জনপদের সমান চিন্তার ধারক হয়েছিলেন। দায়িত্ব সেসব মানুষের, যুবকদের যারা সমাজ বিনির্মাণ ও নান্দনিক প্রত্যয়কে প্রকাশ করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় কবিতার সহযাত্রী হয়েছিলেন। আজকে আমাদের কবিতা সেসব জায়গাগুলোতে রোপণ করতে যাচ্ছে স্বপ্নবীজ। বস্তুত পৃথিবী এক রকমের সংকটের মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। একদিকে নব নব প্রযুক্তি এবং শক্তি পরীক্ষায় অস্ত্র কেন-বেচার হাটে পৃথিবী ও তার মানুষ ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত। এই দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে পৃথিবী ও তার মানুষ অনুসন্ধান করতে চাইছে জাতিগত পরিচয়, নিজের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলার দুর্বার সাহস। লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের শেকড় সমৃদ্ধ জনজীবনের বিশ্বাস ও ভূমিচেতনা, ক্রমশ ইউরোকেন্দ্রিকতাকে পরিত্যাগ করে স্ফীত হচ্ছে। আফ্রিকাও পিছিয়ে নেই, তাদের সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক অহংকার থেকে। মুক্তি ও সনদ নিয়ে দাঁড়িয়েছে এডওয়ার্ড সাঈদ,

মিশেল ফুকো ও দেরিদা। তাদের হাতেই আছে প্রাচ্যের স্নিগ্ধ অহংকার। সে কারণে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় পাওয়া যায় লোকজ বাংলার বৈভব-

এ এক জোনাকি মন

জ্বলে আর নেভে

আন্ধকার পার হবে ভেবে

ইতি উতি ধায়

আলোর ছুঁচের মত

বিঁধে বিঁধে মহা যবনিকা

অন্তরের এক প্রান্তে

ঝিকমিক চেতনার পাড় বুনে যায়।

বিদ্যুতের ব্রত নিয়ে

এতটুকু সীমার আকাশে

ক্ষনে ক্ষনে এও চমকায়।

(জোনাকি মন)

মিথকথনের মিতালী, কিশোর-কিশোরীর স্বপ্ন, রূপকথা; এমনকি চাঁদের বুড়ির গল্প

বলাও আছে যেন এই কবিতায়। সীতা যেখানে গমন করুক রামের সুমতি ও প্রেম

সঙ্গে আছে। দ্রৌপদীর শাড়ি কখনোই খুলবে না, যতই চেষ্টা করুক দুঃশাসনেরা।

অতএব কবিতা নিয়ে দুর্ভাবনা নয়। কবিতার কখনোই মৃত্যু হবে না। জনপদের রক্ত

মাংসের মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন অনুভূতির রক্তে স্বাদ নেবে কবিতার

ভাষা। সুবোধ্য ভাষার আশ্চর্য যোগাযোগ পাঠক ও কবির। বিষয় ও আঙ্গিকের সরলতায়

অভিনব শব্দের গাঁথুনি। এটিই হোক বাংলা কবিতার ব্রত।

তিরিশ-এর অবক্ষয় ও সাম্প্রতিক কবিতার স্বর

বাংলা কবিতা যখন সুস্থধারার সমন্বিত একটি জায়গায় বাঁক নিচ্ছে, বদলে দিচ্ছে এবং

বদলেও দিয়েছে অনেকটা পথ, শাশ্বত সেই বদলে যাওয়ার চিরন্তন অভিপ্রায়কে

ঘোলাটে করার জন্যে কবি-চিন্তকের মস্তিষ্কে আবারও সেই ঔপনিবেশিকতার ভূত চেপে

বসেছে। ফলে কোন কারণ ছাড়াই পাশ্চাত্য চিন্তা ও চিন্তকের সঙ্গে বাংলা কবিতার চরিত্র লক্ষণের একটি সম্পর্ক তারা অনায়াসে তৈরি করে ফেলেন। সোচ্চার কণ্ঠে ব্যক্ত করেন; এই সময়ের বাংলা কবিতায় ঐতিহ্য, ইতিহাস, লোকায়ত আচরণ সর্বোপরি মিথের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। এটি শুরু হয়েছে সেই ঊনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে এবং বিশ ও ত্রিশ শতকেও বর্তমান। সেই কারণে বারংবার বাংলা কবিতায় তিরিশের দশকটি এসে পড়ে। বিশ ও ত্রিশ দশক পর্যন্ত কবিতার কী চরিত্র লক্ষণ ছিল তাও সঙ্গত কারণে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দাবী করে। এসব বিষয় নিয়ে দেন-দরবার হয়েছে এবং এন্তার লেখা হয়েছে বিগত দু'তিন দশক ধরে। আধুনিকদের মধ্যে অনেকে স্বীকার করে নিয়েছেন, দু'শ বছরের আধুনিকতার মধ্যে ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুঃশাসন যৌনতা রিরংসা এবং স্বৈরাচারী মনোভাব, যা বিকলাঙ্গ, বিপর্যস্ত করেছে এদেশের অথবা এ অঞ্চলের স্বাধীন চিন্তার ধারক বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও একাগ্রতাকে। মূলত কারেন্সি সভ্যতা বিকাশের পর্ব থেকে আরো বেশি রকমের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজ-সভ্যতা। বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পতনের পর সমগ্র বিশ্ব একটি গ্রাম বিশ্বে পরিণত হয়। সেই সুযোগে আধুনিক পুঁজিবাদী বিশ্ব নতুন কৌশলে দেশ ও সংস্কৃতি দখলের মাত্রা অন্যতর ব্যাঞ্জনায় উপস্থাপিত করে- যা দরিদ্র তথা তৃতীয় বিশ্বের কবি, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্য-পিপাসু মনকে পাশ্চাত্যের ঘটকে পরিণত করে। প্রেমেন্দ্র মিত্র এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি।কিন্তু জাতিগত ধারণায় স্পষ্ট করতে পরেছেন স্বসাহিত্য ও সংস্কৃতি।তিনি জোর করে তৈরি করেননি কবিতার অনুকূল পরিবেশ। এই ধারণা স্পষ্ট থাকা দরকার যে একটি জাতি পূর্ণাঙ্গ জাতি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় তখন- যখন উপলব্ধির ক্ষেত্রগুলো পুনর্বিবেচিত হয়। যেমন একটি জাতির ভাষণ কী? সংস্কৃতি ও ইতিহাস সেই জাতি গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনায় কী ভূমিকায় থাকে? সেই জাতি দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে কোন সৌন্দর্যের অন্তর্গত হয়ে শিল্প সাহিত্যের জায়গাগুলো স্পষ্ট করে?

একথা আজ অনস্বীকার্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক বিবেচনা থেকে আমাদের দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়নি। এদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা, সাংস্কৃতিক আচরণ, লোকায়ত জীবন প্রবাহ ভিন্ন

ব্যঞ্জনায় একমাত্র বাঙালির অহংকার ছিল বলে নয় মাসব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে মুক্ত হয়েছিল বাধা বিপত্তি ও নৈরাজ্য থেকে বিশ শতকের বাংলাদেশ। কবিতায় বাস্তব আমাদের সংস্কৃতির ফসল। ইতিহাসের আমাদের বাতিঘর। আমরা সেই বাতিঘর থেকে আলো বিলিয়ে একটি উত্তর আধুনিক জীবন প্রবাহে শামিল হতে চাই। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতি মনোউপনিবেশিকতা সৃষ্টি করে মোটা দাগে এগিয়েছিল। আরো একবার পরখ করলে এর মর্ম উদ্ধার করা কঠিন হবে না। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় কী আছে? বেদনাহত একাকী মানুষ মূলত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তার কাব্য।ফেরারি ফৌজ এ সমাজতন্ত্র সচেতন কবিরূপে তাঁর যত প্রচার- তার অনুরূপ কবিতা তাঁর রচনাবলীতে ততটা লভ্য হয় না। এমনও লক্ষ করা গেছে তার প্রেম স্পর্শ চিহ্নিত ব্যক্তিগত কবিতাকেও অনেকে সামজতান্ত্রিক পরিচয় চিহ্নিত কবিতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি জনসাধারণকে এড়িয়ে নিজের ব্যক্তি চেতনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তিরিশের কবিবৃন্দ ও কবিতাকে অন্তর্গত ধ্যানে পাঠ করলে বোঝা যায়। পাশ্চাত্য ইতিহাস-পুরাণ-ভূগোল-সঙ্গীত-সাহিত্য ছন্দ তত্ত্বের জগৎ থেকে তাঁরা অকৃপণ হস্তে ধার করেছিলেন বাংলা কবিতাকাশকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। যেমন পাশ্চাত্য মিথের কথা বলা যায়। ‘আর্টেমিস’, ‘বুদোয়ার’, ওফেলিয়া’, ‘হেডিস’, ‘প্যান্ডার’, ‘ক্রেসিডা’, ‘হেলেন’, ‘ট্রয়লাস’, ‘সিরোক্কা’, ‘গ্যালাহাড’, ‘ভিয়েলা’, মিথের এসব চরিত্র কোন পূর্ণাঙ্গ মানসিকতা নিয়েও আবর্তিত হয়নি। হঠাৎ ঢুকে পড়েছে কবিতার কোন এক জায়গায় এবং কোন অনিবার্য প্রয়োজন থেকেও আসেনি। এইসব কবিতা আধুনিক যুগ-চেতনার মধ্যে মানুষের কাছে পৌঁছানোর যে ব্যাপারটি সর্ব প্রধান শর্ত, তার পরিচয়ও এখানে তেমন নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আধুনিক কবিতার সব থেকে বড় জামিনদার বলা হয়। প্রায়শঃ তাঁর কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতীককে অনেকেই আধুনিক বলতে নারাজ ছিলেন। অনেকেই মনে-করেছেন যুগচেতনা নিরপেক্ষ ব্যক্তিগত ব্যাপার। যেমন ‘সাগর থেকে ফেরা’ যৌবনের প্রতীক। শাপভ্রষ্ট, বন্দীর বন্দনায় কবির ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির প্রতীক। ‘জোনাকি মন’, ‘ফেরারি ফৌজ’, কবিতার নির্বিশেষ আত্মচেতনা বাস্তবতার প্রতীক। অন্ধ রাত্রিও তমসা দিয়ে

গড়া তাঁর জোনাকি মন কবিতা। শূন্য দিনের প্রতীক 'ফেরারি ফৌজ' কবিতা। এ সমস্ত প্রতীক ও অনুভূতি কবির নিজস্ব ব্যক্তিত্বের জায়গা ছাড়িয়ে সর্বসাধারণীয় ব্যাপার হয়ে ওঠতে পারেনি। তাছাড়া আধুনিক হয়েও আধুনিক জীবনের ইংগিত এখানে সুলভ্য নয়। তিনি সবার অলক্ষে শূন্যতাকে মেপেছেন দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আলোকে। এইভাবে তিরিশ আধুনিক কবিতা বেড়েছে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁর মনোবিকলনের উন্মত আবহে। সমর সেন একটি কবিতায় বলেন, মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস/স্যাকারিনের মত মিষ্টি/ একটি মেয়ের প্রেম। স্থূল চতুর প্রবঞ্চনা বিলাসী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি বিদ্রুপ ও ঘৃণা। মধ্যবিত্তের মন্থর রক্ত, এখানে কোন আবর্তন কোন স্রোতোশ্চলতা নেই। অনেকটা এলিয়টের নায়কের মতো, ...এক নিষ্ঠুর পৃথিবী সমর সেনের কবিতার গভীর সংক্রামিত। এ সমস্ত কথার পরে প্রশ্ন আসে, একজন কৃষি প্রধান অর্থনৈতিক, দেশের মানুষ, সমতল ও পাহাড়ী প্রান্তিক মানুষের পেশাজীবিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত মানুষের সুস্থ স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে এসমস্ত চিন্তার ঐক্য কোথায়? যে আধুনিকতা ব্যক্তিগত সমুদ্রে আকুণ্ঠ ডুবে অপর কে বাঁচিয়ে তোলার নিতান্ত মূর্খ স্বপ্নে নিমজ্জিত থাকেন- সেই আধুনিকতাকে দরকার আছে কি না ভেবে দেখা দরকার।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় কয়েকটি সাদা ফেনা, শাঁখ মাজা, কূল ছাড়া জল সমস্ত যুগ ধরে ভাসমান। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, "এটি কোলকাতা নগরের আংশিক চিত্রপট, নৈরাজ্যের ছায়া নাগরিক চেতনার উৎকটগন্ধী বায়ু প্রবাহ। সত্যিকারের কোলকাতায় সে সময় এরকম আবহ বিরাজমান ছিল কি না বলা মুশকিল। বস্তুতঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী নগরীকে খোঁজেনি, পাশ্চাত্যের তত্ত্ব আহরিত রঙিন চশমায় কৃত্রিমভাবে কোলকাতাকে দেখা আরাধ্য ছিল। আমরা ভেঙেছি ধান,আমরা ভেঙেছি গম জোয়ার বাজরা আর শস্য অড়হর আমরা তুলেছি পাট। আমরা বুনেছি শাড়ি গড়েছি পাথর, আমরাই ধরি হাল আমরাই করি গান "বিষ্ণু দে" ধরা যাক তিনি এখানে মানুষের প্রতিনিধি। সব মানুষের হয়ে কথা বলেছেন। যে মানুষ সকল কালের। কিন্তু সে মানুষের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আধুনিক যুগ মানসিকতার ফল। প্রকৃতপক্ষে আধুনিকতা ও সমাজতন্ত্র এক সঙ্গে হাটতে পারে না। যেহেতু আধুনিকতা তাই পুঁজির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে নির্মাণ করেন

অলীক স্বপ্ন। আর সমাজতন্ত্র সেখানে সাধারণজীবী মানুষের উৎপাদনে চলমান মানুষের নির্বিঘ্ন স্বপ্ন-পুরাণ। তা হলে বিষ্ণু দে সেই আধুনিকতাকে স্বীকার করে সমাজতন্ত্রী হন কিভাবে? প্রশ্ন থেকে যায় আজকের পাঠকের কাছে। তারপরেও তার কবিতার এই ভাবসম্পদ ভারত বর্ষের নয়, পাশ্চাত্যের। তবু হঠাৎ আসে যখন পাতা ঝরার দিন, দমকা হাওয়া থেকে থেকে ছাদ- ছাড়ানো গাছের মাথায় লাগে। আমার শহর খানিক বুঝি ঝিমিয়ে পড়া তন্দ্রা থেকে জাগে। চিমনি তোলা ঊর্ধ্বমুখে আকাশ পানে চেয়ে কিভাবে সেই জানে। ভেবে ভেবে পায় কি নিজের মানে? গোল বেঁধেছে কল ফেঁদেছে বসিয়ে বাজার হাট, রাস্তা পেতে মেলেছে ঢের রং-বেরং-এর হাট প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কবিতার প্রথম পাঁচটি পঙ্‌ক্তি অসাধারণ ভঙ্গিমায় উপস্থাপিত হয়। মানুষের অনুভূতির রেজারেকশনও হয়। অশান্তির পরে যেন সব শান্তি গলায় গলায় ভাব জমায়। এই মেজাজিয়ানা বা সম্পূর্ণ প্রেমেন্দ্র মিত্রের একার। নৈরাশ্য হতাশা নাভিশ্বাস এ সমস্ত রূপকল্প থাকলেও কোথাও যেন বা ইতিবাচকতা শেষ পর্যন্ত উঁকি মারে। ঊনিশ শতকের কোলকাতার জীবনের বিভীষিকা কম চোখে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কোন দফা-রফা হয় না। পাশ্চাত্য আসে ভর করে তার কাব্যের দরোজায়। অনেকটা এরকমভাবে ক্লান্ত বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে কাল্পনিক সমাজ বিনির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন তিরিশি কবিবৃন্দ। তিরিশি এবং তিরিশ পরবর্তী কবিদের এই আত্মরতি রিরংসা সর্বোপরি হতাশার গহীনে নিমজ্জিত এই ঊনিশ শতকের শুরুর পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯০৬ এ শুরু হয় ফবিজম, ১৯০৭ সালে কিউবিজম, ১৯১০ সালে ফিউচারিজম এবং পরবর্তী পর্যায়ে আসে ডাডাইজম। যেটি কবিতার উপরে নিরন্তর প্রভাব ফেলে চলেছে। ডাডাইজমের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে; এই আন্দোলনের ভাবধারনায় প্রভাবিত সুররিয়ালিজম। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রুমানীয় কবি ত্রিস্তান জারা, হুগু বেল, রিচার্ড হলম্যান কবি ও স্থপতি হেন্স আর্প। ‘ডাডা’ ফরাসি শব্দ, অর্থ কাঠের ঘোড়া। একদিন ত্রিস্তান জারা একটি কাফেতে বসে এক ফরাসি অভিধানের প্রথম পাতায় বসিয়ে দেন এক তীক্ষ্মাগ্র ছুরি। ছুরির ডগা যে পাতায় গিয়ে শেষ হলো, সেখানে ‘ডাডা’ শব্দটি রয়েছে। কিন্তু ছুরির শীর্ষ তাকে স্পর্শ করে-নি। কবিতা আন্দোলন, শ্রুতি

আন্দোলন, হাংরি জেনারেশন, স্যাড জেনারেশন, এংরি জেনারেশন ঐতিহাসিক ও সামাজিক অভীপ্সা থেকে লক্ষ্য করলে এ সমস্ত আন্দোলনের কোন উৎসভূমি পাওয়া যায় না। এর কোন ইস্তেহার নেই; যে সমাজে বড় ধরনের কোন অসংগতির কারণে আন্দোলনগুলো কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে নতুন স্বপ্ন ও জাগরণে ভূমিকা রাখতে পারে। এসব কারণ পর্যালোচনা করলে বাংলা কবিতার বিশ এবং ত্রিশ শতকীয় দর্শনে কেবল উঠে আসে ক্লেদ বিবমিষা হতাশা ও ক্লান্তি। এই দিন গুলিই প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনুভূতি ও মেধাকে শোষণ করেছে। পরান্নভোজী ও অধীনস্থ করে রাখা হয়েছিল, যাতে বাঙালি জাগে স্বপ্নে ও সীমানায়, রাষ্ট্রে ও দর্শনে। সেই সঙ্গে খুলে যায় কবিতার নান্দনিক ও ইতিহাস ঐতিহ্যের জায়গা। এরই ভেতরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্রের আধুনিক কবিতাভূমির জন্ম হয়। কবিতার নতুন ভাষাভঙ্গি ও কাঠামোর মধ্যে সরল চারুতায় যুক্ত হয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও লোকায়াত আচার।

কবিতার মেজাজ ও বিষয় একবারে আলাদা। সম্মুখের ভাবনাগুলোকে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্প্রসারিত করে। কিছু কবিরা উত্তর আধুনিকতায় বিশ্বাস করেন না। তাদের বিষয়ে ও ভাষায় এর কিছু প্রস্তাব রয়েছে বিধায় উল্লিখিত হলো। যাদের এখনো সন্দেহ কিংবা বোঝার ফাঁক রয়েছে, কি কি কারণে একটি কবিতাকে উত্তর আধুনিক কবিতা বলা যেতে পারে, তাদের বোঝানোর ব্যাপারে হয়তো সাহায্য করবে। প্রধানত ভাষার বুনন, বিষয় নির্বাচন, ছন্দের গাঁথুনি, সহজিয়া সুর এবং পুরনো অতীতকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহারের চতুরতা, সুগম্য আঙ্গিকে উপস্থাপনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাছে দেশ ও জনপদের অনেক কাছের বলে অনুমিত হয়েছে। উত্তর আধুনিকতা বিবৃত হয় স্থানিক সংস্কৃতির আবহে-বর্তমানে বিম্বিত হয়ে ভবিষ্যতের নির্দেশনা কে মেনে নেয়। এটি একক কিংবা একপেশে ধারণা নয়, ব্যক্তিগত অনুভূতির ঝরামালা নয়, একগুচ্ছ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কাছে দায়বদ্ধ, এটি মাটিগন্ধি সংস্কৃতির মিলিত মোহনা, ক্রমশই সাহিত্য আন্দোলন থেকে বৃহত্তর সমাজ ও সচেতনতা বোঝে আবিষ্ট হয়ে একটি সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্র-ব্যবস্থাপনা অঙ্গীভূত হতে চলেছে। সাহিত্যের জন্যেও এই অঞ্চলের বাঙালির জন্য আর কোন নতুন সাহিত্য আন্দোলনের দরকার হবে না। এই দার্শনিক

প্রত্যয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাপনায় এই গোটা অঞ্চলের মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষের জাগরণের দুয়ার খুলে দিচ্ছে নতুন ব্যঞ্জনায়।'আমি কবি যত ইতরের....' ঘোষণা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। 'ফেরারি ফৌজে'র মতো একটি অপ্রতিরোধ্য রূপক ছিল তাঁর আস্তিনের ভিতর। সর্ব-অর্থে একজন 'আধুনিক' কবি। চার প্রজন্ম পেরিয়েও তাঁর কাব্যশরীর, অলংকারের ভাষ্য পাঠককে ফিরে পড়ায়। মন দিয়ে পড়তে বাধ্য করে। বাংলাকবিতার শিরদাঁড়ায় রসসঞ্চার করে অনিবার্য লিরিকমন্যতা। সঙ্গীতধর্মের পুনরাবৃত্তি লক্ষণটিই লিরিক-আশ্রিত। এই প্রবণতাটির নির্ভর করেই অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ বাংলাকবিতাগুলি রচিত হয়েছে গত দুশো বছর ধরে। সংস্কৃত মন্ত্রের জোরের জায়গা তার পুনরাবৃত্ত শব্দের ঝংকার। উপযুক্ত উচ্চারণে দৈবী অভিঘাত সৃষ্টি হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে পুরাতন রীতি। কিন্তু লিরিকছাঁদকে আত্মস্থ করেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের আধুনিকতা ছিল তাঁর চিন্তার সার্বভৌম চলনে। কবিতাকে স্থান-কাল-পাত্রের সীমার মধ্যে বেঁধে রাখতেন না। হরিণ-চিতা-চিল, সব স্তরগুলিতেই সমান স্বচ্ছন্দ তাঁর ভাবনার যাওয়া-আসা। সিনেমার সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে কবিতায় দৃশ্যের জন্ম নিয়ে তাঁর সহজ অধিকার, মনস্ক পাঠকের চোখে পড়বেই। তথাকথিত 'কল্লোল-যুগে' যেসব অগ্রণী বাংলাকবিরা যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার মুকুট কে পেতে পারেন তা নিয়ে নানা মুনির বিতণ্ডা মনে না রেখেই বলা যায় প্রেমেন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করা সহজ নয়।

৯.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম ১৯০৪ এবং মৃত্যু ১৯৮৮ সালে।

২- প্রেমেন্দ্র মিত্র কটি পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন?

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে মুরলীধর বসুর সহযোগিতায় কালিকলম (১৯২৬)পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

৩- প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা কাব্য গুলির নাম উল্লেখ কর।

মন্তব্য

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্য গুলি হল- প্রথমা(১৯৩২), সম্রাট (১৯৪০), সাগর থেকে ফেরা (১৯৫৬), ফেরারী ফৌজ (১৯৫৮), হরিণ চিতা চিল (১৯৫৯), কখনো মেঘ (১৯৬১), অথবা কিন্নর (১৯৬৫), নদীর নিকটে (১৯৭২), গল্পগ্রন্থ : পঞ্চশর(১৯২৯), বেনামী বন্দর(১৯৩০), পুতুল ও প্রতিমা (১৯৩২), মৃত্তিকা(১৯৩২), অফুরন্ত (১৯৩৫), মহানগর(১৯৩৭), ধূলিধূসর (১৯৩৮), নিশীথ নগরী (১৯৩৮), কুড়িয়ে ছড়িয়ে (১৯৪৬), সামনে চড়াই (১৯৪৭),প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প- সপ্তপদী (১৯৫৫), জল পায়রা (১৯৫৭), নানা রঙে বোনা(১৯৬০), উপন্যাস : পাঁক (১৯২৬), কুয়াশা (১৯৩০), মিছিল (১৯৩৩), উপনয়ন (১৯৩৩), আগামীকাল (১৯৩৪), প্রতিশোধ (১৯৪১), প্রতিধ্বনি ফেরে (১৯৬১), অন্য এক নাম (১৯৬২), পা বাড়ালেই রাস্তা (১৯৬২), পতাকা যারে দাও (১৯৬৩), স্তব্ধ প্রহর (১৯৬৩), মনুদ্বাদশ (১৯৬৪), অমলতাস (১৯৬৫), স্বপ্নতনু (১৯৬৫), দিগ্বলয় (১৯৬৭), যিনি বিধাতা (১৯৭০), সেই যে শহর রাজোলি(১৯৭২)।

৯.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য সাহিত্যে মানসিকতার-দন্দ কি ভাবে প্রকাশিত হয়েছে?

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জী

সাগর থেকে ফেরে- কাব্য গ্রন্থ,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

মন্তব্য

একক-১০ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

বিন্যাস ক্রম

১০.১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র।

১০.২ শাশ্বতী, সৃষ্টির রহস্য, সংবর্ত,প্রতীক্ষা- কবিতার নামকরণের সার্থকতা ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ভিত্তিতে তাঁর কবিতার সারমর্ম।

১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১০.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় তৎকালীন সমাজ চিত্র

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্য ধারার একজন বিশিষ্ট কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘আকাশ-প্রদীপ’ কাব্যটি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন, ‘ আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধন ক্ষেত্র থেকে একে গ্রহণ করো’। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সংবর্ত কাব্য গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, ‘অন্তত পক্ষে আমার লেখায় আধুনিক যুগের সাক্ষর সুস্পষ্ট’। উপরিউক্ত দুটি উক্তি থেকে সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, যে আধুনিক কবিগণ বাংলা কবিতার রবীন্দ্রো উত্তর প্রধানতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি কোনদিন তীব্র কণ্ঠে রবীন্দ্র বিরোধিতা করেন

নি। বরং রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতে পেরেছেন স্বকীয় জীবন অভিজ্ঞতার স্বাতন্ত্রে ও চৈতন্যের একান্ত আত্মনিষ্ঠায়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সুধীন্দ্রনাথকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন- '.....তোমার কাব্য এসেছে সাহিত্য ক্ষেত্রে অপরিচিত বেশে স্পর্ধিত আধুনিকতার তারস্বর তার নয়, সাবেক আমলের মধুর সৌজন্যের অভাব আছে। ..... তুমি অসংকোচে, প্রকাশ্যে আমার কাব্যভাষা থেকে ভাষা নিয়ে ব্যবহার করেছ। ..... বস্তুত যা তোমার নিজের কাজে লাগবে তাকে সর্বজন সমক্ষেই গ্রহণ করবার সাহস তোমার ছিল; কারণ সেই সব অলংকার দিয়ে তোমার কাব্যের স্বরূপ কিছুমাত্র আচ্ছন্ন হয়নি'।

চেক সাহিত্যিক মিলান কুন্ডেরার এর *দ্য কারটেইন* নামে তার একটি বইয়ের মূল বিষয়বস্তু, নিতান্ত সরল করে বললে, সাহিত্য ও যাপনের মধ্যেকার নিহিত সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি টেনে এনেছেন নিজের রাজনৈতিক-ভৌগোলিক বিস্তর অভিজ্ঞতা। এক জায়গায় প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন, সাহিত্য সমালোচক যখন কথা বলেন, তখন তার অবস্থান যেন নিশ্চয়তায় দৃঢ়। যেন-বা তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পোডিয়ামে, প্রবল আত্মবিশ্বাসে নিজের মত জানিয়ে দিচ্ছেন সামনে বসে থাকা শ্রোতৃমণ্ডলীতে।কাব্যও সাহিত্যের অঙ্গ।অথচ যিনি কাব্য রচনায় নিবিষ্ট, কাব্য নিয়ে কিছু বলার সময় তার যেন সংশয়ের শেষ থাকে না। এ যেন একজন শিল্পীর নিমন্ত্রণ করে কাউকে তার নিজের স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া, তার শেষ-হয়ে-যাওয়া ও এখনো-শেষ-না-হওয়া ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দোলাচল ও ভঙ্গুর অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া; নিজের অভিজ্ঞতা শিল্পরসিকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।কবির পক্ষেও এর ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে কবিতা-লিখিয়ে হিসেবে কবিতার খতিয়ান লিখতে বসলে সেই ভঙ্গুর ও দ্বিধাগ্রস্ত মনের ছাপ লেখায় এসে পড়তে বাধ্য।একজন কবির অনিবার্য নিয়তি এই যে তার সময়ে কবিতা যে অব্দি এসে পৌঁছোয়, সেখান থেকেই তাকে শুরু করতে হয়। আবার একই সঙ্গে এ কথাও সত্য, সেই পর্যায়টি পেরিয়ে যেতে না পারলে তার পক্ষে নিজের কবিতা লেখাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সকল অর্জন ও বিসর্জনসমেত কবিতার ইতিহাসের একটি ভার এভাবে প্রত্যেক কবিরই হাতে এসে পড়ে।

সমাজ-রাজনীতির ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ও সমান্তরাল দুটি ধারা।এক থেকে আরেকটাকে আলাদা করাও অসম্ভব। সে ইতিহাসের জটিলতা বাদ দিয়ে কবিতাকে বুঝতে চাওয়াও তাই খণ্ডিত হতে বাধ্য।

কোনো কোনো আলোচক কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কথাগুলো বলে থাকেন, সেগুলোকে মোটা দাগে সারমর্ম করে একটি লক্ষণে নামিয়ে আনা যায়।সুধীন্দ্রনাথ সেই লক্ষন কে কেন্দ্র করে জীবন বোধের ধ্বংস স্তুপের উপর দাঁড়িয়ে ক্লান্ত দৃষ্টি তে নতুন মূল্যবোধের সন্ধান করেছেন। যখন কোনো সার্বিক কর্তৃত্ববাদী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ধারণা বা মূল্যচেতনা সমাজে একমেবাদ্বিতীয়ম হয়ে ওঠে, সুধীন্দ্রনাথ এর পক্ষে তখন মহাযুদ্ধ বিধ্বস্ত জীবনকে বেছে নেওয়া ছাড়া আর কিসের ভূমিকা নেওয়া সম্ভব?

বিভিন্ন লেখক ও আলোচক তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার অর্জন নিয়ে আলোচনা করছেন, ভবিষ্যতেও করবেন। এটি যদি তাঁর কবিতার সমালোচনা হয়, তবে একজন কবিতা-লিখিয়ে হিসেবে তা আত্মসমালোচনার অধিক কিছু নয়।তাঁর কবিতার কিছু বিচ্যুতি ঘটেছে পৃথিবী জুড়েই, বিশ্ব-ইতিহাসের ধাক্কায়। যেমন কবিতার উপভোগে ইন্দ্রিয়ের বদল ঘটেছে। মুদ্রণযন্ত্রের উদ্ভবের কারণে কবিতা উপভোগের উপায় হিসেবে মুখ ও কানের সম্পর্ককে প্রতিস্থাপন করে অভ্যুত্থান ঘটেছে চোখের। শ্রুতির জায়গা নিয়েছে দৃষ্টি। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে স্মৃতির অসীম গুরুত্ব লোপ পাওয়ায় কবিতা বেপরোয়া হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে।

কথাসাহিত্য ও কবিতায় প্রথমে এ উন্মেষ ঘটেছিল যথাক্রমে টেকচাঁদ ঠাকুর ও ঈশ্বর গুপ্তের হাতে। দ্রুতই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে বিকশিত ভিন্নতর এক আধুনিকতা আগের এ আধুনিকতাকে অতিদ্রুত চাপা দেয়।আরও পরে আমরা দেখেছি, ১৯৩০-এর দশকে কলকাতায় আরেকটি আধুনিকতা এসে উনিশ শতকের দ্বিতীয় আধুনিকতাটিকেও স্থানচ্যুত করে। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো, আধুনিকতার এই তিন তরঙ্গের কোনোটিতেই প্রধানত বাঙালি মুসলমানের এবং গৌণত-প্রবল প্রতাপশালী মধুসূদনকে মনে রেখেও বলছি—পূর্ববঙ্গের তেমন অংশগ্রহণ ছিল না। এর লম্বা লম্বা কারণ আছে। আমরা মোটা দাগে দুটো কারণের কথা বলব,

নাসারা উপনিবেশের বিরুদ্ধে—ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রণোদনা থেকে—মুসলমানদের দীর্ঘ অসহযোগ এবং কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে কৃষিনির্ভর পূর্ববঙ্গীয়দের চেয়ে নিজেদের উঁচু করে দেখার আত্মঅহমিকা। ফলে বাঙাল দীনেশচন্দ্র সেন অনেক উচ্চাশা নিয়ে সাহিত্য আলোচনা করতে গেলেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের দুজনের আলোচনা আলু-পেঁয়াজের দরদামের বাইরে নিয়ে যান না। এই সময়ে জীবনের সান্ত্বনাহীন ধ্বংস স্তুপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুগের বন্ধ্যাত্ব ও রোমান্টিক কাব্যলোকের অন্তসার শূন্যতাকে তদগদভাবে লক্ষ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ।

তাঁর কবিতা থেকে ব্যাপক অর্থে বাংলা কবিতার বৃহত্তর ভোক্তাশ্রেণিকে এবং সুনির্দিষ্ট অর্থে ধর্মীয় জনগোষ্ঠী ও সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয় কে তুলে ধরেছিল। তাঁর কবিতার সংকলনের প্রতিটিরই শুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে। নতুন বাংলা কবিতা যেন ভুঁইফোঁড় একটি ব্যাপার। আর এর ইতিহাস শুরু হলো ঠিক এই মুহূর্ত থেকে। রবীন্দ্রনাথের অবস্থানও এসব সংকলনে অনেকটা হংসমধ্যে বক যথা। আধুনিকতাবাদী কবিতার সকল সূচকেই অত্যন্ত খাপছাড়া আরও তাঁর কথা উল্লেখ করা যায়।তাঁকে নিয়ে সংকলকদের অস্বস্তি চোখ এড়িয়ে যাবার মতো নয়। সুধীন্দ্রনাথের চোরাফাঁদ ও রহস্য ভেদ করতে এখনো বহু বাকি।

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে কাটাছেঁড়া হওয়া এ অঞ্চলে দ্রুতই কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা হাঁপিয়ে, আধুনিকতার সমাজ উঠতে উঠতে তাঁর কবিতাদের দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদি ঐক্যের দিকে তাকাই, রাজনৈতিক কারনে তাঁর কবিতাকে দেখা গেল নন্দনবৃত্তের পরিধির মধ্যে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত আবেগ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় ঠিকরে পড়তে শুরু করেছিল। তিনি এমন একটি কবিতার ভাষা তৈরি করেছিলেন, যা কবিতাকে বহুগম্য করে তোলে। সে ভাষা দ্রুত কবিসমাজের একটি ব্যসনে পরিণত হয় এবং অর্ধশতক ধরে বাংলাদেশের কবিতায় রাজত্ব করে। এরপর কবিতার যে উপপ্লব শুরু হয়, তাতে ব্যাষ্টিক অভিজ্ঞতা কবিতা থেকে নির্বাসিত হতে শুরু করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে কবিতার যে ধারাটি প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল, সেটিকে ত্রিশ-র দশকের কবিরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে

পেরেছিলেন। তাই সে সংকটের বেশ অনেকটা সমাধান তারা করেছেন বটে, কিন্তু জন্ম দিয়েছেন নতুনতর মহাসংকটের।চিত্রশিল্পীর মূল প্রকরণ যে রেখা আর রং, স্বভাবগতভাবেই তা বিমূর্ত। ফলে চিত্রকরেরা শুরুই করেন প্রকরণগত নির্বস্তুকতা থেকে। কাগজ বা ক্যানভাসে সমতলীয়ভাবে একটিমাত্র রং লেপে দিয়েও যে দর্শকচিত্তে সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তোলা সম্ভব, রুশ বংশোদ্ভূত মার্কিন শিল্পী মার্ক রথকোর চিত্রকর্মে তার অজস্র নজির ছড়িয়ে আছে। ত্রিশ গোষ্ঠীর শিল্পীরা—সমসাময়িক বিমূর্ত শিল্পকলার মাত্রাতিরিক্ত দাপটে অস্থির হয়ে এবং এর নান্দনিক অসারত্বে সায় না পেয়ে—যাত্রা শুরু করেছিলেন এর বিপরীতে।

মুশকিল হচ্ছে, কবি আর চিত্রকরের শিল্পযাত্রা মূলগতভাবেই বিপরীত। কবির উপাদান যে শব্দ, সেটি পানির মতো স্বচ্ছ। কেউ 'আম' বললে বাংলাভাষী সকল মানুষ বর্ণগন্ধস্বাদসমেত সুনির্দিষ্ট একটি ফলকেই বুঝবেন। ওই ফলটির বাইরে অন্য কিছু কেউ বুঝবেন না। শব্দের এই স্বচ্ছতার বিনাশ না ঘটিয়ে, অভিধানের অর্থ থেকে শব্দকে সরিয়ে না দিয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পক্ষে তার কবিতা রচনা শুরু করাই সম্ভব নয়। এই জায়গাটিতে একটি পুরো ভাষাগোষ্ঠীর বিপরীতে কবির একার লড়াই। কিন্তু কেন এ লড়াই? কারণ তিনি তার ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে এমন একটি অভিজ্ঞতা তার কবিতার মাধ্যমে ফিরিয়ে দিতে চান, যা তাদের মধ্যে এখনো রূপ পায় নি; যে উপলব্ধি এই ভাষাসমাজে এখনো অপ্রস্ফুটিত। কবিতার জন্ম তাঁর ভাষাভূত ও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত স্থিতাবস্থার বাইরে থেকে। তাঁর প্রতিটি সার্থক কবিতাই সে কারণে বিপ্লবী। কারণ তা স্থিতাবস্থাকে নাড়িয়ে দেয়।

অথচ প্রায় বহু বছর ধরে প্রতাপশালী হয়ে থাকা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের - প্রণোদিত কাব্যভাষাটি কবিতার এই মৌলিক ভিত্তি থেকেই সরে এসেছিল। ত্রিশ-র দশকে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এর বিপরীত এক প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে। কিন্তু তাদের পথ চলতে শুরু করতে হয় এ সময়ের চিত্রশিল্পীদের ভাবনার বিপরীত পথে। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর শিল্পীরা আসতে চেয়েছিলেন বিমূর্ত থেকে মূর্তে, অবয়বহীনতা

থেকে অবয়বের দিকে। আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাত্রা করলেন বস্তুভার থেকে নির্বস্তুকতার দিকে, অর্থ থেকে অর্থভারমুক্তির দিকে।

তাঁর কবিতায় প্রধানত যা ঘটেছে, এক কথায় বললে, সেটি কবিতাকে তার বাগ্‌যন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। এর মাধ্যমে সাম্প্রতিক কবিতায় এক নিরুদ্ধ অন্তর্জগতের উন্মীলন ঘটেছে। অন্তর্জগতের অভিজ্ঞতা প্রকাশে অতিশয় পারঙ্গম হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার ভাষা। কিন্তু একই সঙ্গে এ কবিতার কাছে আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে বাইরের বৃহত্তর জগৎ।

কিন্তু কাকে বলে বাইরের সমাজ? ভেতরের সমাজই-বা বলে কাকে? এর উত্তর খুঁজতে চাওয়ার আগে শুরুতেই যে পটভূমিটি রচনা করেছি, সেই সময়ের কিছুটা আগে আমাদের একটু ফিরে তাকাতে হবে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার দর্শন কখনো ভেতর আর বাহিরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে নি। বিচ্ছিন্ন করে দেখে নি বাংলার আদি কবিতাও। এই ভেদ বাংলা কবিতায় অনুপ্রবেশ করেছে আধুনিকতাবাদের হাত ধরে। বাংলা কবিতার দ্বিতীয় যে আধুনিকতার উন্মেষ মধুসূদন দত্তের হাতে ঘটেছিল, পশ্চিমের অভিষেক তাতে প্রথম ঘটেছে, কিন্তু এই ভেদ তখনও স্পষ্ট রূপ পায় নি। কারণ তার প্রেরণার প্রধান উৎস তখনও ছিল পশ্চিমের শিল্প-বিপ্লবেরও আগের সেই কালপর্বের সাহিত্য, যাকে আমরা বলি ধ্রুপদী বা চিরায়ত, যখন জগৎ ও চেতনাকে আলাদা আলাদা করে দেখার ঝোঁক শুরু হয় নি।

শিল্প-বিপ্লবোত্তর সাহিত্যের প্রবল প্রভাব বাংলা কবিতায় পড়তে শুরু করল ১৯৩০-এর দশক থেকে। বাংলা কবিতার তখন আরেক নতুন আধুনিকতার কাল। আমাদের কবিতায় জগৎ ও চেতনাকে ওতপ্রোতভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটি এ সময় ফিকে হয়ে যেতে শুরু করল। এ দুটোকে আলাদা করে চেতনাকে আমরা করে তুললাম একমাত্র উপাস্য। জগৎকে ঠেলে সরিয়ে দিলাম দূরে। বুদ্ধদেব বসুর মতো নতুন কবিতার নেতা লিখলেন, ‘জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;’ বললেন, ‘প্রান্তরে কিছুই নেই; জানালায় পর্দা টেনে দে।’ নতুন কবিতার আরেক নেতা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বললেন, ‘সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি...।’ এর ফল হলো এই যে ‘বাইরে’র

অভিজ্ঞতা তুলে ধরার ভাষা আমাদের হাত থেকে ছুটে গেল। রুদ্ধ হয়ে গেল তার ক্রমবিকাশ। পরে তাঁর মধ্যে তিনি যে চেষ্টা করলেন, তাদের কবিতায় যেন আর এক নব সুর বাজল।এ অভিযোগও হয়তো ফেলে দেওয়া যাবে না যে সে ধরনের অধিকাংশ কবিতায় অভিজ্ঞতার সততাও ছিল কম। একটি কবিতার বইয়ের নামই ধরা যাক, *একা নই, পেছনে মানুষ*। বইটির শিরোনামে কবির এ অভিপ্রায়ে কোনো রাখঢাক নেই যে একটি প্রবল জনস্রোতে সবকিছু প্লাবিত করে দিতে তিনি আসছেন। কিন্তু শিরোনামটিতে অন্য যে কথাটি প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে তা হলো, সে জনস্রোতেও জনতা থাকবে তার পেছনেই, তিনি থাকবেন সবার আগে, হবেন সবার নেতা। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অধিকাংশ সংগ্রামী কবিতার অন্তিম গন্তব্য কবিদের এমনতর উচ্চ মনস্কতায়। তাঁর কবিতায় মানুষের ভেতরের আর বাইরের জগতের বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার এবং অন্তর্জগৎটিই একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কথা। দুনিয়ার আর কোথাও কবিতার এমন বিধ্বংসী কাণ্ড আর দেখা যাবে না। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার কবিতায় দেখা যাবে জগৎ ও চেতনার ভেদের এই কৃত্রিম বর্ণপ্রথা তছনছ হয়ে ভেঙে পড়ার লক্ষণ।ইহুদি বংশোদ্ভূত ওলন্দাজ দার্শনিক বারুখ স্পিনোজা মানতেন, জগৎ আর চেতনায় আমরা যে ফারাক করি, সেটি নিছক এক বিভ্রম। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে তিনি বরং বলেন, আদতে এ দুইয়ের মধ্যে কোনো ফারাকই নেই। বৃত্তচাপের মতো একটি বাঁকা রেখার দুই পাশে উত্তল আর অবতল যেমন পরস্পরের সাপেক্ষে অস্তিত্বময়। এর এক পাশ উত্তল বলেই আরেকটি পাশ অবতল। জগৎ আর চেতনার সম্পর্কও সে রকম অবিচ্ছিন্ন। দুইয়ে মিলে অভিন্ন এক সত্তা। শিল্প-বিপ্লবে উন্মুখ ইউরোপ স্পিনোজাকে নেয় নি; নিয়েছিল ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তেকে, জগৎ আর চেতনার মধ্যে ফারাকের যিনি ছিলেন মূল মন্ত্রণাদাতা। এতে শিল্প-বিপ্লবোত্তর কালে উপনিবেশের যুগ পত্তনের একটি দার্শনিক ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মন সেই ভেদনীতি থেকে সরে আসতে পারে নি। জগৎ আর চেতনার একের মধ্যে অপরের একাকার হয়ে যাওয়া দশাটিকে তাঁর কবিতার ভাষায়

আবার যেদিন আমরা আত্মস্থ করতে পারব, বাংলা কবিতা হয়তো সে দিন আরেকটি নতুন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করবে।

১০.২ শাশ্বতী, সৃষ্টির রহস্য, সংবর্ত, প্রতীক্ষা- কবিতার নামকরণের সার্থকতা ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আধুনিকতার ভিত্তিতে তাঁর কবিতার সারমর্ম

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বিষয়ে ভাবতে গেলে শিল্প সাহিত্যের আধুনিকতার প্রসঙ্গটি অত্যাবশ্যকীয়রূপে এসে পড়ে। বাংলা কবিতার পরিপ্রেক্ষিত বিষয়টি দীর্ঘকাল হলো নানাভাবে আলোচিত হয়ে আসছে। ফলে এখন বাংলা আধুনিক কবিতা সম্পর্কে আমাদের চিন্তার কয়েকটি বিশেষ সাধারণ ধারণা বিদ্যমান। বলাবাহুল্য এই ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল তিরিশ ও চল্লিশের দশকে; এবং তাও ঐ দুই দশকের কয়েকজন অসাধারণ প্রতীভাবান কবির কাব্যসৃষ্টির এবং সে সম্পর্কে তাদের কয়েকজনের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকজন কবিতা সমালোচকের মূল্যবান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ধারণাসমূহ আমাদেরকে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞায় উপনীত করেছে। এই সংজ্ঞানুযায়ী আধুনিক বাংলা কবিতাকে কালের দিক থেকে রবীন্দ্র পরবর্তী এবং গুণের দিক থেকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত বলে শনাক্ত করেছে। এই কবিতাকে আমরা নগরকেন্দ্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বারা তীব্রভাবে প্রভাবিত, নৈরাশ্যে নিমজ্জিত, নিঃসঙ্গতাবোধ ও অনিকেত মানসিকতায় গভীরভাবে আক্রান্ত, প্রচলিত বাক প্রতীমার পরিহারে স্বতন্ত্র এবং প্রাত্যহিক চর্চায় উৎকেন্দ্রিক, আর সে কারণে কুটত্ব লাঞ্ছিত- এইসব বিভিন্ন অভীধায় দীর্ঘকাল হলো চিহ্নিত হয়ে আসছে। আন্তর্জাতিকতা স্থাপন করতে গিয়ে এই কবিতাকে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপীয় এবং বিশেষভাবে ইংরেজি কবিতার ও কাব্যভাবনা দিয়ে

গভীরভাবে প্রভাবিত ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু এই ধরণের বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় নিবদ্ধ হয়ে সম্ভবতঃ এটাও লক্ষ্য করিনি যে, এই সমসত্ম প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতা কমবেশি অঙ্গে ধারণ করলেও ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক কারণে তার একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও একটি বিশিষ্ট প্রবহমান ঐতিহ্যের ধারার বিশুদ্ধ প্রেক্ষাপট বিদ্যমান; এবং তার অন্তর্গত গুণাবলী ও বহিরাবরণের শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণসমূহের চরিত্র নির্ধারণ করেছে সেই অবিনশ্বর উত্তরাধিকার।জীবনের মূল বিশ্বাসের বাসায় চিরন্তন সম্পদের কেন্দ্রে মন আশ্রয় পাবে বিজ্ঞানের কল্যাণ শক্তিতে এই ছিল সুধীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। জীবন বোধের ধ্বংস স্তুপের উপর ক্লান্ত দৃষ্টি তে দাঁড়িয়ে নতুন মূল্য বোধের সন্ধান করেছেন তিনি। তাই শাশ্বতী কবিতায় তিনি বলেছেন-

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,
প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে-গগনে পলাতক আলো-ছায়া।
আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালি শেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :

পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;

একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—

মনে হয় যেন শত জনমের আগে—

সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে,

চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ;

সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া

মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;

অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া

খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে

ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;

একটি নিমেষে দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,

থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;

একটি পণের অমিত প্রগলভতা

মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে

একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা

প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।।

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে ;

অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে,

মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে

অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,

অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;

অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি

স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;

সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে ;

পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;

কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে

আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে

আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।।

শাশ্বতী (অক্রেষ্ট্রা ১৯৩৫)

ইউরোপীয় অস্তিত্ববাদীদের মতোই কবি মানুষের পার্থিব সত্তার মুক্তিহীন নিরর্থকতা উপলব্ধি করেছেন। সেই তিরিশ ও চল্লিশের দশক থেকে বাংলা কবিতার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বসাহিত্যের জটিল প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় তিনি নিজেকে স্থাপন করতে গিয়ে যেমন একদিকে একটি বিশুদ্ধ পরিমার্জিত কাব্যবোধের জন্ম দিয়েছে আধুনিককালের বিশ্বসমাজের ধ্যানধারণার অনুবর্তনে, আবার তেমনি অপরদিকে আধুনিককালের বস্তু সমর্পিত, সাফল্য কবলিত, জীবন চেতনার পরিক্রমণে 'অর্থ, কীর্তি বা সচ্ছলতা' নয়, বরং তার অন্তর্গত প্রবাহমান রক্তের ভিতরে অনুভব করেছেন ' কোন এক বিপন্ন বিস্ময়', যে বিস্ময় কখনই ধুনক জীবন বীর প্রায়োগিক প্রবণতার দ্বারা চিহ্নিত নয়। আধুনিক মনন তার পরিপার্শ্বকে অর্থাৎ যে বস্তু বিশ্বে তার অস্তিত্বকে বিশ্লেষণ করে, জীবন ও জগতের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করে, প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে তার অসিত্মত্বের নতুন দিগনত্ম উন্মোচিত করতে চায়, কিন্তু কখনই সজ্ঞা প্রভাবিত রহস্যের ঊর্ণাজালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনা।কবির বিশুদ্ধ অবিমিশ্র আধুনিকতা তাই এক অর্থে কবিতার ও শিল্পের পরিপন্থী। আধুনিক মানুষ 'বিপুলাপৃথী ও নিরবধি কাল' কে অণুবীক্ষণে বিশ্লেষিত করতে আগ্রহী, যে আগ্রহের লক্ষ্য হলো মহাকালের অর্থ উন্মোচন এবং সম্ভব হলে তার

অস্তিত্বের অনুপূঙ্খ ব্যবচ্ছেদ। সম্ভবত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আধুনিক মনন সম্পর্কে এই

কবিতাটি বোঝাতে চেয়েছিলেন-

আয়ুর সোপানমার্গ বহু কষ্টে অতিক্রম করি

উন্মুক্ত মৃত্যুর প্রান্তে ঊর্ধ্বমুখে দাঁড়ায়েছি এসে ;

সিন্ধুর ভাস্বর আঁখি খোঁজে মোরে নিম্নে নিরুদ্দেশে ;

আমার আরতিদীপ মহাশুন্যে সাজায় শর্বরী ।।

সম্মুখে নিখিল নাস্তি, পৃষ্ঠদেশে মৌল নীরবতা ;

প্রশান্তি দক্ষিণে, বামে ; জনহীন, অন্তর,বাহির।

তবু কার আবির্ভাবে কণ্টকিত আমার শরীর ;

অবচেতনার তলে গুমরে কী জাতিস্মর কথা?

তবে কি বিরাট শূন্য শূন্য নয়, সাগরের প্রেত ;

উদ্বেল বিক্ষোভ তার পরিণত বিদেহ ঈথারে?

তবে কি দুর্মর মর্ত্য ক্রন্দসীতে ক্রন্দন বিথারে;

শস্যের মিসরী শবে উপ্ত সম্ভাবনার সংকেত ?

নির্লিপ্ত আলোর দ্বীপ নয় ওই দিব্য নীহারিকা,

কালের প্রপাতে মগ্ন বাসনার ভাসমান ফেনা ?

অবচ্ছিন্ন তারারাশি, ওরা চিরদিনকার চেনা

পশুদের স্থুল সত্তা, লালসার মূর্ত বিভীষিকা ?

নাই নাই মৌন নাই, সর্বব্যাপী বাঙ্ময় জগৎ ;

নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্ন, মৃত্যুঞ্জয় জ্বলন্ত হৃদয় ;

হয়ত মানুষ মরে, কিন্তু তার বৃত্তি বেঁচে রয় ;

জন্ম হতে জন্মান্তরে সংক্রমিত প্রত্ন মনোরথ ।।

কপোল কল্পনা ত্যাগ ; নিরাসক্তি অসাধ্যসাধন;

অনন্তপ্রস্থান মিথ্যা ; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা ;

বিদ্রোহে স্বাতন্ত্র্য নাই ; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা ;

সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন।।

সৃষ্টির রহস্য (ক্রন্দসী ১৯৩৭)

সুধীন্দ্রনাথের কালচেতনা তাঁকে বুঝিয়েছেন সত্তার কোন বিশেষ ইতিবাচক লক্ষের প্রতি গতি নেই। জীবনের যন্ত্রণাকর দায় ভাগের কথা স্বীকার করে নিয়েই তিনি জেনেছেন 'সৃষ্টির রহস্যমাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন' অর্থাৎ মুক্তিহীন আবর্তন।

বাংলা কবিতার বয়স হাজার বছর। চর্যাপদ থেকে হাজার বছরের এ পথচলায় আশ্চর্যময় সব বাঁক নিয়েছে বাংলা কবিতা। কবির গভীরতম অনুভূতি, কবিতার গঠনশৈলী, ভাষার প্রবহমানতা, কবিতার উদ্দেশ্য, সমাজ ও রাজনৈতিক পরিপার্শ্ব এবং প্রকাশ ভঙ্গির স্বাতন্ত্রসহ নানাবিধ কারণে মঙ্গল-কাব্য, পুঁথি-কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলির মাধ্যমে পেয়েছে বহু বর্ণিল রূপ। ঊনিশ শতকের কবিরা বৃটিশ ঔপনিবেশিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে গিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন হাজার বছরের ঐতিহ্যকে। প্রত্ন-প্রবণতা ভেঙে মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বাংলা কবিতাকে চারিয়ে দেন বিশ্বকবিতার কক্ষপথে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনসাধনে ব্যাপ্তি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক বৈষম্যবিরোধী এক বিপ্লবী মেজাজ সঞ্চার করেন কাজী নজরুল ইসলাম। ত্রিশের দশকের কবিগোষ্ঠী বাস্তবিক আধুনিকতার উন্মেষ ঘটালেও সে আধুনিকতা ছিল অনেকটাই শেকড়চ্যুত। বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে আলোকবিন্দু ফেলা হয়েছে ইংরেজি শিক্ষিত শেকড়চ্যুত আধুনিক কবিদের ওপর। সাতচল্লিশের দেশভাগ বাংলা কবিতাকে করেছে দ্বিচারী। চল্লিশের কবিরা মুখের ভাষা কবিতায় আনতে চেয়েছেন। বিগত পঞ্চাশ বছরের লালনে-সৃজনে বৈচিত্রতর হয়ে উঠেছে বাংলা কবিতা। আধুনিক বাংলা কবিতা বিশ্বকবিতার ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে কিনা তা স্পষ্ট না হলেও ভাব, বিষয় এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে ঋদ্ধ করেছে সুনিশ্চিত। আধুনিকতার মূল নির্যাস হলো মহাকালের সমালোচনা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুঝেছিলেন ত্রিশ শতকের সময় গভীর তাৎপর্যময় সময়। প্রকৌশল ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রা হয়তো মানুষকে নান্দনিক অর্থে এমন অনুর্বর ও নীরস দৃশ্যপটের দিকেই অমোঘভাবে ঠেলে

দিচ্ছে।কবি শিল্পে সঙ্গীতে কবিতায় সৌন্দর্য সৃষ্টির যে কোনো প্রক্রিয়ায় মানুষের যুক্তি বুদ্ধিকে অতিক্রম করে তার বোধের ভেতরে থাকে আরেক চিরন্তন, এক নির্মোহ সত্য সুন্দরের অভিমুখে অভিযাত্রা যার সজ্জা দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দুলিয়ে দেয় জীবনের সকল রহস্যের যবনিকা এবং হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে উন্মোচিত করে তোলে 'বাতাসের ওপারে বাতাস' 'আকাশের ওপারে আকাশ' অর্থাৎ সুন্দরের শাশ্বত অথচ দুর্বিশ্লেষ্য জগৎ; আর এই জগৎটাই সকল সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের অন্তিম অন্বিষ্ট। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বস্তু নিচয়, বর্ণ আদল ও অবয়ব এবং ধ্বনি থেকে শিল্পী ও কবির মনে জন্ম নেয় এক বিশুদ্ধ সুন্দরের আবেগ যা অযোধ্যার চেয়েও সত্য হয়ে ওঠে অকস্মাৎ। হঠাৎ করে দেখা কোনো এক বিরল মুহূর্তে বাচন ও অনির্বচনীয়ের ভাষা ও কল্পচিত্রের সংযোগ রচিত হয়ে যায়, যেন এমন একটি স্তরে শিল্পীর বোধ এসে ঠেকে যায় যার কোনো ব্যাকরণ নেই, বিশ্লেষণ নেই, অঙ্কশাস্ত্রের অযৌক্তিক বা ইরেশনাল সংখ্যার মতো-

পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি
জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী;
তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে?
বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূ ধূ করে;
নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে;
যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে।।
মহাশূন্যের মৌনে পরিস্ফীত,
বিবিক্তি আজ বেষ্টনীবিরহিত;
অধুনায় নিশ্চিহ্ন অতীত, আগামী;
নাস্তিতে নেতি স্বতঃসিদ্ধ প্রমা,
সোহংবাদীর আর্তি আত্মোপমা,
অগতির গতি মনোরথ বৃথা লাগামই।।

আরও এক বার, হাজার বছর আগে,

বিপ্রলব্ধ আস্থা অন্তরাগে

খুঁজে পেয়েছিল উজ্জীবনের প্রেরণা;

এবং আবার সহস্র বৎসর

পূবে আসে বটে, তবু মন্বন্তর

মানবেতিহাসে সর্বনাশেরই দেশনা।।

অন্তত এতে সন্দেহ নেই আর

অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে, সংসার

অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে;

পুঞ্জ পুঞ্জ ব্যক্তির বুদ্বুদ,

সময়ের স্রোতে অচির, অরুন্তুদ,

মমতার জোট পাকায় এ-চরে, ও-চরে।।

অভাব হয়তো স্বভাবেরই অগ্রজ :

নিরবধি তাই প্রভাসে ফুরায় ব্রজ–

প্রতিজ্ঞা রাখে মরণ ত্রাতার বদলে;

বিশৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠায় স্থাণু,

পৃথিবী অনাথ; যথেচ্ছ পরমাণু;

প্রগতিক শুধু কালভৈরব সদলে।।

অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :

অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;

বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।

অনুমানে শুরু, সমাধা অনুশ্চয়ে,

জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে :

তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি?

প্রতীক্ষা (দশমী ১৯৫৬)

প্রকৃতপক্ষে সভ্যতা যতই অগ্রসর হচ্ছে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিতে রহস্যময়তা যতো স্বচ্ছ হয়ে উঠছে তার কাছে। ততই মানুষের কর্মে, তার শিল্পবোধে এবং সে জন্যেই তার শিল্প সৃষ্টিতে বিশুদ্ধতার পরিচর্যা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। আধুনিককাল থেকে শুরু করে বর্তমান কালকে তথাকথিত উত্তরাধুনিককাল বলে ধরলেও এই চরম শুদ্ধতার পরিচর্যাই আপাততঃ জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও শিল্পে আমাদের 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। এই বিশুদ্ধতার পরিচর্যা যা প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধান কবিকে, চিত্রশিল্পীকে, ভাস্করকে কখনও কখনও বিমূর্ততার দিকে প্রণোদিত করে। সমস্ত দৃশ্যমান অবয়ব থেকে সেইসব অবয়বের মূল নির্যাস টেনে নিয়ে একটি বিশুদ্ধ অবয়ব সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষায় সে উন্মোথিত হয়। এই উন্মোথিত হওয়া, এই উদগ্রীব অন্বেষণই শিল্পীর, কবির ও স্বপ্ন দ্রষ্টার অনন্য জাগরণ এবং সে জাগরণ সমস্ত কালকে অতিক্রম করে যায়। শিল্পী ও বোদ্ধার এই জাগরণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক স্তরে বিভিন্ন জণগোষ্ঠীর মধ্যে একভাবে সঞ্চারিত হয় না, তার কারণ দেশে দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক স্তর বিন্যাসে একটি সমাজের বিপুল জনগোষ্ঠীতে বাস্তব ও বৌদ্ধিক অগ্রযাত্রার সমার্থক নয়, ফলে শিল্পীর নতুন উপলব্ধির ধারণা সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে না সর্বত্র। এবং সেজন্যে দেখা যায় শ্রেষ্ঠ কবি বা শ্রেষ্ঠ শিল্পী সবসময় তার সময় থেকে এগিয়ে থাকেন আর সে জন্যই যখন তিনি দ্রষ্টার ভূমিকায়- তখন সমাজের সঙ্গে তার সংঘর্ষ। ইয়েটস যখন 'কেন্দ্রের টান আর থাকছেনা এবং কেন্দ্রাতীগ শক্তিতে বস্তু নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে' সভ্যতার এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন তখন প্রকৃতপক্ষে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতের ধারণাটিকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, অভূতপূর্ব সঞ্চরমান চিত্রকল্পে, বলাবাহুল্য বিমূর্ত চিত্রকল্পে।তাঁর কবিতায় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাহলে আসলে যা ঘটছে সময়ের বিবর্তনে ইতিহাসের অমোঘ যাত্রায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু নিশ্চয় মানব সম্পর্কের পরিবর্তন। তাই এই জীবন ও জগৎকে কবি সেই পরিবর্তিত প্রেক্ষিত প্রত্যক্ষ করছেন; আর সেই জন্যই বদলে যাচ্ছে তার উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষায় চেহারা। তার বাচনের প্রস্বর, তার জ্যোতির পারম্পর্য, তার শব্দের

চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা ও গূঢ়ার্থ।' কাজেই কবিতা বিষয়ে 'আধুনিকতা'র প্রসঙ্গটাই আর অর্থবহ থাকে না। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বা এমনকি পঞ্চাশের দশকেও তাঁর কবিতা সম্পর্কে আধুনিকতার প্রসঙ্গটি হয়তো কিছুটা প্রাসঙ্গিক ছিল। কারণ তৎপূর্ববর্তী কাব্যভাষার সঙ্গে তৎকালের কাব্যভাষার ব্যবধান হয়ে যায় বিস্তর। এখন এই প্রসঙ্গটিই প্রকৃতপক্ষে অবান্তর। আরো স্পষ্ট করে বললে তখন বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা ছিল এই অর্থে যে, একটি বিশেষ সময়ের পরিসরে ধরা যাক প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও তার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে। 'ধরা যাক যে তা মহাশূন্যে অভিযাত্রার কাল' পর্যন্ত প্রসারিত, সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তনের সমাত্মরালে কবিতার তথা নমনীয় শিল্পের আঙ্গিকে একটি অতি স্পষ্ট ও লক্ষ্যযোগ্য পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকে একবিংশ শতকের ঊষালগ্নে দাঁড়িয়ে আমরা সেই পরিবর্তনের একটি পরিণত রূপ প্রত্যক্ষ করি। তখন প্রত্যয়ের সঙ্গেই বলতে পারি যে, সেই পরিবর্তনের কারণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় কোনো গুণগত পরিবর্তন আরোপিত হয়নি। - কবিতা এখনও কবিতাই রয়ে গেছে, চিত্রকলা চিত্রকলাই। তবে টেড হিউজ বা টমাস হিনি আলেকজান্ডার পোপের মতো কবিতা রচনা করেন না, শামসুর রাহমান বা আল মাহমুদ লেখেন না বিহারীলালের মতো, জয়নুল আবেদীন, সুলতান বা কিবরিয়া আঁকেন না রুবেনস এর মতো, অর্থাৎ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন এসেছে। তার পরিপ্রেক্ষিত হয়তো গেছে বদলে এবং নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে তার কৌশলে। ঠিক তেমনিভাবেই সুধীন্দ্রনাথের কাব্য ভাষায়ও হয়তো যুক্ত হয়েছিল কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্য।তাঁর কবিতার বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ আয়তনে যে ভাষার বঙ্কনায় কেঁপে ওঠা, প্রচলিত অর্থের সীমা অতিক্রম করে শব্দের নতুন অর্থের যে উদ্ভাবক, শব্দের ধ্বনি ও সঙ্গীতে আনন্দের যে অনাবিল নির্ঝর তা কিন্তু বদলায়নি একটুও। হয়তো তিনি নির্মোহ হয়ে খুঁজছেন তার বিশুদ্ধতার অনন্য অবয়ব।

সাতচল্লিশের দেশভাগ বাংলা কবিতায় একটি বিশাল প্রভাবসৃষ্টিকারী ঘটনা। সাতচল্লিশ-উত্তর কালে বাংলা কবিতা বিকশিত হয়েছে দুই বিপ্রতীপ স্রোতে। এখান থেকেই বাংলাদেশের কবিতার আলোচনা জোড়া হোক। কিন্তু দ্রুততম সময়ে উল্কার মতো

দু'টিরই পতন ঘটে। পঞ্চাশের দশকে এ দু'টি বিষয় আসে নাগরিকতা ও লোকজ চেতনার নতুন মোড়কে। তথাপি পঞ্চাশ দশক থেকেই বাঙালি চেতনার সক্রিয় ও সার্থক উন্মেষ ঘটে। অস্থিরতা ও নৈরাশ্যের অবক্ষয়ের ভেতরেও নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও ব্যাপৃত হন ষাটের কবিরা। প্রথাসিদ্ধ পথের বাইরে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও শব্দচয়নে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়েছে এ সময়। ষাট দশকে মূল্যবোধের ভাঙচুর ও নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কবিতা পেয়েছে গাম্ভীর্যতা। সত্তরের দশকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় ছিল চূড়ান্তভাবে অরাজকতাপূর্ণ। স্বাধীনতার উজ্জ্বল আভার বিপরীতে প্রকাশ পাচ্ছিল বিপন্ন বিস্ময়। স্বাধীনতার স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় এ সময় স্লোগানধর্মিতার প্রভাব বিস্তার করে বাংলা কবিতায়। ত্রিশের দশকে আত্মর্জাতিকতার বাসত্মবিক উন্মেষ হলেও তার বিসত্মার লাভ করেছে ষাট-সত্তরে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যবোধের সঙ্কট ও সামাজিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছেন সুধীণদ্রনাথ দত্ত। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবাদে কবি নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন বাংলাদেশের কবিতায়। লাতিন ও আফ্রিকান মুক্তিকামী মানুষ ও প্রানিত্মক-নিম্নবর্গের মানুষের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী কাব্যস্বর প্রভাবিত করেছে তাঁর কবিতাকে। বাংলাদেশের কবিতার পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে ভাষাআন্দোলন, স্বাধিকার চেতনা, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা-উত্তরকালে গণমানুষের স্বপ্নভঙ্গ, প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, স্বৈরাচারের উত্থান ও গণতন্ত্রের বিপর্যস্ত যাত্রা। এমন ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মুখোমুখি হয় বঙ্গের কবিতা। কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের জীবনসংগ্রাম, কবিতায় প্রাধান্য জুড়েছে অসঙ্গতি। বুদ্ধদেব বসু তাকে বলেছেন স্বভাব কবি নন, স্বাভাবিক কবি। যে সব কারণে এমন ধারণা; তার মধ্যে সম্ভবত এটাও একটা যে, তার কবিতায় প্রকৃতির কথা এসেছে কম। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যে ভরা বাংলাদেশের জলবায়ু আর নিসর্গ যে কোনো কবিকেই প্রভাবিত করে। এমনকী অবকবিকেও কবি বানিয়ে তোলে। কিন্তু এই দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক শক্তিকেই সবলে ঠেলে রাখলেন তিনি। 'অর্কেস্ট্রা'র কিছু কবিতায় তুষারপাত ও শীতের অরণ্যে পত্রহীন বৃক্ষের কথা এসেছে ইউরোপের প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে। বাংলার প্রকৃতি তিনি এড়িয়ে গেছেন। অতি সামান্য কিছু

কবিতায় এসেছে মাত্র। যেমন; 'দশমী'র 'অগ্রহায়ণ' কবিতায়। পড়লে মনে পড়বে জীবনানন্দের অগ্রহায়ণ, হেমন্ত, ধানকাটা, খামার ও পাণ্ডুর আকাশ। বাংলা কবিতায় রোমান্টিসিজম ও রিয়েলিজমের দ্বন্দ্বকে নতুন করে আবিষ্কার করছেন কেউ- কেউ। এ দুইয়ের সম্পর্কে বলছেন, আপাত বিরোধমুখর কিন্তু আখেরে সমান্তরাল। পাশাপাশি চলে, চলছে এবং সম্ভবত চলবে।কবিতায় ধর্ম, মিথ, প্রকৃতি ও ইন্দ্রিয়সহযোগে আবহমান বাংলার লোকজ ও ধ্রুপদ রোমান্টিজম জেঁকে বসেছে। পাশাপাশি স্বগতোক্তি, বিবৃতি, প্রাত্যহিক ধারাবর্ণনা ইত্যাদি ফর্মে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে রিয়েলিজম। বলা হচ্ছে, রোমান্টিকতা কৃত্রিমতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে, রিয়েলিটি পরছে মুখোশ।

রোমান্টিসিজমে বঙ্গ ও রিয়ালিজমে এগিয়ে যাচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা। আসলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পার্থক্য তৈরি করেছে জীবনবাস্তবতা, উপলব্ধি, উপস্থাপন ভঙ্গি ও কাব্যভাষা। তাঁর কবিতা অবিকশিত নগরযন্ত্রণা, জীবনযাতনা, সরব দেশকালের উপস্থিতি, প্রকৃতিবর্ণনা, শেকড়কেন্দ্রিকতার মিশেলে স্বকীয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বিনির্মাণ, রহস্য, অনুভূতি ও নিরীক্ষার জটিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর বিষয়কেন্দ্রিক। তাঁর কবিতা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর, দ্বন্দ্ব-সঙ্কটে টলটলায়মান, হৃদয়াবেগে ফেনা তোলা, অফুরনত্ম-সম্ভাবনায় সামনের দিকে ধাবমান। বিপরীতে তারই কবিতা নিরাবেগ, অবসাদে মনমরা, স্বপ্ন ও প্রাণ-প্রাচুর্যহীন, মেধার বিচ্ছুরণ। তাঁর কিছু কবিতায় যেখানে শব্দ বুননের কৌশল পরিণত, জীবনঘনিষ্ঠ ও দ্বিধাহীন অন্যদিকে আবার তারই কবিতায় শব্দপ্রয়োগ, রূপকল্প, উপমা, প্রকাশের ভঙ্গিমায় উচ্ছ্বসিত, চটুলতাপূর্ণ, অপরিণত, জটিল, অনুকরণপ্রিয়তায় দ্বিধাগ্রস্থ। তাঁর কবিতা এখনও দারুণ ছন্দপ্রিয়। তথাপি পাঠকের অভিমত, বিষয়াবলী, ভাষাগত নিরীক্ষা, বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষা ও বাকভঙ্গির ব্যবহারে তিনি অনান্য কবিদের থেকে এগিয়ে থাকলেও প্রকরণগত নিরীক্ষায় সমরূপীয় এবং আত্মর্জাতিক প্রবণতায় ত্রিশের সব কবিই প্রায় সমগোত্রীয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা অনুযায়ী 'আধুনিকতা'র প্রসঙ্গটি মূলত কোন সময়ের জনগোষ্ঠীর এবং আরো বিশ্লেষিত করে বললে কোন পাঠক গোষ্ঠীর সাধারণ রুচি ও শিক্ষার মান ও প্রকৃতির সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। আধুনিকতা সর্বকালেই একটি আপেক্ষিক

ধারণা। জন ডান যখন লিখতেন তখন অবশ্যই তিনি অত্যন্ত আধুনিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সর্ব সময়ে অনাধুনিক। এমনকি বিহারীলালও। অনগ্রসর এবং সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণবাদের কাছে সমর্পিত সময় থেকে অনেক অগ্রসর শিল্পকর্মকে সমস্ত যুগেই অভূতপূর্ব ও সেকারণেই দুর্বোধ্য এবং এমনকি উদ্ভট বলে মনে হয়েছে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত শক্তিকে অস্বীকার করা বড়ো কঠিন; এবং সেজন্যে তাকে বহুবার কাঠগড়াতেও উঠতে হয়েছে। কেবলমাত্র শিল্পেই নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে এই সেদিন পর্যন্ত। ডারউইন সম্পর্কিত ঘটনা তো অল্পকাল আগে।

এসব কিছুর কারণ কিন্তু একটাই প্রচলিত রুচির বাইরে সর্বসাধারণ মানুষ বা একটি সমাজের বিপুল সংখ্যক সদস্য সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। নিউটনের সূত্রের অনুসরণে বস্তুর মতো রুচিতেও পরিবর্তন আনতে হলে কিছু শক্তির প্রয়োজন হয়; এবং সেই শক্তি সরবরাহ করেন পিকাসো বা জয়নুলের মতো শিল্পী, বোদলেয়ার বা জীবনানন্দের মতো কবি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও প্রসার ও তার সমান্তরালে রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আধুনিকতর পরিপ্রেক্ষিত নীরবে বদলে যায়। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে রবীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ দাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ নন সুধীন্দ্রনাথ। জার্মান ও ফরাসি চিন্তাধারায় চালিত একজন প্রতিলিপিকার বলা যায়। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে তিনি মৌলিক।নিজস্ব গদ্যসহ কবিতা, এবংনিজের সম্পাদিত সাহিত্যপত্রিকা ‘পরিচয়’ ছিল বেশ প্রতাপশালী। অভিজাত বলেই প্রতাপশালী কিন্তু প্রভাবশালী নন। এ কারণেই তিনি কোনো যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যেতে পারেননি। মৃত্যুর পরে তার কাব্যাদর্শের অনুসারী কোনো কবিকে পায়নি বাঙালি পাঠকসমাজ। একারণে তার কাব্যজগৎ পাঠকের কাছে অচেনা মনে হয়। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শব্দপ্রধান। যে কারণে অক্ষরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তার কবিতা নির্ভুল।মানব সভ্যতা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জীবন জগৎ ও আমাদের পরিপার্শ্ব সম্পর্কে অধিকতর তথ্য ও সংবাদ আহরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উপলব্ধির দিগন্ত ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হয়ে যায়। আর তারই প্রেক্ষাপটে কোনো মানব গোষ্ঠীর সমকালীন কবিতাসহ সকল শিল্পসৃষ্টি তার নির্দিষ্ট অবয়ব খুঁজে নেয় তার নিজের আর্থ সামাজিক

ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার নিরিখে। সুধীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে। কেবল কবিতা কেন শিল্পের যে কোন ক্ষেত্রে সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য- চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাট্যকলা, সঙ্গীত, স্থাপত্য। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আধুনিকতা বলতে আপাতত আমরা সাধারণ অর্থে যা বুঝি তা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জারিত হয়ে আসা কেবল পাশ্চাত্য সমাজে সংঘটিত কিছু পরিবর্তনের চিহ্ন, কিন্তু প্রথমত ও বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কেবল পাশ্চাত্য সমাজই নয় প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ মানব সমাজই একটি নতুন সময়ের মধ্যে জেগে উঠেছিল। পরবর্তীতে বিগত শতাব্দীর মধ্য বিন্দু থেকে আজকের দিন পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে যে বৈষম্যমূলক ঊর্ধ্বতন এবং এশীয় উন্নয়নের প্রারম্ভ সত্ত্বেও তৃতীয় বিশ্বের যে বিভ্রান্ত বাস্তবতা ‘এইসব রং রক্ত বিভীষিকা’, এবং ‘এইসব ভয়াবহ আরতির ভিতর দিয়ে’ মানব সমাজ হয়তো আরো সংশয়ী হয়েছে। সতর্ক হয়েছে সন্তস্ত হরিণের মতো। কিন্তু সেই প্রক্রিয়ায় সে নিশ্চলতা হারিয়েছে, স্বসিত্ম হারিয়েছে, সচকিত হয়েছে সন্ত্রাসে যখন সে জেনেছে নিজের সম্পর্কে ভীতিপ্রদ সত্য, পশুশক্তির এখনও জয়জয়কার এবং তার আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা যা শেষ, আপাতদৃষ্টিতে শেষ হবার নয়। কেননা সে এখনও পর্যন্ত পর্যুদ্যা হচ্ছে এক নায়কত্বে, স্বৈরাচারে, রাজনৈতিক শঠতার আক্রমণে, অনুপূর্ব মিথ্যাভাষণে, মানুষের বর্তমান ভাষা ও বাস্তবতার দ্বৈরথে। সুধীন্দ্রনাথ নিজের সমস্যা সম্পর্কে এই ঋণাত্বক জ্ঞানের ভার অনেকক্ষেত্রে দুর্বিষহ হয়ে উঠে তার জন্য। সন্ত্রাস সকলকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে কখনও কখনও। এই উত্তরাধিকারকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেনা আজ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বার বার দেখা গাছে যে আর নিরঙ্কুশ আনন্দ অর্জন করতে পারবোনা সরলভাবে।কবিতায় হয়ত কবিরা একদিন প্রতিষ্ঠানিক পর্যায় ফিরে যাবে কিন্তু সেই পর্যায় আর কোনোদিনই ভারত চন্দ্রের পর্যায় হবে না, এমনকি জসীম উদ্দীনেরও নয়। কাজেই আধুনিকতাপূর্ব, আধুনিক ও আধুনিতা উত্তর কবিতা বলে সত্যিকার অর্থে কোন কাব্যিক আঙ্গিকের অস্তিত্ব আছে বলে ধারণা করা কষ্টকর। কারণ কবিতার ধারাক্রম চিরত্মন এবং তার মর্মেও রয়েছে মানুষের চিরত্মন

পুরুষার্থ ও তার শাশ্বত নান্দনিক চৈতন্যের প্রবহমানতা, এই চলমানতার মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথের কবিতা, সংবর্ত কবিতা-

এখন বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা জেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্থিতির উদ্ভাসে
লাক্ষণিক,- নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাকপ্রচ্ছেদ নটী যেন। ..... সংবর্ত (সংবর্ত ১৯৫৩)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নিজের বিশিষ্টরূপটি পরিগ্রহ করে নেবেন। কিছু পরিগ্রহণ করবেন, কিছু বর্জন হয়তো করবেন, কিন্তু তার অত্মরুম চরিত্রে নির্যাসে এবং অবয়বে থাকবে মানুষেরই চিরনন্তন উপলব্ধি সমূহ- প্রেম-অপ্রেম, রিরংসা, ঈর্ষা, আনন্দবেদনা, সুদূরের পিপাসা সৌন্দর্যের উৎকর্ষে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার উদগ্র অভীপ্সা। কী রূপে সে প্রতিভাত হবে পরবর্তী সমাজের কাছে তা নির্ভর করবে ভবিষ্যতের সেই বিশেষ সমাজ বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের ওপরে। কেবলমাত্র এইটুকুই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তা মৌলিকভাবে কবিতা আধুনিক সমাজের একটি বীজ হয়ে থাকবে।সুধীন্দ্রনাথের কবিতার প্রসঙ্গে আবার স্বাভাবিকভাবেই কিছু কঠিন বাস্তবতার অনুপ্রবেশ ঘটে যার একটি হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ মানসের প্রেক্ষাপট। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর তৃতীয় বিশ্বে সাধারণভাবে যা ঘটে তা হচ্ছে প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার ব্যবহারের মধ্যে সময়ের তফাৎ এবং অনগ্রসর সমাজে জীবনযাত্রার মাঝে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে থাকা। অগ্রসর বিশ্বে যখন স্বয়ম্ভূ প্রযুক্তির ঊর্ধ্বতনের ভেতর দিয়ে অলক্ষ্যে সমাজ মানুষেও বিবর্তন আসতে থাকে আমাদের ক্ষেত্রে তখন উন্নত প্রযুক্তি নিজের ভেতর দিয়ে উদ্ভূত না হয়ে বাইরে থেকে আমাদের ওপর অনেক সময় আরোপিত হয়। অতএব নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশে যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াটি অন্যত্র সাধিত হয়েছে তার প্রেক্ষাপট এবং তাকে অন্য আরেকটি একেবারে ভিন্ন পরিস্থিতিতে ধারণ করবার ক্ষমতা- এ দুয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধান থেকে যায়।সমাজের

অধিকাংশ মানুষ, এমনকি সমাজের শিক্ষিত শ্রেণির এক বিরাট অংশ এই ব্যবধানজনিত পশ্চাদপদতার শিকার। অতএব তাদের মানসিক বিবর্তন অপেক্ষাকৃত শ্লথগতি হওয়াই স্বাভাবিক। উপরন্তু সকল সমাজে সর্বকালেই সাংস্কৃতিক দিক থেকে বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা সাধারণত নগণ্য হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শিল্প সাহিত্যে বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে নতুন করে আধুনিকতা ও তজ্জনিত দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গ এই বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কেননা কবি, চিন্তাবিদ, দার্শনিক, শিল্পী এরা সাধারণত স্বকীয় সমাজে ও তাদের কায়িক সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকেন এবং এ কারণেই স্ব স্ব সমাজে সমসাময়িক রুচির পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা গ্রহণ করেন তারাই। যিনি যতো বেশি শক্তিমান তিনি ততো বেশি পরিবর্তন ঘটিয়ে দেন। সর্বকালে সর্ব দেশে অলক্ষ্যে এমনটা সংঘটিত হয়ে চলেছে। কাল পরম্পরায় শিল্পের অবয়বে যে পরিবর্তন বা তাতে আধুনিকতার যে পরিচয় বা চিন্তাসমূহ বিধৃত হয় তা তো মূলত বহিঃরঙ্গে যদিও তার অন্তরঙ্গেও যে পরিবর্তন সূচিত হয় না তা নয়। তবে স্পনসরের সময় থেকে ফিলিপ লারকিনের সময় পর্যন্ত চর্যাপদের কাল থেকে আল মাহমুদের কাল পর্যন্ত পরিবর্তন ঘটেছে কি ইংরেজি বাংলা বিষয় আসয়ে, প্রকৃতি, প্রেম, নারী, ঈশ্বর, মানুষ, মানুষের সুখ,দুঃখ,আনন্দ,বেদনা,হতাশা- এই সবই তো সেকালে যেমন একালেও তেমনি সমানভাবে কবির উপজীব্য। আমাদের অন্তরের গহীন ভেতরে যে চিন্ময়, শাশ্বত বহমান ধারা কাজ করে তার চরিত্রে কি হয়েছে কোনো পরিবর্তন? পরিবর্তন ঘটেছে কি মানুষের গভীরতম নিবিড় অনুসন্ধিৎসার?দশক বিভাজনের পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু প্রবণতার উন্মেষ, চর্চা ও প্রভাব বিস্তার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। তথাপি অর্ধশতকের কাব্যিক ঐতিহ্য, বিভ্রান্তি ও মেধার সংশ্লেষে আশ্চর্য নৈরাজ্যময়তা বর্তমান। ত্রিশ শতকের অন্ধকার ও বিশাদে ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খেতে-খেতে দিগ্বিদিক লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছে চল্লিশ ও পঞ্চাশে শতকের সুধীন্দ্রনাথের কবিতা। তত্ত্বচর্চা তখন গৌণ। ধ্রুপদী, রোমান্টিক, মডার্ন, পোস্টমডার্ন ইত্যাদি তত্ত্ব এখন কবিতার ইতিহাসে সময় নির্দেশকমাত্র। তিন শতকের প্রথম দশকের কবিতায় অবসন্ন হয়ে পড়েছে স্লোগানধর্মিতা, অবসিত হয়েছে প্রেমকাতরতা। কবিতার প্রধান দুই ধারা তন্ময় বা

বস্তুনিষ্ঠ ও মন্ময় বা গীতিকবিতা। বর্তমানের কবিতায় দুই ধারার একাংশ বর্জিত, অন্যাংশ অতিচর্চিত। তন্ময় বা বস্তুনিষ্ঠ কবিতার মধ্যে রূপক, ব্যঙ্গকবিতার চর্চা অব্যাহত থাকলেও পরিত্যাজ্য হয়েছে গাথা, মহাকাব্য, নীতিকবিতা ও লিপি-কবিতা। একইভাবে মন্ময় বা গীতিকবিতার মধ্যে চিন্তামূলক, প্রেমমূলক, প্রকৃতি বিষয়ক, স্বদেশ-প্রীতিমূলক, লঘু বৈঠকি ও চতুদর্শপদীর চর্চা অব্যাহত থাকলেও পরিত্যাজ্য হয়েছে ভক্তিমূলক, শোক-গীত ও স্তোত্র। বর্তমানের কবিতা কথার টুকরো, ভাবের ভগ্নাংশ-নির্ভর এক ভঙ্গুর ও পারম্পর্যহীন বাক্যসমবায়ে বিনির্মিত চিত্রকল্পের জটিল প্রকাশ। বাস্তব সমাজের করাঘাতে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে অকৃতত্তিম বিষাদময়। কবি হয়ে উঠেছিলেন সমাজের শিকারী। কিন্তু সে সমাজ সর্বাত্মকরণে অনুসরণ করতে পারছে না ভাবনা। একটি প্রধান ভাব উৎপাদন ও তা অনুসরণ করে কবিতাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা পঞ্চাশ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ভেঙে যাচ্ছে বর্তমান সময়ে। কবিতা এখন আর আখ্যান ও পূর্ণাঙ্গতাকে ধারণ করতে পারছে না। এক চিমটি লবণের মতো গল্প, মিথ, ইতিহাস, দর্শন, চিত্রের মিশেলে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে উল্লম্ফনে হয়ে উঠেছে কোলাজ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানতেন সার্থক কবিতার জন্য সঙ্গতিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি রচনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তেমন অসঙ্গতিপূর্ণ পঙ্‌ক্তি রচনাও অর্থহীন নয়। একটি কবিতা একরৈখিকভাবে পূর্ণতা পেলো কিনা তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বহুরৈখিক কবিতায় পঙ্‌ক্তি বিশেষ কতটুকু কবিতা হয়ে উঠলো।

পারিপার্শ্বিকতাকে কবিতাকে আক্রান্ত করছে। বর্তমানের কবিতা ব্যক্তির যাপনশৈলী, দার্শনিকবোধ, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাসার বিলাচ্ছে। প্রতীকায়ন ঘটাচ্ছে, সীমানাপ্রাচীর ভাঙছে।তাঁর কবিতায় বাসা বাঁধছে আরোপিত আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ততাহীন নির্মাণ, নিরীক্ষাবিমুখকতা, অপ্রাসঙ্গিক জটিলতা ও নন্দনসৌন্দর্যহীনতা। কবিতার বিরুদ্ধে জনবিচ্ছিন্নতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ পুরনো তিনি তুলে ধরেননি।সমকালীন যুগের অস্থিরতা সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে যন্ত্রণা দিয়েছে। যুগের বৈরী পরিবেশে তিনি নিজেকে অসহায় ভেবেছেন, নিজেকে কল্পনা করেছেন সমাজ-সংসারের সকল কিছু থেকে পুরোপুরি স্বতন্ত্র এক মানুষ হিসেবে। পৃথিবীকে তাঁর মনে হয়েছে শূন্য, বন্ধ্যা এবং

নাস্তিময়। এজন্য তাঁর মধ্যে বাসা বেঁধেছে সংশয় ও অবিশ্বাস। কবিতায় শূন্যতাদ্যোতক উপমা হিসেবে তিনি ব্যবহার করেছেন বন্ধ্যা ফণিমনসা, শূন্য মরুপ্রান্তর, উপহাস্য মরুমায়া ও নিষ্ফলা মরুভূমি। তিনি নিরালম্ব নৈরাশ্যের জ্বালায় উচ্চারণ করেছেন : 'মনে হয়/অতল শূন্যের শেষে পড়ে আছি আমি নিরাশ্রয়/দেখিতেছি ভ্রমিভ্রান্ত চোখে/গতাসু আলোর প্রেত বিচরিছে স্তবকে স্তবকে/নিরালম্ব নৈরাশ্যের নিঃসঙ্গ আঁধারে। 'তিনি জন্মগ্রহণ করেন ভারতবর্ষের এক যুগ-সংক্রান্তির কালে। নানা আন্দোলন-সংগ্রাম, যুদ্ধ-মহামারী এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক পরিসরে ভাঙা-গড়া চলছিল তখন। এক কথায় তাঁর সমকাল ছিল নানাবিধ সমস্যা-সঙ্কটে নিমজ্জিত। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যুগের সেসব ঘটনা ও প্রবণতাকে। পেশাগত জীবনে একজন বিত্তবান সাংবাদিক হিসেবে তিনি যেতে পেরেছিলেন নগ্ন-রূঢ় বাস্তবের কাছাকাছি। যুদ্ধের বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তাঁর সংবেদনশীল মনে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সমান বয়সী এই কবি সজাগ দৃষ্টিতে সবকিছু অবলোকন করে দুঃসহ যাতনা ভোগ করেছেন। তিনি জন্মাবধি দেখেছেন যুদ্ধ বিপ্লব, তাই মেকি সভ্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছেন: 'আমি বিংশ শতাব্দীর/ সমান বয়সী; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে; বীর/নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে/বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে/যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে।'সুধীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন তাঁর সমসাময়িক যুগ নিষ্ঠুরতায় বিপর্যস্ত। বিশ্বের সকল স্থিতি লুপ্তপ্রায়; মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা, বর্বরতা আর তা-বে সবকিছু যেন রসাতলে যাচ্ছে। এজন্য পৃথিবীর শান্তি বিনষ্টকারী স্বার্থপর এবং যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রনায়কদের তিনি 'তৃষিত মড়কের পিশাচ' বলেছেন। চারিদিকে সম্ভাবনাহীন জগৎ, কোন সুস্থিরতা নেই, নেই জীবনে কোন স্বস্তি। এক ধরনের অবলম্বনহীন, নিরাশ্রয়, হতাশাগ্রস্ত ভাবনা কবিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ফলে বিনষ্ট মূল্যবোধ, আদর্শ ও অবক্ষয়ী সমাজের বাণীমূর্তি তিনি নির্মাণ করেছেন। উটপাখির প্রতীকে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত যুগ, সমাজ এবং নিহত সম্ভাবনার কথা ব্যক্ত করেছেন। উটপাখি যেমন ঝড়ের

সম্ভাবনায় মরুভূমির বালিতে মুখ গুঁজে আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করে; যুদ্ধ, মারি-মন্বন্তরে বিধ্বস্ত মানুষও তেমনি কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছে। যুগ জটিলতায় উদ্ভূত সঙ্কট থেকে তাঁর সত্তায় শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি হয়েছে নৈরাশ্যের ভয়াবহ রূপ। দিগভ্রান্ত মানুষের সেই নৈরাশ্যকে মরুভূমির উটপাখির প্রতীকে তুলে ধরেছেন: 'কোথায় পালবে? ছুটবে বা আর কত?/উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা/প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত/বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা' তিনি লক্ষ্য করেছেন তাঁর যুগে মানুষের বেঁচে থাকবার মতো রসদ নেই, মনের তৃষ্ণা দূর করবার মতো সৌন্দর্য নেই, মানবধর্ম টিকিয়ে রাখবার মতো সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিব্যক্তিবাদ নেই। শুধু রয়েছে রাজনীতির সর্বনাশা পাশা খেলা। সকল শুভবোধের বিলোপ ঘটেছে, পৃথিবীতে জাগ্রত হয়েছে কেবল অমঙ্গলের চিহ্নসমূহ। সেই নেতিবাচক বিনষ্ট যুগকে কবি উপস্থাপন করেছেন অমঙ্গলসূচক সব প্রতীক আর চিত্রকল্পের মাধ্যমে: 'নিশ্চিহ্ন সে-নচিকেতা; নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে/ধূমাঙ্কিত চৈত্যে আজ বীতাগ্নি দেউটি,/আত্মহা অসূর্যলোক, নক্ষত্রেও লেগেছে নিদুটি।/কালপেঁচা, বাদুড়, শৃগাল/ জাগে শুধু সে-তিমিরে; প্রাগ্রসর রক্তিম মশাল /আমাকে অবিল করে; একচক্ষু ছায়া, /দীপ্ত-নখ, স্ফীত-নাশা, নিরিন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক কায়া /চতুর্দিকে চক্রবূযহ বাঁধে।' সুধীন দত্ত চেতনায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লালন করেছেন সবকিছু সম্পর্কেই তাঁর অবিশ্বাস, অবিশ্বাস ঈশ্বরেও। তাঁর কবিতায় ঈশ্বর জিজ্ঞাসা দ্বন্দ্বমুখর হলেও তা মানবতন্ত্রী অথচ শূন্য ও নাস্তিবাদী বৈনাশিক চেতনায় পরিব্যাপ্ত। বাল্যকালে পিতার অদ্বৈতশিক্ষার পাঠে সংশয় তাঁকে অনেকটাই জড়বাদে উপনীত করেছিল। পরবর্তীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শন অনুশীলন তাঁর এ চেতনাকে আরও শানিত করে। বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ থেকে তিনি নাস্তিক্যবাদের রসদ পেয়েছিলেন। বৈরী বিশ্বের প্রতিকূলতা ও ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাও তাঁর মধ্যে নাস্তিক্যবাদী ভাবনা উপ্ত করেছে। তিনি অর্জন করেছেন সোহংবাদ বিষয়ে ধারণা। শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণবাদে আস্থাশীল হয়েছেন। ধর্ম ও ঈশ্বর সম্পর্কে এই অবিশ্বাস আধুনিক মানুষের চিত্তে সৃষ্টি করে প্রবল সংশয়। এযুগের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাই ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অবিশ্বাস

করেছেন, এমনকি ঈশ্বর সম্পর্কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। ভগবানকে কখনো তিনি 'য়িহুদির হিংস্র ভাগবান, কখনো 'যাযাবর অর্থের বিধাতা,' কখনো বা 'লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান' বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম থেকেই তাঁর কাব্যভাবনায় ঈশ্বর বিচ্ছিন্নতা দানা বাঁধতে থাকে। তিনি ঈশ্বরের প্রতি নিক্ষেপ করেছেন সংশয় মিশ্রিত নেতিবাচক বিদ্রূপ। কোন কবিতায় সন্দিগ্ধচিত্তে বলেছেন: 'নিরাকার নির্গুণের করিতেছি সন্দিগ্ধ অন্বেষ।' আবার কোন কবিতায় নেতিবাচক মনোভাবের দ্যোতক হিসেবে উচ্চারণ করেছেন: 'অলীক, অনাম কোন বিধাতার অলখ আসন।' ভগবানের উপর চরম অনাস্থা প্রকাশ করে লিখেছেন :'শ্বেত শুদ্ধ দেবতাত্মা? সে তো শুধু পীত পুরাতন/পুরাণের আখ্যায়িকা, চিরাভ্যস্ত অপলাপ শত '। তাঁর কবিহৃদয়ের 'জ্যোতির্ময় সিংহাসনখানি ডুবেছে নাস্তির গর্ভে।' তাঁর সংশয় জেগেছে 'হয়তো ঈশ্বর নেই' কিংবা তিনি কল্পনা করেছেন 'অপমৃত ভগবানকে'। নাস্তিক্য বিশ্বাসের অতলে ঈশ্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে নীটশের মতো বলে উঠেছেন : 'উড়ায়ে মরুর বায়ে ছিন্ন বেদ- বেদান্তের পাতা, /বলেছি পিশাচ হস্তে নিহত বিধাতা\\' পুঁজিবাদের দোর্দ- প্রতাপে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অসুর শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মানবের উপর। এমতাবস্থায় ঈশ্বরের মঙ্গলময় রূপ পরাহত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ অসুর শক্তির তা-বলীলার জন্য ঈশ্বরের অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করেছেন। তিনি ঈশ্বরের নিত্য রূপকে যেমন স্বীকার করেননি, তেমনি স্বীকার করেননি তার মঙ্গলময় ও সত্য রূপকে। ধ্বংসের বিভীষিকার উপর দাঁড়িয়ে ভগবানকে উপহাস করে বলেছেন: ' হায়, ভগবান।/ হায়, হায় ব্যর্থ ভগবান,/তোমার অমিত ক্ষমা, সে কি শুধু অসুরের তরে? /কিন্তু যারা প্রহরে প্রহরে/ উৎসর্গিছে অকাতরে অতিমূল্য প্রাণ / সুপ্রতিষ্ঠ করিবারে মরলোক সিংহাসন তব,/তারা অবজ্ঞার পাত্র। সুধীন্দ্রনাথ নানা বিশেষণে ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রূপ করে তাঁর নাস্তিক্যবাদী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। 'উদাসীন বিধাতা', ব্যর্থ ভগবান', 'কুটিল দেবতা', 'আশ্রিত বিধি', 'রুক্ষ বিধাতা', 'পৈতৃক বিধাতা', 'অলীক আত্মীয় ভগবান,' 'ক্রূর ভগবান' প্রভৃতি সম্বোধনের মধ্যে ভগবান সম্পর্কে কবির বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মের প্রতিও তিনি অন্বয় স্থাপন করতে পারেননি। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা

বৃথা জেনে উচ্চারণ করেছেন : 'তিলভা- সর্বনাশ; অতিদৈব বিশ্বের দেউল: / প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা: / প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল, /শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা। নাস্তিবাদী ভাবনা সুধীন দত্তের মনে যে সকরুণ বেদনা ও দ্বিধা সৃষ্টি করেছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি 'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ ধ্বনিত' করেছেন। তিনি স্বীয় চৈতন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন ব্যক্তিস্বরূপের অন্বেষায়। একটি বিষয় স্পষ্ট যে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত ভাবনায় সুধীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা, অবিশ্বাস, যন্ত্রণা ও দাহ তাতে তাঁর নিরীশ্বর জড়বাদী মনোভাব প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে নিরীশ্বর বৌদ্ধদর্শন দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধদর্শনের শূন্যবাদ ছাড়াও ক্ষণবাদী চেতনা সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় নৈরাশ্য রূপায়ণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছিল। ক্ষণবাদী দর্শনকে তিনি গভীরভাবে আত্মস্থ করেছিলেন বলেই লিখতে পেরেছিলেন: 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর যথাশক্তি অনুশীলনের ফলে আজ আমি যে দার্শনিক মতে উপনীত, তা যখন প্রাচীন ক্ষণবাদেরই সাম্প্রতিক সংস্করণ, তখন না মেনে উপায় নেই যে আমার রচনামাত্রেই অতিশয় অস্থায়ী। এই ক্ষণবাদী কবি দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেছেন : 'আমি ক্ষণবাদী : অর্থাৎ আমার মতে হয়ে যায় / নিমেষে তামাদী আমাদের ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, তথা /তাতে যার জের, সে-সংসারও। ' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেম ভাবনায় এসেছে নৈরাশ্যের ছাপ। তাঁর হৃদয় নিরাশা ও নেতিবাচক ভাবনায় ভরপুর। পুঁজিবাদী সমাজের একজন পোড়খাওয়া মানুষ বলে তাঁর হৃদয় থেকে প্রেম অপসৃত। বিরহ, শূন্যতা, হতাশা, বিলাপ, দীর্ঘশ্বাস এবং শেষ পর্যন্ত একাকিত্বের দুর্বিষহ যন্ত্রণা সুধীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনায় স্থান পেয়েছে। তাঁর কবিতায় 'এক বন্ধ্যা নায়কের হাহাকার শোনা যায়। ফলে 'ঘৃণা, ক্লান্তি, অবিশ্বাসের প্রাবল্যে কবি সমস্ত আদর্শবাদ, শাশ্বত প্রেমকে নিয়ে উপহাস বিদ্রূপ করেন।' তার প্রেমের কবিতায় নায়ক যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপনীত। এই যৌবনগত নায়ক বন্ধ্যাত্ব এবং অক্ষমতা নিয়ে নষ্ট-ভ্রষ্ট সভ্যতার নায়িকার প্রেমকে অবলোকন করে মর্মযাতনা পায়। তাঁর প্রেমচৈতন্যে বিষণ্নতা, নিঃসঙ্গতা এবং নির্বেদ শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। 'এ শূন্যতা আগুনের মতো জ্বালাময় স্বপ্নহীন বিক্ষুব্ধ অশান্ত শূন্যতা।' বৌদ্ধদর্শনের নাস্তিবাদী

শূন্যতা থেকে সুধীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনায় রিক্ততা ও বিচ্ছিন্নতার সংক্রমন ঘটেছে। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে প্রেম মানুষকে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। কিন্তু যুগের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নৈতিক মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে প্রেমে ফাটল ধরেছে। প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে দৈহিক কামনার দিকে মানুষ ধাবিত হয়েছে। পুঁজিশাসিত বিশ্বে মানুষের আবেগ-অনুভূতি ক্রমে ক্ষণকায় হওয়ায় তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে প্রেমহীনতা। 'প্রেমিক- প্রেমিকার পারস্পরিক ভালোবাসা এ যুগের অদৃশ্য দৈত্য নিয়েছে হরণ করে। ' প্রেম-ভালোবাসার বন্ধন শিথিল হওয়ায় পুঁজিবাদী যুগের মানুষ নিঃসঙ্গতার জ্বালা ভোগ করেছে। সুধীন্দ্রনাথ জেনেছেন ধনতান্ত্রিক 'যুগে প্রেমে নিষ্ঠা, তপস্যা, স্মরণ, অঙ্গীকার সবই মিথ্যা।' সেখানে তিনি নেতি ছাড়া কিছুই পান না। প্রেয়সীর আবির্ভাব তাঁর হৃদয়ে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আসে : 'তোমার উদীর্ণ আবির্ভাবে / মোর শূন্য পরিপূর্ণ হয় নাই কভু;/অবলুপ্ত অতল অভাবে/তোমার অজস্র দান/ বরঞ্চ গিয়েছে রেখে নেতির প্রমাণ।/ সুধীন্দ্রনাথ শাশ্বত প্রেম কল্পনা করতে পারেননি। ভালেরির মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন মানুষের পক্ষে পরস্পরকে ভালোবাসা অসম্ভব। প্রিয়ার নিবিড় সান্নিধ্যে তিনি পূর্ণতা পাননি। বিগত যৌবন নায়ক এবং মধুরিক্তা নায়িকার কল্পনা করে তিনি তাদের মধ্যে শাশ্বত প্রেমের সন্ধান পাননি দেখেছেন কেবল ক্ষণবিলাস। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুর নৈরাশ্যে উচ্চারণ করেছেন: 'হে মোর ক্ষণিকা,/তোমার অরূপ স্মৃতি, সে নহে শাশ্বত।' আরো বলেছেন :' অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;/ অসঙ্গত চিরপ্রেম; সংবরণ অসাধ্য, অন্যায়;' সুধীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনায় সুগভীর বিষাদ পরিদৃশ্যমান। বস্তুত, প্রেমের বঞ্চনা-মূর্তি তাঁকে নৈরাশ্য ভারাতুর করেছে। প্রেমের আধার তাঁর কাছে নিত্য সৃষ্টির সুষমা না হয়ে হয়েছে যৌবনের ভ্রান্তি 'নাস্তিক বুদ্ধির বশে কোনও দিনও যেন নাহি মানি, /হে অস্ত রতমা,/তুমি ভ্রান্তি যৌবনের, নও নিত্য সৃষ্টির সুষমা-' বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা ও বিরহের হাহাকার সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রবল। তাঁর প্রেমভাবনা বারংবার অতীতমুখী হয়েছে। হারানো প্রেমের দাহ তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। বিরহের জ্বালা তাঁর হৃদয়ে মরণ-যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলেছে বলেই তিনি লিখেছেন: 'অভাবে তোমার/অসহ্য অধুনা

মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,/ কাম্য শুধু স্থবির মরণ।' আশাহত কবি বিরহে কাতর এবং বিষাদমগ্ন হয়ে বলেছেন : 'কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হতে/কী যে তা বুঝিবে কে বা কেমন মতে।/ শুধু জানি এই টুকু/ কী এক বিপুল দুখ/ ভ'রে গেছে সারা বুক গোপন ক্ষতে। / কী যেন হারায়ে গেছে জীবন হ'তে।' তাঁর প্রেমের কবিতার নামকরণে যেমন নেতিবাদী ভাবনা কাজ করেছে তেমনি কবিতার বিষয়বস্তুতেও নৈরাশ্যবাদী ভাবনা প্রবলভাবে উপস্থিত হয়েছে। 'পলাতকা' 'মৃতপ্রেম' 'ভ্রষ্টলগ্ন' নামাগুলো ইতিবাচক কোন ইঙ্গিত দেয় না। এসব কবিতায় অতৃপ্ত প্রেম কল্পনা ও ব্যর্থতার বেদনা চূড়ান্ত হতাশায় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এজন্য 'সকলি আজ লুপ্ত মোদের চিত্তদেশে/প্রেমের চিতাভস্ম শেষে' ৫৮ বলে কবি হাহাকার করতে পারেন। তাঁর মানসী স্বপ্নেই বিরাজ করেছে, বাস্তবে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্বের যন্ত্রণা দিয়েছে। কবির ভাষ্য : ' মানসীর দিব্য আবির্ভাব, সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী; /তাহার বিখ্যাত রাখি, / সে নহে মঙ্গলসূত্র কেবল কুটিল নাগপাশ; /মলময় তাহার উচ্ছ্বাস /বোনে শুধু উর্ণাজালে অসতর্ক মক্ষিকার পথে। ' প্রিয়ার অদর্শনে তিনি নরকযাতনা ভোগ করেছেন; ফলে আর্তনাদ করে জানিয়েছেন: 'পাপ ও আশিস, সুধা আর বিষ/একত্রে বিধি বিতরে মোরে।' প্রেয়সীর সঙ্গে মিলনেও সুখ নেই, কারণ তার ভেতরে বাসা বেঁধেছে রিক্ততা ও ক্লেদ। স্বপ্ন ভঙ্গের হাহাকার আর সুগভীর বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত কবির উক্তি: 'মন্থর কালের স্রোতে স্তূপীকৃত হয় সর্বনাশ; মোদের বিচ্ছিন্ন করে মৃত্যুসম দুস্তর।অপ্রাপনীয় প্রেমের দাহে সুধীন্দ্রনাথের কবিচিত্তে দেখা দিয়েছে নৈঃসঙ্গ্য ও শূন্যতাবোধের আর্তি, আত্মধিক্কার ও অনুতাপ, বিতৃষ্ণা ও নির্বেদ। নিরুদ্বেগ প্রেমিকার পাশে উপবিষ্ট কবি অনুভব করেন বিশ্ব চরাচর অরাজক ও উচ্ছৃঙ্খল এবং তিনি একা। এই একাকিত্ব চারিয়ে যায় তাঁর সমগ্র অস্তিত্বে; পরম রিক্ততায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় : 'চারিপাশে মোর মরু করে ....., /আমি অবলোকি তার করপুটে /দামহীন মালাখানি।' ক্ষণিক প্রেমের স্তবগানে তিনি যেমন বলেছেন: 'মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে'; তেমনি শূন্যতায় মিলে যাওয়া নিরুপম আননের স্মৃতি স্মরণ করে লিখেছেন : 'শুধু নিরুপম /এখন আননখানি

সীমাশূন্য শূন্যে যে লুকালে, তাই আজি তব স্মৃতি, মগ্নতরী জঞ্জালের মতো, সহে না আশার ভার, করে, হায়, বিদ্রূপে বিব্রত।সুধীন্দ্রনাথের জীবনবোধ, বিষণ্ণতা, সংহত প্রকরণ সবই প্রেমের রূপকে ফোটাতে সহায়তা করেছে। বিচ্ছেদে পূর্ণতার কোন ইঙ্গিত তিনি পাননি এমনকি মিলনেও; পেয়েছেন কেবল সর্বব্যাপী রিক্ততা ও যন্ত্রণার হাহাকার। শাশ্বত প্রেম অকল্পনীয়, প্রেমের ক্ষণবিলাসই মুখ্য বলে তাঁর বোধ কেবল নিঃসঙ্গতায় হাহাকার করেছে। প্রেমসূত্রে জাত নৈঃসঙ্গ্যবোধ সুধীন্দ্র হৃদয়ে উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করেছে; শুধু নৈঃসঙ্গ্য নয় সুধীন্দ্রনাথ মুখোমুখি হয়েছেন শূন্যতা, নৈরাশ্য ও ভবিতব্যের।'

১০.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ও মৃত্যু সাল উল্লেখ কর।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৯০১ সালে ও মৃত্যু ১৯৬০ সালে।

২- সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উল্লেখ যোগ্য কাব্য গ্রন্থ গুলির নাম উল্লেখ কর।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি- কাব্য তন্বী (১৯৩০), অর্কেস্ট্রা (১৯৩৫), ক্রন্দসী (১৯৩৭), উত্তরফাল্গুনী (১৯৪০), সংবর্ত (১৯৫০), দশমী (১৯৫৬), গদ্যগ্রন্থ স্বগত (১৯৩৮), কুলায় ও কালপুরষ(১৯৫৭)। এছাড়া প্রতিধ্বনি (১৯৫৪) তার নামে একটি অনুবাদগ্রন্থও আছে।

১০.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- সুধিন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।

২-অনুবাদ কাব্যে সুধিন্দ্রনাথ দত্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর। এবং তাঁর কাব্য অনান্য কবি দের কাব্যের তুলনায় কতটি স্বীকৃতি পেয়েছে?

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা,

বংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন,

বংলা সাহিত্যের ইতিহাস- দেবেশ কুমার আচার্য্য।

একক-১১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতা

বিন্যাস ক্রম

১১.১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ও কবিতা পত্রিকায় কাব্য সৃষ্টির সাধনা

১১.২ দয়মন্তী, রূপান্তর, মাছধরা, শিল্পীর উত্তর এবং অনান্য কবিতায় প্রেম ও আধুনিকতার প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব

১১.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১১.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১১.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১১.১ বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় ও কবিতা পত্রিকায় কাব্য সৃষ্টির সাধনা

রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে কীর্তিমান সব্যসাচী সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যের সব শাখা তার বিচরণে ঋদ্ধ হলেও কবিতায় ঘটেছে তার শীর্ষতম নিমগ্নতা। শুধু কবি হিসেবে নয়; কবিতা কর্মী, কবিতার শিক্ষক, প্রচারক, সংগঠক হিসেবেও। রবীন্দ্র প্রভাববলয় অতিক্রমের চেষ্টা তিরিশের অনেক কবিই করেছেন। 'কল্লোল-কালি কলম-প্রগতি' এবং 'পরিচয়-পূর্ব্বাশা -কবিতা'র সঙ্গে যুক্ত কবিবৃন্দই আধুনিক বাংলা কবিতার স্থপতি। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে সেই আধুনিকতার উচ্চায়ত ধারক। কিছু পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য। এরা প্রত্যেকেই আধুনিক বাংলা কবিতার অবয়ব নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এরপরও তাদের সবার চেয়ে আলাদা মর্যাদায় উচ্চারিত হবে বুদ্ধদেব বসুর নাম। গোটা একটি জীবন কবিতার আলিঙ্গনে সমর্পণ করেছেন তিনি। কবিতা তার অশরীরী প্রণয়নী। আধুনিক বাংলা কবিতার পক্ষে বলিষ্ঠতম কণ্ঠস্বর তার। তার যোগ্যতম শ্যেনদৃষ্টিতে মলাটবন্দি হয় আধুনিক বাংলা কবিতার বিশ্বস্ত সংকলন। কবিতা ও আধুনিকতার শত্রু প্রতিক্রিয়াশীল 'শনিবারের চিঠি' সপ্তরথীর মতো আক্রমণ করে তাকেই। আধুনিক বাংলা কবিতা প্রতিষ্ঠার জন্য এত শ্রম, ঘাম,

ত্যাগ স্বীকার আর কেউ করেননি। ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ কবিকে স্বাগত জানানো, অবহেলিত কবি প্রতিভাকে খাঁটি জহুরির মতো চিহ্নিতকরণ, আধুনিক কবিতাকে জনপ্রিয় করে তুলতে নিদ্রাহীন উৎকণ্ঠা ও উদ্যোগ, আধুনিক কবির রচনার সনিষ্ঠ মূল্যায়ন -বুদ্ধদেবের কবিতা বিষয়ক কীর্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বহুমুখি বুদ্ধদেব বসুর কবিতাকেন্দ্রিক কর্মযজ্ঞের উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে তার 'সম্পাদক' সত্তার মধ্য দিয়ে।সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বহুবর্ণিল সাফল্যের পরিচয় দিলেও বর্তমান প্রবন্ধে আলোকপাত করা হচ্ছে সিকি শতাব্দী ধরে তার সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকাটি। ছাত্রাবস্থায় 'পতাকা' ও 'প্রগতি' নামে দুটি ক্ষণস্থায়ী পত্রিকা সম্পাদনায় অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন শুধু কবিতাকেন্দ্রিক একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করতে। 'পরিচয়' সাহিত্যপত্রের এক আড্ডায় অন্নদাশংকর রায়ের হাতে ইংরেজি 'পোয়েট্রি' পত্রিকাটি দেখে তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন 'কবিতা' প্রকাশ করতে। তার ভাষায়-

'আমি কখনও কখনও এমন পত্রিকার স্বপ্ন দেখতাম যেটা শুধুই রূপ ঐ মার্কিনি নমুনাটিতে দেখতে পেয়ে আমি একটি দুঃসাহসিক কথা চিন্তা করে ফেললাম : এরকম একটা বের করা যায় না বাংলায়? তা হ'লে তো কবিতা এবং কবিরা পদপ্রান্তিক অবমাননা থেকে বেঁচে যান। '.....

শুধু কবিতার জন্য একটি সাহিত্যপত্রের আবির্ভাবে সেদিন কবিতার কৌলিন্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবিতা অর্জন করেছিল স্বতন্ত্র মর্যাদা এবং যোগ্য কবির জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল 'কবিতা'। সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর স্বকীয় দর্শন ও স্বপ্নের বীজ অংকুরিত হয়েছিল 'কবিতা' পত্রিকায়। প্রথম সংখ্যাতেই নিজের লক্ষ্য স্পষ্ট করে তুললেন -'কবিতা' হবে 'এমন কোনো পত্রিকা' 'যার মধ্য দিয়ে কবিতা হতে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত ও রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর'। রবীন্দ্রবলয় অতিক্রম প্রয়াসী আধুনিক কবিদের প্রধান পীঠস্থান 'কবিতা' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সসম্ভ্রম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি নিয়মিত কবিতা পাঠিয়েছেন এ পত্রিকার জন্য। রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর করার পাশাপাশি 'কবিতা'কে ভালো কবির বিকাশ ও লালনভূমি হিসেবেও

প্রতিষ্ঠা করেছেন বুদ্ধদেব বসু। একজন সৎ সম্পাদকের এর চেয়ে উপযুক্ত কাজ আর কী হতে পারে? রবীন্দ্র পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত জীবনানন্দ দাশের আবিষ্কারক সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বসু পাকা জহুরির মতো আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে বড় রত্ন জীবনানন্দকে চিনতে পেরেছিলেন। আবির্ভাবলগ্নে জীবনানন্দ যখন উপেক্ষিত তখন বুদ্ধদেবই তাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে বের করে আনলেন। তার পত্রিকায় 'প্রকৃতির কবি' শিরোনামে জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে তাকে প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। 'কবিতা'র পাতায় জীবনানন্দের কবিতা এবং তার কবিতা সম্পর্কে আলোচনাই যে তাকে আধুনিক বাংলা কবিতার কেন্দ্রীয় পুরুষে পরিণত করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু জীবনানন্দই নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম স্রষ্টা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আবিষ্কারকও বুদ্ধদেব। 'কবিতা' পত্রিকায় তার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। তার প্রতি বুদ্ধদেবের সীমাহীন উচ্ছ্বাসের প্রমাণ তারই উদ্যোগে নিজের প্রকাশনা 'কবিতা ভবন' থেকে প্রকাশিত হয় সুভাষের কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'। বাংলা কবিতার নতুন সম্ভাবনা এভাবেই সম্পাদক বুদ্ধদেবের পরিচর্যায় বিকশিত হতে থাকে। নবীন কবি হিসেবে বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র , সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, অজিত কুমার দত্ত 'কবিতা'য় ঠাঁই পেয়েছেন। সচেতন পাঠকের সঙ্গে নবাগত কবিদের উপযুক্ত সেতুবন্ধন বুদ্ধদেব নির্মাণ করেছিলেন তাদের কবিতা ও কবিতার আলোচনা প্রকাশের মাধ্যমে। এ কথা বিস্মৃত হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, বুদ্ধদেব নিজেও ছিলেন একজন কবি। সাধারণত কবি-সম্পাদক সমকালীন কবিদের উত্থান ভালো চোখে দেখেন না নিজের গুরুত্বহানির অমূলক আশংকায়। অথচ এমন ঈর্ষাপরায়ণতা সম্পাদক বুদ্ধদেবকে কখনও গ্রাস করতে পারেনি।শুধু ভালো কবি নয়, ভালো পাঠক তৈরির পটভূমি তৈরিতেও ভূমিকা পালন করেছেন সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যের চেনা গলি নয়, পাঠকের অভ্যস্ত প্রাত্যহিকতা নয়, বুদ্ধদেব সাফল্যের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন নিরীক্ষা প্রবণতাকে। পাঠকের সাহিত্যরুচি নির্মাণের ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কবিতার রসাস্বাদনের জন্য পাঠকের সংস্কারমুক্ত মন ও গভীর উপলব্ধি

জরুরি। প্রতিভা শ্রমের সমবায়ে যেমন ভালো কবি নির্মিত হন, একই নিষ্ঠা প্রয়োজন সমঝদার পাঠক হওয়ার জন্যও। বুদ্ধদেবের উপলব্ধি-

"কবি হয়ে জন্মাতে হয়, কবিতার পাঠক হয়েও জন্মাতেই হয়, হয় তো।"

কবিতার উপযুক্ত পাঠক তৈরির জন্য তিনি শুধু ভালো কবিতাই ছাপেননি 'কবিতা'র পাতায়, কবিতা বিষয়ক নিবন্ধ, আলোচনাও প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর সবচেয়ে বড় সহযোগী গদ্যশিল্পী বুদ্ধদেব। অসম্ভব মেধা ও মনীষার অধিকারী বুদ্ধদেবের সুবিস্তৃত অধ্যয়ন জগতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের গভীর প্রভাব পড়েছিল। ইউরোপ-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবি লেখক, সাহিত্যান্দোলনের খবর - কোনোকিছুই তার অজানা ছিল না। অগাধ সাহিত্যজ্ঞান তার সম্পাদনা প্রতিভাকে সর্বত্রগামী করেছিল। 'কবিতা' পত্রিকা তাই হয়ে উঠেছিল সাহিত্যের বিশ্বায়নের প্রতীক। কিপলিং , ইয়েটস, ভার্জিনিয়া উলফ, র‍্যাবো, এইচজি ওয়েলস রাইনার, মারিয়া রিলকে, গ্যোটে, বোদলেয়ার, হাইনে -বিশ্বসাহিত্যের সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক নেমে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সাহিত্যপত্র 'কবিতা'র উর্বর ভূমিতে। নিজে অনুবাদ করেছেন, অন্যকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছেন -এভাবেই বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছিল বাঙালি লেখক ও পাঠকের। বুদ্ধদেবের যোগ্যতম সম্পাদনা ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না।বুদ্ধদেব বসু প্রমাণ করেছেন সম্পাদকের অন্যতম গুণ বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বাছাই করেছেন ভালো কবিতা, স্বীকৃতি দিয়েছেন যোগ্য কবিকে। 'কবিতা' পত্রিকায় কবিতা ছাপা হওয়া মানেই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ -বাংলা সাহিত্যে এমন গৌরব আর কোনো সাহিত্যপত্র অর্জন করতে পারেনি। পঞ্চাশের দশকে কবি যশোপ্রার্থী আল মাহমুদ ও তার সতীর্থ কবির কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতেন যেন 'কবিতা' পত্রিকায় তাদের কবিতা ছাপা হয়। বাণিজ্যিক লক্ষ্য, রাজনৈতিক সংকীর্ণতা, গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা -এসব মূর্খ স্থূলতা সম্পাদক বুদ্ধদেবের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে কবিতা লেখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। অথচ মার্কসবাদে দীক্ষিত কবিরা 'কবিতা'র পাতায় উপেক্ষিত হননি। বুদ্ধদেবের প্রধান লক্ষ্য ছিল 'কবিতা'র জয়রথকে এগিয়ে নিয়ে চলা।

কবিতার প্রতি অকৃত্রিম প্রেমে তিনি ব্যয় করেছেন সমগ্র জীবন, বছরের পর বছর ধরে, দশকের পর দশক পেরিয়ে। নির্মোহতা, প্রেম, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, ঋজুতা -নানা কষ্টিপাথরে সম্পাদনার মান বিচার করা যায়। প্রতিটি মানদণ্ডে বুদ্ধদেব সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার সম্পাদনা প্রতিভাকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি বুদ্ধদেবীয় দর্শনবিরোধী অশোক মিত্র। তার মূল্যায়ন-

‘‘বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’-সম্পাদনা, অথবা রবীন্দ্রনাথের ‘সাধনা’-সম্পাদনা, সমকালীন সাহিত্যচিন্তায় যে আলোড়ন তুলেছিল, বুদ্ধদেবের ‘কবিতা’ কীর্তি তার অন্তত সমপর্যায়ের, কিংবা সম্ভবত শ্রেষ্ঠতর। কবিতাকে সাহিত্য সৃষ্টির পুরোভাগ উপস্থাপন করার মতো স্পষ্ট সাহসের উন্মোচন, পঁচিশ বছর ধরে সেই সাহসের জয়গান ঘোষণা, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের যুগে অভাবিত ছিল, হয়তো তার পরেও অভাবিত থেকে যেত, যদি না বুদ্ধদেব বসু তার উদ্যম-কল্পনার ঘোড়সওয়ারে দুঃসাহসী উদ্যামতার জিন চড়াতেন।’’

বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদকীয় নেতৃত্বে কবিতা লেখার কাজটি হয়ে উঠেছিল রীতিমতো একটি আন্দোলন, যার মুখপত্ররূপে উজ্জ্বল প্রকাশ ‘কবিতা’ পত্রিকার। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল আধুনিক বাংলা কবিতার সগৌরব অবয়ব নির্মাণ। আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ‘কবিতা’ পত্রিকা বন্ধ করে দেন বুদ্ধদেব। মাত্র ছাব্বিশ বছরের আয়ু ‘কবিতা’র যেন ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে দ্রুত নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে অন্তর্হিত হল। বিরোধ আর বৈপরীত্যের মধ্যে বিরল সমন্বয়ের কৃতিত্ব সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর। আধ্যাত্মিকতার পাশে রাজনৈতিক দর্শন, নাগরিক বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গের মাঝে প্রকৃতি তন্ময়তা, পদ্যছন্দের পাশে গদ্যছন্দ, রোমান্সনির্ভর কবিতার পাশে বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন, অতিন্দ্রীয় চেতনার পাশে ইন্দ্রিয়ঘন উচ্ছ্বাস -সবকিছুই প্রশ্রয় পেয়েছে ‘কবিতার’র পাতায়। বিংশ শতাব্দীর তিন দশক অতিক্রম হলেও ভারতবর্ষে তখন এমন কোন সাহিত্যপত্র ছিল না, যেখানে কবিতাকে গুরুত্বসহকারে স্থান দেয়া হতো। সে সময়ে যেসব সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হতো সেখানে কবিদের স্থান কেবল নগণ্যই নয়, বলা যায় অচ্ছুৎও ছিল। অনেকে বলতেন, সাহিত্যপত্রে, বিশেষত

‘প্রবাসী’তে ইঞ্চি মেপে যেন কবিতা ছাপা হতো। অন্যদিকে ‘সবুজপত্র’, ‘কল্লোল’, ‘পরিচয়’ ইত্যাদি পত্রিকাগুলোতে কবিতা ছাপা হলেও সেগুলো বেশিরভাগই ছিল রবীন্দ্রনাথ নির্ভর। অন্যান্য কবিদের ঠাঁই সেখানে কম হতো, তরুণ কবিদের লেখা প্রকাশ হতো আরও কম। বুদ্ধদেব বসু এ সম্পর্কে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, ‘আবাল্য দেখেছি, বাংলা মাসিকপত্রে কবিতার স্থান পদপ্রান্তিক। অর্থাৎ যেখানে কোন গদ্যরচনা শেষ হলো তারই ঠিক তলায় থাকে কবিতা-কোথাও কোথাও রর্জইস অক্ষরে কুণ্ঠিত হয়ে। ১৯৩২-৩৩-এ কলকাতায় ভাল পত্রিকা অনেক ছিল কিন্তু এমন কোন পত্রিকা ছিল না যার মধ্য দিয়ে কবিতা হতে পারে বিশেষভাবে প্রকাশিত, প্রচারিত ও রসজ্ঞজনের দৃষ্টিগোচর।’ মাসিকপত্রে কবিতা প্রকাশ নিয়ে কুণ্ঠা, অনাদর ও অনাগ্রহের বিষয়টি বুদ্ধদেবকে সবসময় আচ্ছন্ন করে রাখত। এর থেকে পরিত্রাণও তিনি চাইতেন প্রবলভাবে। তাঁর আগ্রহের নদীতে জোয়ার আসে ইংরেজী পত্রিকা ‘পোয়েট্রি’ দেখার পর। ‘পরিচয়’ পত্রিকার এক আড্ডায় অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাতে এ পত্রিকাটি দেখেছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি এ পত্রিকাটির আদলেই কেবলমাত্র কবিতা নিয়ে বাংলায় সাহিত্যপত্র প্রকাশ করার চিন্তা করেন। এ চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটে ক বছর পরেই। ১৯৩৫ সালে প্রথমবারের মতো ‘কবিতা’র প্রকাশিত হয়। বুদ্ধদেব ‘পোয়েট্রি’ পত্রিকা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যপত্রের নাম রাখেন ‘কবিতা’। শুধু নামই নয়, পোয়েট্রির সম্পাদকীয়ও নীতিও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। বুদ্ধদেব দেখেছিলেন পোয়েট্রিতে কবিতা ও কবিতার সংক্রান্ত গদ্য প্রকাশিত হয়। ‘কবিতা’ সম্পাদনায় তিনি নির্দ্বিধায় এ নীতি গ্রহণ করেন। কবিতার প্রকাশ নিয়ে বুদ্ধদেব বসু বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ‘বিচিত্রা’ পত্রিকায়। সে বিজ্ঞাপনে ‘কবিতা’ প্রকাশের কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায় :

‘কবিতাকে যথোচিত গৌরবে বিশেষভাবে ছেপে থাকে এমন সাময়িকপত্র বর্তমানে দেশে বেশি নেই। অথচ আধুনিক কবিদের অনেকেই নতুন কবিতা লিখছেন-বাইরের পাঠকমন্ডলী দূরে থাক, অনেক সময় নিজেদের মধ্যে সেগুলো দেখাশোনার সুবিধে হয় না। এই কারণে আমরা একটি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র বের করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার নাম হবে ‘কবিতা’ এবং তাতে থাকবে শুধু-কবিতা।’

পত্রিকার নাম, সম্পাদকীয় নীতি ঠিক হলো। এখন প্রয়োজন প্রকাশনা। সে সময়ে পত্রিকা প্রকাশনা সহজ ছিল না। চাঁদার টাকায় 'কবিতা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলো। 'কবিতা' পত্রিকাটির প্রারম্ভ সংখ্যাটি পুর্বাশা প্রেসের সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্ত বিনামূল্যে ছেপে দিয়েছিলেন। কবিতার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের ১ অক্টোবর। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র। সহকারী সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। কবিতার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করেন অনিল। প্রারম্ভ সংখ্যায় লিখেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, অজিতকুমার দত্ত, প্রণব রায়, স্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বাগচী। ত্রৈমাসিক কবিতার প্রথম সংখ্যাটি ছিলো ৪০ পৃষ্ঠার; প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল ছয় আনা, বার্ষিক মূল্য ছিল দেড় টাকা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কবিতার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের দিনই বুদ্ধদেবের বড় মেয়ে মিমির জন্ম হয়।কবিতার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশের পরপরই এটি সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। যার ফলে প্রথম বছরেই এর গ্রাহক সংখ্যা ৭০ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধদেব বসু সসংকোচে রবীন্দ্রনাথের কাছে 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা পাঠিয়ে ছিলেন। তাঁর ভাষ্যে : 'ঈষৎ ভয়ে-ভয়ে এক কপি পত্রিকা পাঠালাম রবীন্দ্রনাথকে, প্রার্থনা করলাম তাঁর একটি কবিতা।' বুদ্ধদেব ভাবতেই পারেনি তাঁর জন্য বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। বুদ্ধদেবের চিঠি পাওয়ার দুই-তিন দিনের মাথায় রবীন্দ্রনাথ জবাব দিয়েছিলেন। তিনি 'কবিতা' পড়েছিলেন এবং প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন 'ছুটি' কবিতাটিও। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : ''তোমাদের 'কবিতা' পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। এর প্রায় প্রত্যেকটি রচনার মধ্যেই বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্য-বারোয়ারি দল-বাঁধা লেখার মতো হয়নি। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পাঠকদের সঙ্গে এরা নূতন পরিচয় স্থাপন করেছে।'' 'কবিতা' সাহিত্যপত্র হিসেবে নতুন হলেও শিল্পমানের কারণে রবীন্দ্রনাথ অকৃপণভাবে কাগজটির প্রশংসা করেছিলেন। কবিতার প্রথম সংখ্যাটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন-এটি তরুণ বুদ্ধদেব ও 'কবিতা'র জন্যে ছিল অনেক বড় প্রাপ্তি। কবিতার আরও একটি বিশেষ প্রাপ্তি রয়েছে। টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে 'কবিতা'র আলোচনা

প্রকাশ হয়েছিল। আলোচক ছিলেন এ্যাডওয়ার্ড টমসন। এই বৈদেশিক আলোচনা বুদ্ধদেব বসুকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কবিতার ২য় বর্ষে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদনা থেকে দূরে সরে গেলে বুদ্ধদেব বসু একাই 'কবিতা' সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৬০ সালে কবিতা পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত এর ১০৪টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষার গুরুত্বপূর্ণ এ সাহিত্যপত্রের বিভিন্ন সংখ্যায় ৩৪৫ জন লেখক লিখেছিলেন। প্রকাশনার দীর্ঘ ২৫ বছর এ সাহিত্যপত্রটি বাঙালী সাহিত্যিক ও পাঠকের কাছে পরম মহার্ঘ ছিল। পরবর্তীতে 'কবিতা' এতই আরাধ্য ও বিশেষ পত্রিকায় রূপ নিয়েছিল যে, এখানে কবিতা প্রকাশ করা কবি স্বীকৃতির নামান্তর বলেই মনে করতেন তরুণ কবিবৃন্দ। এর কারণও ছিল। বুদ্ধদেব বসু লেখা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রকাশনা পর্যন্ত দরদ দিয়ে 'কবিতা' সম্পাদনা করতেন। মানহীন লেখা তিনি ছাপাতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে আজও 'কবিতা'র ঋণ বাঙালী লেখক মাত্রই স্বীকার করেন।

১১.২ দয়মন্তী, রূপান্তর, মাছধরা, শিল্পীর উত্তর এবং অনান্য কবিতায় প্রেম ও আধুনিকতার প্রকাশে বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্ব

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যসাধনার বিপুলতা কেবল রবীন্দ্রনাথের খন্ডাংশের সঙ্গে তুলনীয়। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কাব্যনাটক, অনুবাদ, আত্মজৈবনিক রচনা, ভ্রমণকাহিনী-সব মিলিয়ে তিনি অতুল বৈভবময় সৃষ্টিজগতের অধীশ্বর। আধুনিক সাহিত্যকাল খন্ডায়নের, বিচুর্ণায়নের, নানা একদেশদর্শিতার-আধুনিক সাহিত্যিকজীবন নামক বিশাল-বিপুল যজ্ঞের এক কণাংশের খবরদারি পেলে বর্তে যান। কিন্তু বুদ্ধদেব বসু বাংলা কবিতায় আধুনিকবাদের অন্যতম ধারক ও প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও নিজের সৃষ্টিশীলতাকে সংকীর্ণতায় নিবিষ্ট করেননি। তিনি দৃশ্যত সেই ধরনের বৈশ্বকোষিক সাহিত্যিকদের মধ্যে শেষতম, যাঁদের দেখা অধুনাপূর্ব যুগে সচরাচর মিলত, যাঁরা সমুদ্রসন্ধানী ছিলেন, যাঁরা একই সঙ্গে সৃজনকলার নানা ভঙ্গিমাকে আরাধ্য করতে পেরেছিলেন। জন্মশতবার্ষিকীর শুভক্ষণে বাংলা সাহিত্যের এই নিবিষ্ট সাধককে

অভিবাদন জানাই।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটা অবিসংবাদিত হলেও কবিতায়ও তা হয়েছে।বাংলা কবিতায় আধুনিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর গৌরবময় ভুমিকায় তাঁর পুরোধাদের মধ্যে গুণক্রমে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, এমনকি সুধীন্দ্রনাথেরও তরুণ পাঠকদের কাছে কেন তিনি আদরণীয় থাকছেন।

আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় নামের দীপ্তি ত্রিপাঠী-রচিত প্রবাদপ্রতিম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। বুদ্ধদেব বসুর বয়স তখন পঞ্চাশ, তাঁর কাব্যখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত; পুনরপি বোদলেয়ার :তাঁর কবিতা নামের প্রবলপ্রতাপী ও প্রভাবক অনুবাদগ্রন্থ, যেটি অচিরেই উভয় বাংলার তরুণদের 'আঁখি হতে ঘুম' হরণ করে নেবে এবং তাঁর সামনে 'পথ রুধি' কোনো 'রবীন্দ্র ঠাকুর' বর্তমান নেই। সেই ঘটনার পর আরও পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে; শতাব্দী-ক্রান্তির অন্য আলোয় বুদ্ধদেব বসুকে শুধু নয়, সমগ্র আধুনিক কাব্যমন্ডলকে পুনর্বিচারের প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছিল।ত্রিপাঠী তাঁর আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় গ্রন্থে তিরিশ-উত্তর বাংলা কবিতার নাম দিয়েছেন আধুনিক বাংলা কাব্য। এরও পাঁচ বছর আগে বুদ্ধদেব বসু স্বয়ং তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতা সংগ্রহ-র ভুমিকায় আধুনিক কবিতার সংজ্ঞায়ন প্রচেষ্টা করেছেন এভাবে :'... এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দ্বারা অবিকল শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন-ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।' এই সংজ্ঞায়ন যে দ্বিধাগ্রস্ত মাধবীর মতো দোলাচলে দীর্ণ তা বেশ বোঝা যায়। ত্রিপাঠী, বুদ্ধদেবের অনুরাগিণী গবেষক, তাঁর বইতে এই দোলাচলকে ঢাকতে চেয়েছেন, কিন্তু আমরা বুদ্ধদেবের মন সহজে বুঝতে পারি। য়ুরোপীয় আধুনিকবাদ কবিতার যে সব লক্ষণ নির্দেশ করেছে, সেখানে 'বিস্নয়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ'

প্রভূত থাকলেও, 'বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি' রয়েছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। বিশ্ববিধানে এবং এর নিয়ন্তার অস্তিত্বে আস্থাকে ভুমিহীন করার মধ্য দিয়েই অথবা এর ভুমিহীন হওয়ার কারণেই আধুনিক কবিতা তাঁর স্থান করে নিয়েছে নৈরাশ্য আর সংশয়ের পোড়োজমিতে। 'আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ' দেখে 'বিস্ময়ে' যাঁর প্রাণ জেগেছিল, তিনি তো 'প্রাগাধুনিক' মানুষ রবীন্দ্রনাথ, যাঁর চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করার মধ্যেই তো ছিল বুদ্ধদেব বসুদের বিদ্রোহ। দীপ্তি ত্রিপাঠী আধুনিক কবিতার যে লক্ষণসংহিতা রচনা করেছেন, সেই দ্বাদশ লক্ষণের মধ্যে 'বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি' নেই, বরং আছে 'ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস'। বুদ্ধদেব বসু কৃত আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। মনে হয় তিনি অনেকটা নিজের বিরুদ্ধে গিয়ে ওই উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদা তিনি বাংলা কবিতায় আধুনিকবাদকে আবাহন করতে গিয়ে কবিতার যে অন্বিষ্ট স্থির করেছিলেন, তাতে প্রাধান্য ছিল নন্দনবাদিতার, কবির আত্মতার সগর্ব প্রতিষ্ঠা এবং কবিতাকে সমাজপ্রসঙ্গ, নৈতিকতা ও উপযোগিতাবাদ থেকে মুক্ত করে আনন্দের সাহিত্যের আয়োজন। সেখানে 'বিদ্রোহের, প্রতিবাদের' কোনো স্থান ছিল না। বুদ্ধদেবের কবিতায় 'সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের' চিহ্ন নেই; প্রেমের অসংবৃত উচ্ছ্বাসে আবিল তাঁর প্রথম যৌবনের কবিতা।আর তাই বুদ্ধদেব যখন আধুনিক বাংলা কবিতা সংগ্রহ সম্পাদনা করছিলেন, তিনি নিজেকে আবিস্কার করেন এক বিপুল আয়রনির মধ্যে। তাঁর নিজস্ব আধুনিকতার ধারণার সঙ্গে তাঁর সহযাত্রী-অনুগামীদের মিল নেই এবং তাঁর অহংনির্ভর কলাকৈবল্যবাদ কোনো পরিসর পায়নি বাংলা আধুনিক কবিতায়। ওই সংকলনটির সম্পাদনা বুদ্ধদেব বসুর কৃতিত্বের একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হলেও এক অর্থে তাঁর নিজের কাব্য-বঃযড়ং-এর মর্মান্তিক পরাজয়ের স্মারকও বটে। নাহলে, কিমাশ্চর্যম, তিনি জসীমউদ্দীনের কবিতাকেও তাঁর সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেছেন !তিনি বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখছিলেন যে, আধুনিক বাংলা কবিতা তাঁর প্রকল্পিত অতি-নান্দনিকতার পথে মোটেই এগোয়নি, বরং বহু বিরুদ্ধপ্রবণতার প্রবল সংঘাতে ও মিথস্ক্রিয়ায় এক আশ্চর্য জটিল রসায়ন হয়ে উঠেছে-যার অংশভাগ হওয়ার সাধ্য তাঁর

আর ততদিনে অবশিষ্ট নেই।বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতাকে ও সেই সঙ্গে আধুনিক কবিদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছিলেন, এ রকম একটি সযত্নরচিত মিথ প্রবল হয়েছে দীপ্তি ত্রিপাঠীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর। একথা অনস্বীকার্য যে, বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবি ও কবিতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর রচনাবলির বিশালত্ব ও বৈচিত্র্যও তাঁর বিরাট প্রতিভার স্বাক্ষর। কিন্তু সেইজন্য তাঁকে তিরিশের আধুনিক কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা যায় না। তাঁর নিজের কবিতায় আধুনিকবাদের যে রূপটি তিনি ধারণ করেছেন, সেটি তিরিশের অন্য কবিদের থেকে আলাদা। আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রার্থিতও বটে, কিন্তু যে ব্যাপারটি বিস্ময়কর সেটি হলো, অন্য সব কবির কাব্যাদর্শ, ভাষা ও আঙ্গিক ক্রমবিবর্তমান হলেও এবং শৈল্পিক পরিণতির দিকে অগ্রসরমাণ হলেও বুদ্ধদেবকে মনে হয় এক জায়গায় স্থির, তাঁর কোনো বিবর্তন নেই। একই প্রগলভ উচ্ছ্বাস বন্দীর বন্দনা থেকে মরচে পড়া পেরেকের গান পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত মানসিক দ্বন্দ্ব যা আধুনিক কবিতার একটি মৌল লক্ষণ। জীবন ও ভালোবাসার অদ্বৈতে বিশ্বাসী বুদ্ধদেব বসু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছেন শরীরী প্রেমের কবি। নারী ও ধ্বনিকে তাঁর এক মনে হয়েছে সারা জীবন। কিন্তু জীবন মানেই নারী অথবা নারীর প্রেম-এটি একটি বিষম সমীকরণ, একটি একদেশদর্শিতা। জীবনের আরও বহুতল আছে, আছে মানুষের নানাবিধ আস্তিত্বিক-সামাজিক সংকট। তিরিশের অন্য কবিরা, এমনকি সুধীন্দ্রনাথের মতো নিবিষ্ট প্রেমের কবিও সেইসব প্রস্তাবনাকে কবিতায় ঠাঁই দিয়েছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর বেলা অবেলা কালবেলা ও সাতটি তারার তিমির পর্যায়ে মহাপৃথিবী ও মহাকালের অনুধ্যান করেছেন। বুদ্ধদেব বসু প্রেমের কবিই থেকে গেছেন আজীবন-ব্যাপারটি এক অর্থে সংবর্ধনাযোগ্য হলেও সামূহিক বিচারে মনে হয় বুদ্ধদেবের মতো বিরলপ্রতিভ মানুষের জন্য এক বিরাট অপচয় এবং বাংলা কবিতার ক্ষতি। এর একটি কারণ, প্রেমের কবিতাতে তিনি নতুন কোনো মাত্রা যোগ করতে পারেননি, আনতে পারেননি এমন কোনো সুর যা আমরা রবীন্দ্রনাথে শুনিনি, কেবল রিরংসা ও দেহবাদিতার ফ্রয়েডবাহিত অনুষঙ্গটি ছাড়া। অবশ্য সেটিও কল্লোলের কবিকুল তথা মোহিতলালের কবিতায়

প্রবলভাবেই মূর্ত হয়েছিল। এলিয়টপ্রেমী বুদ্ধদেব তাঁর গুরুর কাছাকাছিও আসতে পারেননি আধুনিক চৈতন্যের দ্বিধাসংকট চিত্রায়ণে :এলিয়টের কবিতা যে দ্বিধার করাতে দ্বিখন্ডিত, যে ক্ষণিক উৎসাহ এবং পরক্ষণের অনিবার্য নির্বেদ ও নৈরাশ্যের কাঁটায় 'কলে-পড়া জন্তুর মতো অসহায়' মোচড়ায় সে তা বুদ্ধদেবের প্রেমিক-কথকের চিন্তার বাইরে। এমনকি জীবনানন্দের লোকেন বোসও সময়ের দ্বিরাচারে দীর্ণ :'সুজাতাকে ভালবাসতাম আমি/-এখনো কি ভালবাসি?/সেটা অবসরে ভাববার কথা/অবসর তবু নেই/...সে-ও কি আমায়-সুজাতা আমায় ভালোবেসে ফেলেছিলো?/আজো ভালোবাসে না কি?/ইলেক্ট্রনেরা নিজ দোষগুণে বলয়িত হ'য়ে রবে;/কোনো অন্তিম ক্ষালিত আকাশে এর উত্তর হবে?' কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রেমিকের মনে এ রকম কোনো 'overwhelming questions" উত্থিত হয় না; তাঁর নির্দ্বিধ স্বস্তিবোধ আধুনিক মানসতার সুচক মনে হয় না, মনে হয় যেন এক প্রশ্নহীন কিশোরসুলভ মুগ্ধবোধের উচ্চারণ :'কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;...তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,/ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।/গাড়ি চ'লে গেলো- !কী ভালো তোমাকে বাসি, কেমন ক'রে বলি।' ('চিল্কায় সকাল') সারা জীবনের কাব্যসাধনাকে তিনি যথার্থই এবং সততার সঙ্গে, বর্ণনা করেছেন এভাবে :'যা কিছু লিখেছি আমি-হোক যৌবনের স্তব, অন্ধ জৈব/আনন্দের বন্দনা হোক না/-যা-কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা,/...আজ যদি ভাবি মনে হয় /নারীরে, বাণীরে এক মনে হয়।/মনে হয় আমার তনুর তন্তুর সীবনে/যে-কবিতার ভালোবাসা ছিলো, তারই শ্বেত শিখার পদ্মেরে/ফুটিয়েছি মনে মনে নারীরে মৃণাল ক'রে;' ('মৃত্যুর পরে : জন্মের আগে', শীতের প্রার্থনা :বসন্তের উত্তর(অনেক সমালোচকই এমন প্রেমসর্বস্ব বুদ্ধদেব বসুকে ছেড়ে কথা বলেননি। একজনের মূল্যায়ন এমন :'(বুদ্ধদেব বসুর (নারী-চেতনাও মুখ্যতঃ প্রেম-নির্ভর, এবং সে-প্রেমও আবার সর্বাত্মক যৌনতা-নির্ভর।...কিন্তু প্রেম ছাড়া জগতের আর কিছু সম্পর্কে অন্ধতা, কিংবা নারীর পরিচয় একমাত্র প্রেমে, এবং প্রেমের পরিচয় একমাত্র যৌনতায় লুটোপুটি খাওয়ায়, একি আধুনিক মনের জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি? বুদ্ধদেব অত্যন্ত শক্তিশালী কবি, তাঁর কবিতা কবিত্বের দিক দিয়ে

অতুলনীয়ভাবে সার্থক; তাঁর চিত্রকল্প, শব্দসম্ভার, অনুপ্রাস, অলঙ্কার, কাব্যরীতি মৌলিক, আত্মপ্রতিষ্ঠ, অভিনব, অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমপ্রজ্ঞার পরিচায়ক। কিন্তু সব সত্ত্বেও জীবনের আরও বিভিন্ন দিকের বিচিত্র লীলা ও বিবিধ প্রকাশকে উপেক্ষা করা-এ কি আধুনিক সচেতন নিরাসক্ত মানসের পরিচয়বহ?'-(বারীন্দ্র বসু, কবিতা আধুনিকতা ও আধুনিক কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা(১৯৮৭, পৃ :৭৯-৮০) কৌতুকের ও স্বস্তির ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বুদ্ধদেবের কবিতা তখনই শাণিত ও আধুনিক মননস্পর্শী হয়েছে, যখন তিনি প্রেম ছাড়া অন্য বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁর স্মরণীয় কবিতা 'মাছধরা' 'রূপান্তর' শিল্পীর উত্তর' ইত্যাদির বিষয় প্রেম-রিরংসার বাইরে।বস্তুত, বুদ্ধদেব বসু তাঁর লেখালেখি ও পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে এবং তাঁর প্রবাদপ্রতিম শিষ্যায়ন ক্ষমতার মাধ্যমে আধুনিক কবিদের যেমন প্রতিষ্ঠ করেছেন, তারচেয়ে অনেক বেশি করতে চেয়েছেন নিজের কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠা, যে কাব্যাদর্শ মডার্নিজমের একটি বিশেষ, সংকুচিত রূপ। তাঁর সমস্ত কাব্যকর্মে অমোচনীয় লেগে আছে তাঁর অনড় নান্দনিকতত্ত্ব। তিনি যে আনন্দবাদী সাহিত্যের সাধনা করেছেন, সেখান থেকে সমাজ-সংসার প্রায় নির্বাসিত-শুধু জেগে আছে তাঁর প্রবলপ্রতাপান্বিত একমেবাদ্বিতীয়ম অহং। ভাবনাকে এতটা তুঙ্গে নিয়ে যাওয়া একমাত্র বুদ্ধদেবের মতো পাশ্চাত্যকলাভাবিত, পড়ুয়া, বিচ্ছিন্ন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাঁর এই ব্যক্তিগত, গবাক্ষহীন ঘরে ('প্রান্তরে কিছুই নেই, জানালায় পর্দা টেনে দে') শুধু তাঁর প্রিয়তমা কঙ্কার অধিবাস, যেখানে আসঙ্গপিপাসু-রূপবুভুক্ষু একজন ডেকাডেন্ট তাঁর হাতের তালুতে নিয়ে আঘ্রাণ করেন ইন্দ্রিয়ঘনত্বের সুগন্ধি। 'আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয় ব্রত,/সংঘহীন সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি/-স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।' ('উৎসর্গপত্র', দময়ন্তী) সংঘহীন একাকীত্বের আদিম জ্যামিতি জীবনানন্দেরও অনুধ্যেয় ছিল, কিন্তু জীবনানন্দের কথিত 'নির্জনতা'র সঙ্গে বুদ্ধদেবের আত্মপসারণের পার্থক্য রয়েছে। জীবনানন্দ নিজের স্বভাবদোষে আলাদা হয়েছেন; তাঁর আত্মমুখিনতা তাঁর স্বভাবজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। বুদ্ধদেব শিষ্যপরিবেষ্টিত, নবসাহিত্যান্দোলনের বৈতালিক বুদ্ধদেব বসু, সচেতনভাবে, কৌশল হিসেবে বেছে নিলেন, অন্তত কবিতায়, সমাজরিক্ততার, অমঘ আত্মতার পথ।

তাঁর ‘রাত তিনটের সনেট :১’-এর উদ্ধৃতি দিই। কবির প্রশ্ন, ‘যীশু কি পরোপকারী ছিলেন, তোমরা ভাবো? না কি বুদ্ধ কোনো সমিতির/মাননীয় বাচাল, পরিশ্রমী, অশীতির/মোহগ্রস্ত সভাপতি?’ সুতরাং কবির পরামর্শ, ‘জগতেরে ছেড়ে দাও, যাক সে যেখানে যাবে;/হও ক্ষীণ, অলক্ষ্য, দুর্গম, আর পুলকে বধির।/যে-সব খবর নিয়ে সেবকেরা উৎসাহে অধীর,/আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে তার ঢের বেশি পাবে।’ বিশুদ্ধ আনন্দের পূজারি বুদ্ধদেব ‘পুলকে বধির’ ছিলেন, কালের সমূহ কলাপ কিংবা ক্রন্দন তাঁর কানে পৌঁছায়নি; তিনি থেকে গেছেন নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ রূপসাধক। তবে কালের কৃপাণের সামনে প্রবলপ্রতাপী সম্রাটকেও দাঁড়াতে হয়। বুদ্ধদেব বসুকে কেন যেন মনে হয় আত্মবিশ্বাসহীন ও সশঙ্ক-অন্তত আধুনিক বাংলা কবিতার ভুমিকায় তাঁর দ্বিধাদীর্ণ দোলাচল আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে না।কবি বুদ্ধদেব বসু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, তার কবিতা থেকে ছন্দ উঠিয়ে নিলে তাতে আর কবিতা থাকে না। খুব কম বয়সে পড়া এই সমালোচনায় আমার মুগ্ধ হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কবিতা গদ্যেও হতে পারে আবার পদ্যেও হতে পারে- এই বোধ জাগ্রত না হলে প্রকৃত কবিতা লেখা মুশকিল। আমরা দেখি অনেক কবিনামধারী কবির কবিতায় টান টান ছন্দের মধ্যে অকবিতার উল্লম্ফন, যা আমাকে প্রায়শ ব্যথিত করে এবং এইসব কবি পুরস্কার-টুরস্কারও পেয়ে গেছেন নানা জায়গা থেকে। আমাদের বৃহৎ কবিতাঙ্গনে এই ধরনের কবির সংখ্যাই বেশি যারা ছন্দে কিংবা অছন্দে যা কিছু লিখছেন তাতে যৎসামান্যই কবিতা থাকে। অথচ, মিডিয়া কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের আনুকুল্যে রাতারাতি কবির তকমা লাগিয়ে পুরস্কারও বাগিয়ে নিচ্ছেন সেইসব কবি। সেইক্ষেত্রে এটিই বাস্তবতা যে প্রকৃত কবিরা আড়ালেই থেকে যাচ্ছেন যা আমাদের সামগ্রিক কাব্যচর্চার পথকে বাধাগ্রস্ত করছে অনেকখানি। সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও হরহামেশাই এরকম ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বস্তনিষ্ঠ সাহিত্য সমালোনার ক্ষেত্র তৈরি না হলে সৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথও এগোয় না, যদিও একথা সত্য যে প্রকৃত কবি-শিল্পীরা একসময় মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। একসময় তাকে আটকাবার কেউ থাকে না, আর

মিডিওকাররা ঢেকে যায় অবলুপ্তির আঁধারে। এইসব সত্য মেনে নিয়েও বলা জরুরি যে সাহিত্য সমালোচনার একটি আলোকিত পথ তৈরি ছাড়া কোনো দেশের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয় না, তা কসমোপলিটন হয়ে উঠতেও পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়।এলিয়ট তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, পাউন্ড-এর মতো মানুষ যখন কবিতা নিয়ে কোন সমালোচনা লিখে, তখন নতুন কোনো কবিতার দ্বার খুলে যায়। পাউন্ড-এর প্রতি এলিয়টের ছিলো অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং কবিতা পাগল এই প্রতিভাধর মানুষটিকে তিনি ভালোভাবেই চিনতেন। এর কয়েক বছরের মধ্যেই একের পর এক তার অনেকগুলো গদ্যলেখা বেরুতে থাকে, যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, The letters of Ezra Pound (১৯০৭-১৯৪১) প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে, Literary Essays ১৯৫৪ এবং '৭৩ সালে এবং এসময়ে আরও প্রকাশিত হয় Selected Prose (১৯০৯-১৯৬৫); কবিতা ও শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক লেখার তোড়ে সে সময়ে ক্রমাগত তার ভক্ত ও শিষ্যের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কবিতা বিষয়ে তার বিশ্লেষণী মতামত ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিলো আমেরিকা ও ইউরোপে; এমনকি ব্ল্যাক মাউন্টেন মুভমেন্টও তারই লেখা থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছিলো বলে অনেকের ধারণা। কবিতা বা কোনো শিল্পই শূন্য থেকে হয় না। একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বা কোনো নির্দিষ্ট ভূখন্ডের একই সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিহাসই শিল্পে-সাহিত্যে উঠে আসে যা হয়ে যায় শেষে সার্বজনীন, যা ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বা দেশের মানুষকেও আন্দোলিত করে; কারণ, মানুষের কিছু কিছু বোধ-ইচ্ছা-চাওয়া-পাওয়া সর্বক্ষেত্রেই একই এবং একই মাপে পরিমাপিত।এজরা পাউন্ডের মতে, 'literature does not exist in a vacuum. Writers as such have a definite social Function exactly proportionated to their ability as writers.' এবং সেই ক্ষেত্রে আজকে এটি একটি মীমাংসিত প্রশ্ন: শিল্প আসলে শিল্পের জন্য না জীবনের জন্য। শিল্পের জন্য যে শিল্প সে শিল্পেও রয়েছে জীবন- জীবন বাদে কোনো শিল্প কোনো ইতিহাস, কোনো দর্শন কিংবা কোনো বিজ্ঞান বা নৃতত্ত্ব কোনো কিছুই সম্ভব নয়। যেভাবে চরম হতাশাবাদী, নাস্তিক শিল্পীর মধ্যেও দানা বেঁধে থাকে আশা বা

আন্তিকতার মৌল উপাদানসমূহ, তেমনি কলাকৈবল্যবাদীদের মধ্যেও থাকে জীবনের অন্যরকম ফল্গুধারা, যা খুঁজে নিতে হয় একটু কষ্ট স্বীকার করে।

পাউন্ড-এর মতো অতোটা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব না দিতে পারলেও একথা অনস্বীকার্য যে, বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বাংলা কবিতার উন্নয়নে অনেকখানি শিক্ষকের দায়িত্বই পালন করেছিলেন, যদিও তিনি নিজে খুব বেশি ভালো কবিতা লিখতে পারেন নি। পাউন্ড যেমন এলিয়টকে, তেমনি বুদ্ধদেব বসু জীবনানান্দ দাশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে 'খাঁটি আধুনিক' বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সর্বাগ্রে, যখন কেউই বলতে গেলে তার কবিতা নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ দেখায় নি।

উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব বসু ইমেজিস্ট আন্দোলনের ম্যানিফেস্টো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আধুনিক বাংলা কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তা প্রচারও করেছিলেন। বলতে গেলে ইমেজিস্ট আন্দোলন বিশ্বকবিতার আধুনিক পর্বে এক বৈপ্লবিক ভূমিকা রেখেছিলো এবং এ কৃতিত্বের প্রধানা দাবিদার কবি এজরা পাউন্ড নিঃসন্দেহে। বাংলা কবিতার তিরিশি আধুনিকবাদী আন্দোলনকে বুদ্ধদেব পৃষ্ঠপোষকতায়, পৌরহিত্যে এবং আত্যন্তিক দরদে যেভাবে একটি স্তম্ভের ওপর দাঁড় করিয়ে তাকে লালন করেছেন শুধু সেই কারণেও (তার অন্য সব সাহিত্যকৃতি বাদ দিলেও) তিনি আমাদের সাহিত্য-কাননে একটি কূজন-মুখরিত বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকবেন অনেক কাল। বাংলা সাহিত্যের রথি-মহারথিদের নিয়ে তার আলোচনা-সমালোচনা আমাদের চেতনার রুদ্ধদ্বারই কেবল খুলে দেয়নি, আমাদের চোখের সামনে উন্মোচন করেছে অনেক অদেখা-অজানা প্রান্তরের আলোকিত ছবি যা আমরা দেখেছি আর মুগ্ধ হয়েছি।

জেনে কিংবা না জেনে, পড়ে কিংবা না পড়ে মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে আমাদের একটি বড় রকমের কৌতূহল রয়েছে। এবং একথা মানতেই হয় যে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বড় মাপের প্রতিভা। কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তার মহাকবিকৃতি নিয়ে নেতিবাচক সমালোচনা করেন তখন আমাদের আজন্ম বিশ্বাসের সুতোটি ছিঁড়ে যায়, আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই। মাইকেল নিয়ে বুদ্ধদেবের আলোচনা অনেকেরই অপছন্দ, তবু যখন বুদ্ধদেব বসু বলেন তখন একটু সোজা হয়েই বসা লাগে, বসতে হয়। সাহিত্যে

কিংবা ইতিহাসে কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্যারিশমায় একটি বিশাল ইমেজ নিয়ে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে যান এবং যুগপরম্পরায় সেই ইমেজটি একটি ব্যাপ্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটি নিয়ে পরে আর কেউ মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করে না। মাইকেলকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু যে আলোচনা করেছেন তা আমরা সবটুকু মেনে না নিয়েও এই আলোচনায় একধরনের আনন্দ পাই, কারণ এটি এমন একটি আলোচনা যার মধ্যে প্রথাগত বিশ্বাসকে ভাঙা হয়েছে এবং এটি একটি নতুন ডিসকোর্স হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত এবং বিশাল পান্ডিত্যের অধিকারী না হলে, পঠন-পাঠনের বিস্তৃতি সাবলীল না হলে এই ধরনের সাহস দেখানো দুরূহই বটে। বুদ্ধদেব লিখেছেন- "যদিও পন্ডিতেরা পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর ঠোঁট বেঁকিয়েছিলেন, তবু সমসাময়িক পাঠক সমাজে মাইকেলের আধিপত্য সূচিত হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হবার আগেই। আর তার পর থেকে আজ প্রায় একশো বছর ধরে আমরা অবিশ্রান্ত শুনে আসছি যে মাইকেল মহাকবি, বাংলা সাহিত্যের ত্রাতা, এবং বাংলা কাব্যের মুক্তিদাতা। তাঁর ঘটনাবহুল নাটকীয় জীবন, ও সেই জীবনের শোকাবহ সমাপ্তি তার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করেছে; এই সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে পুনরুজ্জীবিত মাইকেলের যে-ছবি ফুটেছে তার দিকে ভালো করে তাকালে এ-কথা মনে না-করে পারা যায় না যে বাঙালি আসলে তার কবিকর্ম সম্বন্ধে ততটা উৎসাহী নয়, যতটা তার জীবনীর অসামান্য চিত্রলতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসী। সত্যি বলতে, মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তি, দুর্মরতম কুসংস্কার। কর্মফল তাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে সেই ভুল স্বর্গে, যেখানে মহত্ত্ব নিতান্তই ধরে নেওয়া হয়, পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। এ-অবস্থা কবির পক্ষে সুখের নয়, পাঠকের পক্ষে মারাত্মক। আধুনিক বাঙালি পাঠক মাইকেলের রচনাবলি পড়ে এ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য যে তাঁর নাটকাবলি অপাঠ্য এবং যে-কোনো শ্রেণীর রঙ্গালয়ে অভিনয়ের অযোগ্য, মেঘনাদ বধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলি বাগাড়ম্বর মাত্র, এমনকি তার শ্রেষ্ঠ রচনা বীরঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। ভাবতে অবাক লাগে যে মাইকেলের ইংরেজি পত্রাবলিতে প্রাণশক্তির যে

প্রাচুর্য দেখি, তার সংক্রমণ প্রহসন দুটিতে ছাড়া আর-কোনো রচনাতে নেই- এবং প্রহসন দুটিও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটক নয়, নবিশের কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। কিন্তু এ-সব কথা মুখ ফুটে কেউ কি কখনো বলেছে?"

রবীন্দ্রনাথ মাত্র ২১ বছর বয়সে মাইকেলকে নিয়ে যে সমালোচনা লিখেছিলেন বুদ্ধদেব তাতে আস্থা রেখে বলতে চেয়েছেন, এর ২৫ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে যে সমালোচনা লিখলেন মাইকেলকে নিয়ে তা গতানুতিক বিশ্বাসকে মেনে নেওয়া। বুদ্ধদেবের ভাষায়, 'অগ্রজ নিন্দার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা'। এই মেনে নেওয়াতে বুদ্ধদেবের যে আপত্তি তা তিনি ব্যাখ্যাও করেছেন। তিনি লিখেছেন-

"রবীন্দ্রনাথ কি নিজেই জানতেন না যে তার এই মন্তব্যে যাথার্থ্য নেই, আছে শুধু চলতি মতের পুনরুক্তি? মাইকেল সম্বন্ধে যে কটি মতবাদ বাঙালীর মনে বদ্ধমূল, তার মধ্যে এটাই প্রধান যে বাংলা সাহিত্যের ঝিমিয়ে পড়া ধমনীতে পাশ্চাত্ত্য রক্তসঞ্চার করে তাকে উজ্জীবিত করেন তিনিই প্রথম। সত্যই যদি তাই হতো তাহলে মাইকেলের অনতি পরে, এবং তারই প্রভাবে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উৎস খুলে যেতো, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষায় বসে থাকতো না।" বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে বলেছেন, আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব শূন্য। তিনি রাখঢাক না করেই বলেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাব মাইকেল আনতে পারেননি, এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।'

রবীন্দ্রনাথের পরে বুদ্ধদেব বসুই প্রথম ব্যক্তি যিনি আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার একটি পথ তৈরি করে দেন এবং সেই পথে সাহিত্য সমালোচনার একটি বস্তুনিষ্ঠ ধারা বিকশিত হওয়া সম্ভাবিত ছিল, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে তা হয়নি, তার মতো করে ঘাড় সোজা করে, সমৃদ্ধ মননের সাহসে কেউ এগিয়ে আসেন নি আর। কোনো দেশের সমালোচনা সাহিত্য সমৃদ্ধ না হলে সেই দেশের শিল্প-সাহিত্যের মানও উঁচুতে ওঠে না। সমালোচনা সাহিত্যের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে না দেখলে আমরা আমাদের সাহিত্য নিয়ে একটি গোলমেলে অবস্থার মধ্যে থেকে যেতে বাধ্য হবো। সৎ সমালোচনা সাহিত্য ছাড়া সৎ সাহিত্য সৃষ্টির পরিবেশও সৃষ্টি হয় না।

জীবনের প্রথম পর্বে ‘দময়ন্তী’ এবং ‘পদধ্বনি’ কবিতার মাধ্যমে আধুনিক কবিতার সানন্দ দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। তিরিশের দশকে, সে সময়ের কবিতা আন্দোলনে তিনি যে প্রধান পুরোহিত ছিলেন, সে কথা যেমন সত্যি, তেমনি নিজের নানাবিধ কর্মযজ্ঞ, মেধা ও মননের সমন্বয়ে আধুনিক কবিতার ঘরগেরস্তিকে যে আত্যন্তিক দরদে সাজালেন, তা আমাদের বারবার স্মরণ না করে উপায় নেই। তার মধ্যে ছিল অপরিসীম লিডারশিপের কোয়ালিটি, যে কারণে রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে নতুন কবিতা লেখার আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। শুধু কবিতা নিয়ে, আধুনিক কবিতা নিয়ে তার ভাবনা ও শ্রম, তার অভিভাবকত্ব কিংবা শিক্ষকতা আমাদের কাছে তাকে বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছে। বাংলা আধুনিক কবিতার বিকাশে ‘কবিতা’ পত্রিকাটি ছিল তার সকল স্বপ্নের উৎস। এবিষয়ে ‘সাহিত্যপত্র’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

“সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র কবিতার উপর এই জোর দেবার প্রয়োজন ছিলো, নয়তো সেই উঁচু জায়গাটি পাওয়া যেত না, সেখান থেকে উপেক্ষিতা কাব্যকলা লোকচক্ষের গোচর হতে পারে। ‘কবিতা’ যখন যাত্রা করেছিলো, সেই সময়কার সঙ্গে আজকের দিনের তুলনা করলে, একথা মানতেই হয় যে, কবিতা নামক একটি পদার্থের অস্তিত্বের বিষয়ে পাঠকসমাজ অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন, সম্পাদকরাও একটু বেশি অবহিত- এমনকি সে এতদূর জাতে উঠেছে যে, কবিতার জন্য অর্থমূল্যও আজকের দিনে কল্পনার অতীত হয়ে নেই।”

উক্ত প্রবন্ধ থেকে আমরা জানতে পারি লিটল ম্যাগাজিন নামটি প্রথম শোনা গেছে মার্কিন দেশে। এই প্রবন্ধে তিনি লিটল ম্যাগাজিনের চারিত্র্য-স্বরূপের একটি অনন্য রেখাচিত্র অঙ্কিত করেছেন। এত সাবলীল ভাষায়, সহজ অথচ ন্যায্যতাকে যা গ্রাহ্য করে সে রকম যুক্তিতে তিনি যেভাবে লিটল ম্যাগাজিনের শক্তি ও ব্যাপকতা নিয়ে কথা বললেন তা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। তার বলার ভঙ্গিটা তার ভাষার মধ্যে যেভাবে খেলে যায় তা আমাদের শুধু চমৎকৃতই করে না ভাষা শিক্ষারও এক তাৎক্ষণিক অথচ চিরন্তন পাঠশালার কাছে টেনে নিয়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসুকে একাকীই দাঁড়াতে হয়েছিল বিরুদ্ধ স্রোতে। ‘শনিবারের চিঠি’র সজনীকান্তরা যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ এবং অশালীন মন্তব্য লিখতেন বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য নিয়ে তা যেমন আমরা জানি, পাশাপাশি আমরা এও জানি যে, সতীর্থ কবি বিষ্ণু দে পর্যন্ত কোনো-না-কোনো সময়ে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা করতে ছাড়েননি। বুদ্ধদেব বসুর ঔদার্য এইখানে যে, তিনি তার সতীর্থ কবি কিংবা সমসাময়িক লেখকদের অনেকেরই বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করেছেন এবং অনেককেই উচ্চকিত করেছেন, যা আগে কেউ করেনি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে’র কবিতা নিয়ে তিনি পজিটিভ মতামত রেখেছেন। জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তিনি খুবই উচ্ছ্বসিত ছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দ দাশকে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে মনে করেননি। এমনকি তার কবিতা তিনি ‘পরিচয়’ পত্রিকায় না ছেপে ফিরিয়েও দিয়েছেন। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু তার কবিতা শুধু ছাপেনইনি, তার কবিতার মৌলিক ও ব্যতিক্রম প্রয়াসকে তিনি চিহ্নিত করে দেখিয়ে দিলেন জীবনানন্দ দাশ সত্যিকারের আধুনিক কবি ‘খাঁটি বাঙালি কবি’। বুদ্ধদেবের সে সময়ের মূল্যায়ন জীবনানন্দ দাশকে কবি হিসেবে বৃহত্তর পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়েছিল। বুদ্ধদেবের মূল্যায়ন ছাড়া কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে জীবনানন্দ দাশকে হয়তো আরো অনেককাল অপেক্ষা করতে হতো। কারণ, তিনি কবিতার যে নতুন পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তা গড় কবিতা পাঠকদের কাছে ছিল অনেকখানিই অচেনা। জীবনানন্দ দাশের কবিতার প্রতি, মানুষ জীবনানন্দের প্রতি তার যে ভালবাসার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল, তা আমরা তার এই মন্তব্য থেকে বুঝে নিতে পারি -

...“এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যে ছিলেন জীবনানন্দ, তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হতো নিজের বিষয়ে মন্তব্য পড়েও তেমন হতো না; যেহেতু তার কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হতো তার বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য।”

প্রকৃত কবিতার ডাইনামিজম-এর কথাটি যেমন আমাদের মনে রাখা দরকার, তেমনি একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রেণীকক্ষগুলোতে ছাত্রদের কবিতা বোঝানোর জন্য যে বক্তৃতা দেওয়া হয় অথবা যে নোট বই পড়ে ছাত্ররা কবিতা বোঝে, তা কেবল পরীক্ষা পাস করার সহায়ক, এতে বরং কবিতার ব্যাপকতাকে খাটো করে দেওয়া হয়। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের কবিতাটিকে আলাদা করে ভাববার কোনো অবকাশই থাকে না। ফলে কবিতাকে টেক্সট হিসেবে পাঠের বিষয়টি ব্যাহত হয়। কবিতার অর্থকে বুদ্ধদেব বসু একটি বেগ বা গতির বেগ বলতে চেয়েছেন। তার মতে-

"কবিতার অর্থ কৌটোর মধ্যে মুক্তোর মতো একটি নিশ্চল ও নির্দিষ্ট পদার্থ নয়, তা একটা বেগ, গতির বেগ, যা শব্দগুলোকে দূরে কাছে নিশেনের মতো উড়িয়ে দেয়, যাদের ইশারায় মন তার শক্তি ও শিক্ষা অনুসারে দূর থেকে দূরতরের দিকে চলতে থাকে।"'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসুকে বলতে দেখি-

"তিনি যে একজন খুব বড়ো কবি তা আমরা আগেই জেনে গিয়েছি, কিন্তু যে কথা আজও আমরা ভালো করে জানি না- কিংবা বুঝি না- সেকথা এই যে বাংলাদেশের পক্ষে বড্ড বেশি বড়ো তিনি, আমাদের মনের মাপজোকের মধ্যে কুলোয় না তাঁকে, আমাদের সহ্যশক্তির সীমা তিনি ছাড়িয়ে যান।"

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বুদ্ধদেব বসু আরো লিখেছেন:

"রবীন্দ্রনাথ ও ইয়েটসের বাইরে আমি এমন কবিতা অল্পই জানি, যা দেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ, অথচ যাতে ভাবালুতা বা জাতীয়তাবাদী ঔদ্ধত্যের চিহ্নমাত্র নেই, এবং যা কবিতা হিশেবেও মান্য ও তৃপ্তিকর। রবীন্দ্রনাথের যা বিশেষ লক্ষণ, যার জন্যে অন্য কোনো দেশপ্রেমিক বাঙালি কবি তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারেন না, তা এই যে তিনি স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বকে এক করে দেখেছিলেন।"

বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বিশ শতকের ভাবনার কবি-শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একটা বিশেষ সময়ে এবং তার কঙ্কাবতী কাব্যে সে-প্রভাবের কথা বুদ্ধদেব বসু স্বীকারও করেছেন-

“আমাদের পাঠক্রমে প্রধান কবি আলফ্রেড টেনিসন- তাঁর মরুপ্রতিম নাটকগুলোও ডিঙোতে হয়েছিল আমাকে- কিন্তু আমাকে আঁকড়ে ধরেছিলেন ব্রাউনিং তাঁর এবড়োখেবড়ো ছন্দ আর ইতালির গালগল্প নিয়ে, একটি উন্মাদনা ছিলেন সুইনবার্ন, একটি প্রণয় গোষ্ঠী- এবং চিত্রকলায় আমার প্রথম প্রবেশের সরু রাস্তাটিও তারাই। আমার এই তখনকার প্রিয় কবিদের কাছে আমি যে কিছু শিখেওছিলাম, আমার ‘কঙ্কাবতী’ বইটাতে তার নিদর্শন আছে।”

এই কাব্যে তার মৌলিক কবিপ্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে। জীবনানন্দ দাশের মন্তব্য - “সময় ও মৃত্তিকার ভিতর বাসা বেঁধে ‘কঙ্কাবতী’ মৃত্তিকা-ও-সময়োত্তর কাব্য।... বুদ্ধদেব বসুর কবি হৃদয়ের আভার থেকে ‘কঙ্কাবতী’র জন্ম হেয়েছে। বুদ্ধদেব অনেকদিন থেকে কবিতা লিখছেন। কঙ্কাবতী ছাড়া কবিতার বই আগেও আরো প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু এই বইটির ভিতরেও নিহিত রইল তাঁর কবিযশ; এর রস পান করে বুঝতে পারলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান কবি; প্রধানদের ভিতর অন্যতম: তাঁর ‘কঙ্কাবতী’ অবশ্যম্ভাবী পিপাসা জাগিয়ে গভীর পরিতৃপ্তি-কুহক নিয়ে এসেছে।”

ঐ লেখায় তিনি একথাও বলেছেন যে, “বইটির কোনো-কোনো কবিতায় পুনরুক্তি বেশি, কথার অজস্র ডালপালার ভিড়ে আবেগ চাপা পড়ে পাখা মেলতে পারেনি।”

বুদ্ধদেব বসু এমন এক ভাষার চর্চা করেছেন কিংবা তৈরি করেছিলেন যার গতিশীলতা কমনীয়তা এবং লাবণ্য আমাদের মুগ্ধ করে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের জানতে হয় কীভাবে যুক্তিবিন্যাসের সুতোগুলো ছাড়তে হয় নিবিড় স্পন্দনে কিংবা স্পষ্টতায়।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষা নিয়ে শিবনারায়ণ রায়ের মন্তব্য -

...“সাহিত্য বিষয়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তাতে প্রায় সর্বত্রই অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও ভাষার নিপুণতা লক্ষণীয়।... যখন তার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর কথা স্মরণ করি, তার বৈদগ্ধ্য এবং সংবেদনশীলতা, তার দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা এবং যুক্তিবিন্যাসের দৃঢ়তা, তার ভাষার গতিশীলতা এবং লাবণ্য পাঠক হিসেবে আমাকে অভিভূত করে।... তন্বিষ্ঠ সাধনায় তিনি তার গদ্যে একই সঙ্গে সূক্ষ্ম বা জটিল চিন্তা এবং আবেগসঞ্চারী

স্পন্দনময়তার মিলন ঘটিয়েছিলেন এবং ফলে তার গদ্যরীতি গল্পে, উপন্যাসে, রম্যরচনায় ক্রমশই সার্থকতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রবন্ধ- যেখানে যুক্তির বিন্যাস, বিশ্লেষণের তীক্ষ্ণতাও যাথার্থ্য, এবং বক্তব্যের স্পষ্টতা প্রাধান্য পেয়ে থাকে- সেখানেও গদ্যে ওই স্পন্দনময়তার সঞ্চার ঘটানো খুবই সাধনাসাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রেও বুদ্ধদেবের কৃতি প্রায় অপ্রতিম। তার সমসাময়িক অন্য যে সব কবি অথবা কথাসাহিত্যিক সাহিত্য বিষয়ে বাংলা প্রবন্ধ লিখেছেন- সুধীন্দ্র জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে- কেউই এ ক্ষেত্রে তার সন্নিকর্ষে পৌঁছুতে পারেননি।... ইংরেজি অন্বয়ের প্রভাবে তার বাংলা গদ্যে দ্রুতি, বৈচিত্র্য এবং অনুবাক্যের বয়নে জটিল বাকপ্রকাশের সামর্থ্য সঞ্চারিত হয়েছিল।'

সাহিত্য-সমালোচনার যে ধারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, এবং যে আলোকসঞ্চারী মনোভাব, বহুভূজ চিন্তনের ও ব্যাপক পঠন-পাঠনের আলোকে তিনি সে সময়ের মেজর ও মাইনর কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে যে আলোচনা-সমালোচনা লিখেছিলেন, তা আমাদের সামনে আজো অনুসরণীয়। এটা ঠিক যে, তার কোনো কোনো আলোচনা-সমালোচনা হয়তো পরিবর্তিত সময়ের সাথে খাপ খাচ্ছে না- এটা হতেই পারে; কিন্তু তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সাহিত্য-সমালোচনার যে ধারা তৈরি করেছিলেন এবং এখনো যার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের কথা বলতে হয়, সেই দিকটি খুব সহজে ভুলে গেলে চলবে না। তার 'কালের পুতুল' কিংবা 'সাহিত্যচর্চা' আমাদের শিল্পদৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, তার কাছে আমাদের অশেষ ঋণ রয়েছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তিনি যে সুস্থ-সাবলীল-গতিশীল-বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য-সমালোচনার ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, তার বিকশিত ও বিবর্তিত প্রয়াস আজ অনেকখানিই দুর্লক্ষ। তিনি সাহিত্য-সমালোচনার বিষয়টিকে শিল্প করে তুলেছিলেন এবং এই শিক্ষাটি তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি বুদ্ধদেবের ভক্তি, ভালোবাসা এবং চিত্ত-ব্যাকুলতা এতই প্রবল ছিল যে তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন 'আমার কাছে প্রত্যেক আধুনিক বাঙালি লেখকের কাছে- কিন্তু বিশেষ করে আমার কাছে আপনি দেবতার মতো ।' An Acre of Green Grass এ তিনি লিখলেন 'Rabindranath is our Chaucer and

Shakespeare, our Dryden ... Rabindranath is the would most complete writer.'বুদ্ধদেব বসু তার সতীর্থ কবি-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে কখনো কলম ধরেননি। রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত আধুনিক সাহিত্যচর্চায় তিনি যেমন নিজেকে অন্বিষ্ট করেছিলেন, তেমনি আধুনিকতার শত্রুদের সাথেও তাকে লড়তে হয়েছে এবং সেই লড়াই-এ তিনি জয়ীও হয়েছেন। "আমার বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেল, গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা ভাষার কবিতার বিবর্তনে লিপ্ত আছি। স্বকীয় রচনার চেষ্টাতেই আমার তৃপ্তি ছিলো না; আমি অবিরাম যুদ্ধ করেছি আধুনিকতার শত্রুপক্ষের সঙ্গে, আমার সমকালীন কবিদের গুণকীর্তনে আমি ক্লান্তিহীন ছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতায় দেহবাদী চেতনার অভাব বুদ্ধদেব বসু লক্ষ করেছিলেন- তাঁর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের) কবিতায় বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, নেই জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হলো তার জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা করে গেছেন।

১৯৩৮ সালে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

"তোমরা কবিতার নতুন পথ তৈরি করতে লেগে যাও- আমার পথ চলে গেছে কোন বেঠিকানায়।... আশা করি মহাজনী জমে উঠবে এতকালের সমস্ত খাতাপত্র বাতিল করে দিয়ে।

বুদ্ধদেব বসুর বেশকিছু লেখালেখি এবং সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন, এ কথা সর্বজনবিদিত। এটি বুদ্ধদেব বসুও অনুধাবন করেছিলেন। তবে বুদ্ধদেব তাঁকে যেটুকু কষ্ট দিয়েছিলে, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসাও করেছিলেন। 'কবিতা'র 'রবীন্দ্র সংখ্যা' রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ই বের হয়েছিল এবং এ সংখ্যাটি এতই সমৃদ্ধ হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি শুধু গ্রন্থই রচনা করেননি, দেশে-বিদেশে ইংরেজি-বাংলায় অনেকগুলো প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একজন বড় মাপের বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে তুলে ধরেছিলেন। বিশ্বকবিতার আধুনিকায়নের প্রশ্রয়ে বাংলা কবিতার আধুনিকায়নে তার ভূমিকার কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিরিশি কবিরা রবীন্দ্রনাথকে

গুরু মেনেই বিদ্রোহটা করেছিল এবং সেটি আসলে কোনো রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল না। সে সময়ে অনেকেই তাকে রবীন্দ্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছে, তিনি তাতে বিচলিত হননি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাকে কিছুটা ভুল বুঝেছিলেন, যদিও তিনি তার কবিতার প্রশংসা করেছেন এবং তাদের নতুন কাব্যযাত্রাকে উৎসাহিতও করেছেন।

কালিদাসের মেঘদূতের ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার বাইনারি অপোজিশন নিয়ে কথা বলেন একইসাথে প্রাঞ্জল ও দুর্বোধ্য তখন রবীন্দ্রনাথের সত্যিকারের কবিকৃতির খ্যাতিতে যেন আরেকটি পালক সংযোজিত হয়। তিনি বলছেন-

"রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতাবলিতে প্রাঞ্জল হলেও দুর্বোধ্য; 'প্রদীপ নিভে গেল অকারণে' ব্যাকরণের হিসেবে অতিশয় সরল; কিন্তু এর অর্থ কী বা কতখানি আমরা যেন সারা জীবন চিন্তা করেও তার কূল পাবো না।"

'বাংলা ছন্দ' প্রবন্ধে তিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকিত করেছেন-

"সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একবার বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ।' এ-কথা যে কত সত্য তা, যত দিন যাবে ততই গভীরভাবে আমরা উপলব্ধি করবো। শুধু যে সাহিত্যের শিল্পগত আদর্শই রবীন্দ্রনাথের রচনায় মূর্ত হয়েছে তা নয়, শিল্পের উপাদান যে-ভাষা সে-ভাষাও তাঁরই সৃষ্টি।"

বুদ্ধদেব বসু শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন। কোনো বিশেষ ইজম কিংবা গোষ্ঠীবদ্ধতা শিল্পীর পরিসরকে অনেক সময়ই খাটো করে ফেলে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

"আমি বলতে চাই যে, শিল্পী স্বভাবতই ব্রাত্য; কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, কোনো সংঘবদ্ধ মতবাদ গ্রহণ করে সেই মতেই নৈষ্ঠিকতা বাঁচিয়ে চলা- এটা তার প্রকৃতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্য সমস্ত চিন্তার ধারা বর্জন করে তিনি যদি একান্তভাবে একটিমাত্র মতবাদে দীক্ষা নেন- সে-মতবাদের নিজস্ব মূল্য যা-ই হোক না- তাহলে তার দৃষ্টি ব্যাহত হবার, ব্যক্তি সংকুচিত হবার আশঙ্কা থাকে। তাহলে, খুব সম্ভব, তার অভিজ্ঞতাগুলোকে আপন প্রেরণায় সুস্থির এবং সুপক্ক হতে না-দিয়ে, তিনি তাদের

কেটে-ছেঁটে শাস্ত্রের মাপে মিলিয়ে নিতে চাইবেন। ফলত, তার বাণীর লক্ষ্য হবে- সমগ্র মানবাত্মা নয়, নিদিষ্ট একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। শিল্পীর পক্ষে এর মানে বৈকল্য বা বিকৃতি।" বুদ্ধদেব বসু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শিবনারায়ণ রায় জীবনানন্দ দাশের সাথে তাঁর একটি তুলনাও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন:

"এখন পিছন ফিরে চাইলে মনে হয় এই প্রতিভাসমুচ্চয়ের ভেতরে সব চাইতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। সম্প্রতি জীবনানন্দকে নিয়ে দুই বাংলায় যে তুমুল ও ব্যাপক পূজাপার্বণ চলছে, তাতে আমার এই প্রস্তাব বিনা বিচারে নাকচ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। জীবনানন্দের মহত্ত্ব নিয়ে সংশয়ের কোনও কারণ নেই; বস্তুত তাকে একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠাদান বুদ্ধদেবের অন্যতম কীর্তি। জীবনানন্দ খাঁটি কবি ছিলেন; তাঁকে আমি দু'একবার মাত্র দেখেছি; কিন্তু তাঁর রচনা পড়ে আমার মনে হয়েছে যেন তিনি এক নক্ষত্র বিম্বিত জলাশয়, যেখানে গভীর অন্ধকারের স্তরে স্তরে নানা অনুভব ও ভাবনার ওঠাপড়া আছে, কিন্তু কোনো বহমানতা নেই। অপরপক্ষে, বুদ্ধদেব যেন কোনও তুষারাবৃত শৈলশিখর থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি নির্ঝর, ধাপে ধাপে বহমান, ক্রমে নদী এবং তার শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হয়ে মহাসমুদ্রের দিকে নিয়ত প্রবাহী। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেবের মত এত বহুমুখী এবং নিয়ত গতিশীল প্রতিভা আর একটিও দেখতে পাই না।"

প্রতিভার ঔদ্ধত্যে উৎরে-যাওয়া শিল্প-পাগল, নির্মোহ, দরদি মানুষের বড় অভাব আজ আমাদের। এই অভাব কাটিয়ে ওঠাও যে অসম্ভব তাও সত্য নয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ সুস্থ ও ন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে না থাকলে যা-কিছু হবার তা হয়ে ওঠে না- এই সত্যও মেনে নিতে হবে। আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা-সমালোচনা লিখতে শুধু অনীহ-ই নয়, মাঝে মাঝে বালখিল্যতারও পরিচয় দিয়ে থাকে। সাহিত্য সমালোচনা যে হচ্ছে না তা নয়, ভূরি ভূরি হচ্ছে, কিন্তু দায়সারা গোছের এ-সব লেখায় কোনো প্রাণ থাকে না, থাকে না নিরপেক্ষতা কিংবা বস্তুনিষ্ঠতা। এইসব সমালোচনা লেখকদের পান্ডিত্যের ঔরস চুঁইয়ে নেমে পড়ে সাহিত্য সমালোচনার নামে কিছু মৃত ভ্রুণ কিংবা গোবরে পোকার বিনষ্ট

হৃৎপিন্ড, যা দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। মাঝে মাঝে কখনো হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো কলকাতা কিংবা বাংলাদেশের দু-একটি লিটল ম্যাগাজিনে নজর-কাড়ার মতো সাহিত্য সমালোচনা চোখে পড়ে এবং তখন কিছুটা আশাও জাগে যে সুস্থ সাহিত্য সমালোচনার ধারাটি একেবারে মরে য়ায়নি- একে লালন করলে, পুষ্টির যোগান দিলে পুষ্টিহীন এই সাহিত্য-শাবককে মোটা-তাজা করা খুব দুরূহ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের পরে যে বহুমুখী প্রতিভা বাংলা আধুনিক সাহিত্যের শিরায় রক্ত সঞ্চালন করে তাকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি বুদ্ধদেব বসু। খুব সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন বাংলা-সাহিত্যে কার অবস্থান কতখানি এবং সেই মাত্রাটা আজকেও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। কারণ, তিনি যেভাবে যাদের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন সাহিত্য-মূল্যায়নের সেই মাত্রাটি তিনি অর্জন করেছিলেন টোটাল বাংলা সাহিত্যের অগ্র-পশ্চাৎ নিমজ্জনে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসায়নে এবং বিশ্বসাহিত্যের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে। যে নির্মোহ এবং অনেকখানি নিরপেক্ষ মানদন্ড তিনি একটি সাহিত্য-সমালোচনার ধারা তৈরি করেছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তা এগিয়ে নিতে পারিনি। ফলে, এখানে সমালোচনা সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব খুবই দূর্বল ও নানা কলুষতায় ক্লিষ্ট। এই দৈন্যদশা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে এবং এবং সাহিত্য সমালোচনাকে সমালোচনা সাহিত্য হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা আরো শাণিত এবং নিরপেক্ষ করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'শিল্পরচনার আর সমাজরচনার জগৎ সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র'। তিনি শিল্পের অধরাকে খুঁজেছেন ভেতর জগতে। সেই ভেতরের শক্তিতে বাড়াতে হলে যে ঔদার্য ও মহানুভবতার সাঁকোতে দাঁড়িয়ে জীবন ও জগৎকে দেখা দরকার- সেই বাস্তবতার ভেতর থেকেই বুদ্ধদেব বসু শিল্প-সাহিত্যের অরূপ-স্বরূপকে আবিষ্কার করেছেন। আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো তার সাথে একমত নই, কিংবা সময়ের পরিবর্তনে তার সাহিত্য সমালোচনার কোনো কোনো দিক হয়তো কিছুটা ফিকেও হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও, তার পথটিকে সামনে রেখে সাহিত্য সমালোচনার একটি নতুন পথ তৈরি অতোটা কঠিন হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

১১.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

বুদ্ধদেব বসুর জন্ম ১৯০৮ সালে এবং মৃত্যু ১৯৭৮ সালে।

২- বুদ্ধদেব বসুর উল্লেখ যোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি গুলির নাম উল্লেখ কর।

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি কয়েকটি হলো- কবিতা বন্দীর বন্দনা (১৯৩০), কঙ্কাবতী (১৯৩৭), দ্রৌপদীর শাড়ী (১৯৪৮), শীতের প্রার্থনা :বসন্তের উত্তর (১৯৫৫), উপন্যাস লাল মেঘ (১৯৩৪), রাতভর বৃষ্টি (১৯৬৭), পাতাল থেকে আলাপ (১৯৬৭), গোলাপ কেন কালো (১৯৬৮), গল্পগ্রন্থ অভিনয়, অভিনয় নয় (১৯৩০), রেখাচিত্র (১৯৩১), ভাসো আমার ভেলা (১৯৬৩), নাটক তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬), কলকাতার ইলেকট্রা, সত্যসন্ধ (১৯৬৮), প্রবন্ধ কালের পুতুল (১৯৪৬), সাহিত্যচর্চা (১৯৫৪), রবীন্দ্রনাথ :কথাসাহিত্য (১৯৫৫), স্বদেশ ও সংস্কৃতি (১৯৫৭), ভ্রমণ ও স্মৃতিকথা হঠাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫), সব-পেয়েছির দেশে (১৯৪১), জাপানি জার্নাল (১৯৬২), দেশান্তর (১৯৬৬), আমার ছেলেবেলা (১৯৭৩), আমার যৌবন (১৯৭৬), অনুবাদ কালিদাসের মেঘদূত (১৯৫৭), শার্ল বোদলেয়ার :তাঁর কবিতা (১৯৬০), রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা (১৯৭০) ইত্যাদি।

১১.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- সাহিত্যিক হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর অবদান আলোচনা কর।

২- একজন ফ্যাসিবাদী সাহিত্যিক ও কবি হিসাবে বংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান বর্ণনা কর।

১০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

মন্তব্য

কাব্য সাহিত্যের আলোকে,

কারুভাস পত্রিকা,

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দেবেশ কুমার আচার্য্য।

একক-১২ আধুনিক কবি বিষ্ণু দে

বিন্যাস ক্রম

১২.১ মনস্তাতিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে

১২.২ বিষ্ণু দে এর কবিতায় ত্রিশ শতকের আধুনিক বিল্পব

ঘোড়সাওয়ার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত,ও অন্যান্য কবিতার সারমর্ম।

১২.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১২.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১২.১ মনস্তাতিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু দে

বিষ্ণু দে একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রসমালোচক ও শিল্পানুরাগী। ১৯০৯ সালের ১৮ জুলাই কলকাতার পটলডাঙ্গায় তাঁর জন্ম। পিতা অবিনাশচন্দ্র দে ছিলেন অ্যাটর্নি। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে বিষ্ণু দে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ (১৯৩০), সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স এবং (১৯৩২) তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে (১৯৩৪) থেকে ইংরেজিতে এমএ সালে কলকাতার রিপন কলেজে ১৯৩৫অধ্যাপনাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে যোগদান করেন। পরে (১৯৪৪(১৯৪৭-, মৌলানা আজাদ কলেজ ও (১৯৬৯-১৯৪৭) কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন।

কবিতা শেষমেশ ভাষারই খেলা। আধার ও আধেয়কে আকীর্ণ করে এই ভাষাই গড়ে তোলে কবিতা। ‘শব্দের চমৎকারিত্বই কবিতা’ মালার্মের এই উক্তির সাথে কোলরিজ

কথিত 'Best words in the best order' বিষয়েও আমরা জ্ঞাত। এসব নিয়ে অনেক বিতর্কও হতে পারে, এবং হয়েছেও। তবে শেষ পর্যন্ত এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভাষা ও ভাবের সাযুজ্যই কোনো কবিতাকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। কবিতা হলো 'highest form of art' এবং কবিতার চূড়া স্পর্শ না করে কোনো কিছুই মহৎ শিল্প হতে পারে না। কবিতার ক্ষেত্রে শব্দই ব্রহ্ম – একথা মেনে নিয়েই বলা যায় যে, কবিতা শুধু শব্দ নিয়ে খেলা নয়, তারও ঊর্ধ্বে অন্যকিছু। কবিতা কবির নিজস্ব জগতের আলো-আঁধারির খেলা যেমন, তেমনি তার নিভৃত ভূগোলের রক্তক্ষরণের ইতিহাসও বটে। তবে নিজস্ব ভাষিক আয়োজনে নিজেকে প্রকাশের তাগিদে জীবনদর্শনের, অনুভূতির পাঁপড়িগুলো এই যে মেলে ধরা – এ কাজ অতোটা সহজ নয় বলেই অনেক সম্ভাবনাময় কবিকেও আমরা মাঝপথে থেমে যেতে দেখেছি। জীবনের চারপাশের বস্তু নিয়ে, কিংবা আত্মসমীক্ষার আশালতায় আচ্ছন্ন মননশীলতার প্রসববেলার যে আরশিতে একদিন ভেসে ওঠে চেনা ও অচেনা প্রতিচ্ছায়াগুলো খণ্ড খণ্ড মেঘের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে কবিতা। তাই কবিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে হয় জল-মাটি-শস্য-পুরাণ কিংবা ঈশ্বর ও তার প্রচ্ছন্ন জ্যামিতি।কয়েক দশক ধরে বাংলা কবিতায় এক ধরনের কাহিনী কিংবা বিবরণধর্মী কবিতারই চর্চা হয়েছে বেশি। উচ্চকণ্ঠ কিংবা স্লোগানধর্মিতাই ছিল কবিতার দেহজুড়ে। রাজনীতি, সামাজিক অনাচার, যৌনতাও এসেছে একেবারে খোলা তলোয়ার হাতে। এইসব ন্যারেটিভ অকাব্যিকতা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ত্রিশ দশকের কিছু কবির মধ্যে এক ধরনের প্রত্যয় লক্ষ করা যায়। পরবর্তী সময়ের কবিদের মধ্যে এই প্রত্যয় আরও শাণিত হয়, কবিতায় ফিরে আসে বহুমাত্রিকতা এবং চিন্তা ও দর্শনের নানামুখী গুঞ্জরণ। দেখা যায় আত্মসমীক্ষার প্রবণতা এবং নতুন ভাষা নির্মাণের জন্য কবিদের ইতিহাস ও উপকথা, প্রাচীন লোককথা লোক-ইতিহাস কিংবা বাউলতত্ত্ব, সুফিবাদসহ নানা ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকেও শুরু হলো প্রবল শোষণ। কবিতা হলো 'open ended' ভাষা-সংকেতগুলো হয়ে উঠলো ব্যক্তিগত মানসিক অবকাঠামোর কেন্দ্র থেকে উৎসারিত; বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার গেল কমে, আর কবিতা ধারণ করলো ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিকে।

কবিতায় আসতে থাকলো নানা জাতের মাইনর উপেক্ষিত জিনিস, নানা রঙের ও ধরনের কীট-পতঙ্গ কিংবা পশুপাখি। ইমেজের নানামাত্রিক ব্যবহারও এই সময়ের কবিতার আরেকটি লক্ষণ। ত্রিশ শতকের কবিতায় বিমূর্তায়নের বিষয়টিও লক্ষণীয়। মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির বিস্তৃতি এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্মোচনের ঘাত-প্রতিঘাতে কবিতায় আসছে এক নয়া উপলব্ধিজাত বিন্যাস, যা আধুনিক-উত্তর সময়েরই চাহিদা। নতুন নতুন চিত্রকল্পের যে উদ্ভাসনা আজকের কবিতায় দেখা যাচ্ছে তা বাংলা কবিতায় নতুন মাত্রাই শুধু যোগ করেনি, কবিতাকে করেছে বহুস্তরিক। পরাবাস্তবের জগৎ কিছুটা পুরনো হয়ে গেলেও তার ব্যবহার যেমন আজকের কবিতায়ও দেখা যাচ্ছে, তেমনি দেখা যাচ্ছে ম্যাজিক রিয়ালিজম-এর বিষয়টিও। এটি শুধু ফিকশনের ক্ষেত্রেই নয়, কবিতায়ও আসছে এর প্রয়োগ। এভাবেই বিষ্ণু দে এর হাতে লেখা হয়েছে নতুন বাংলা কবিতা আধুনিক-উত্তর সময়ের বাস্তবতায়।কবি বিষ্ণু দে একজন আধুনিক-উত্তর সময়ের সৎ কবি। সৎ কবি হলো সেই কবি, যিনি কবিতার জন্যে শহীদ হতে পারেন, যাঁর মন ও মননের সবটুকু জুড়েই থাকে কবিতা, যিনি কবিতার নতুন নিশান উড়ানোর চেষ্টায় নিজেকে সঁপে দেন কবিতাদেবীর পদমূলে। আধুনিক-উত্তর সময়ের কবিতায় মাইনর পশুপাখির দেখা মেলে যেমন, তেমনি সময়কে নতুন করে ব্যাখ্যার বিষয়টিও রয়েছে। অনেকখানি হাহাকারবোধে আকীর্ণ তার কবিতার ঘর-সংসার।মনস্তাতিক বোধে অন্বিষ্ট এই কবির কবিতায় পৃথিবীর তাবৎ প্রান্তের নিসর্গ কিংবা প্রকৃতির অন্তরঙ্গ ডাক আমরা শুনতে পাই।

১২.২ বিষ্ণু দে এর কবিতায় ত্রিশ শতকের আধুনিক বিল্লব ঘোড়সাওয়ার, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত,ও অন্যান্য কবিতার সারমর্ম

বিষ্ণু দে জীবনানন্দ দাশের সমকালের কিন্তু বয়সে অনুজ একজন আধুনিক কবি। তাঁর কবিতার প্রধান সমস্যা বিদেশি মিথ। তিনি এলিয়টীয় আদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টায় অল্প বয়সে পশ্চিম থেকে আধুনিকতার নানা কাব্যসূত্র আমদানি করতে গিয়ে এই কাজটি করেছেন। সময়কে চিহ্নিত করার জন্য জীবনানন্দকে কেন টেনে আনলাম? বিষ্ণু দে'র কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কি জীবনানন্দকে মান ধরে নিচ্ছি? না, তুলনা করতে চেয়েছি, জীবনানন্দ দাশের কবিতার অর্থগভীরত সহজ কিংবা সরল না কিন্তু পাঠকপ্রিয়। জীবনানন্দ দীর্ঘকাল গ্রামে বাস করে, লোকায়ত জীবনের বৃত্তে অবস্থান করেও নিঃসঙ্গতাপ্রিয় ও বিচ্ছিন্নতাবাদী। কিন্তু তিনি নিজে পাঠকের কাছে বিচ্ছিন্ন নন। এটা তাঁর কাব্যকৌশলের ফল। সমকালীন প্রায় সবাই বিচ্ছিন্নতাবাদী কবিতা রচনা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা বিচ্ছিন্নতাবাদী; তাঁর বিচ্ছিন্নতা ধ্রুপদী দার্শনিক চিন্তার। অমিয় চক্রবর্তীও বিচ্ছিন্নতাবাদী। তাঁর বিচ্ছিন্নতা ভৌগোলিক অবস্থানগত এবং ভাষা, পেশাও নেপথ্য কারণ। বুদ্ধদেব বসুও বিচ্ছিন্নতাবাদী।'সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে/ বিনীত পদ্মের মতো নিশিন্ত অথচ দান্ত/ কর্মের সংবিতে স্তব্ধ/ অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা' (জল দাও)।

'বহু ব্যর্থতা বহু বেদনার বাহুল্যে বর্বর' (ত্রিপদী)। তাই কবির এই ব্যক্তিগত সুতোর আবরণে দেখা যায়- 'প্রানের পাতাল শহরে জীবন অচল অনড় অসহ।'কবির শব্দচয়ন ও বস্তুজগতের নানাদিকে নিবিড় অবলোকন তাঁর কবিতার শরীরে এনেছে প্রত্যয়দীপ্ত আলো, সেই আলোর গভীরে আরো আরো আলোর যে মেঘময় সুদূরতা আমাদের চুম্বকের মতো টেনে নেয় – সেইখানে আমাদের থেমে যেতে হয়। তার পরেও হয়তো আমাদের জানতে হয়- 'সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়া তালি/একজন আজও দেখে নিবিড় আকাশ।' তবু যখন কবি বলেন- অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজন/বেয়ারাই আনে খাস কামরায় ডালি।' তখন বোঝা যায় এই কবির স্বতন্ত্র্যসত্তার বিনম্র নির্বাসন কিংবা তাঁর নিজের কাব্যলীলার নিবিড় বনভূমির বর্ণবিভা, আলো ও অন্ধকার।

আমরা তাঁর এই কবিতায় দেখতে পাই

মন্তব্য

জন সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,

হৃদয় আমার চড়া ।

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি-

কোথায় ঘোড়সওয়ার?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী! বর্শা তোলো ।

কোন ভয়? কেন বীরের ভরসা ভোলো?

নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া?

চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি?হৃদয় আমার চড়া?

অঙ্গে রাখিনা কারোই অঙ্গিকার?

চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া ।

এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া?

মৃগতৃষ্ণিকা দূর দিগন্তে ডাকি?

আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল

ললাটে তিলক টানো ।

সাগরের শিরে উদ্বেল নোনা জল,

হৃদয়ে আধির চড়া ।

চোরাবালি ডাকি দূর দিগন্তে,

কোথায় পুরুষকার?

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!

আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর

অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

হালকা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো ।

সাত সমুদ্র চৌদ্দ নদীর পার-

হালকা হাওয়ায় হৃদয় দু-হাতে ভরো,

হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার ।

পাহাড় এখানে হালকা হওয়ায় বোনে

হিম শিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে ।

আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে

পায়-পায় চলে তোমার শরীর ঘেঁষে

কাঁপে তনু বায়ু কামনায় থরথর ।

কামনার টানে সংহত গ্লেসিয়ার ।

হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো,

হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোরসাওয়ার!

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে

বিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে!

তরঙ্গ তব বৈতরণী পার ।

পায়-পায় চলে তোমার শরীর ঘেঁষে

আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে ।

চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার!

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার-

মেরুচূড়া জনহীন-

হালকা হওয়ায় কেটে গেছে কবে

লোক নিন্দার দিন ।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,

আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর ।

কোথায় পুরুষকার?

অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গিকার? (ঘোড়সওয়ার)

বিষ্ণু দে-র কবিতার ভিন্ন চারিত্র্য যদি একদা বহু পাঠককে স্পর্শ করে থাকে – তাঁর কবিতার বিস্তার ও সমগ্রতা, তাঁর কবিতার ভাষা ও বাচনের স্বরূপকে ভর করে সেই

পাঠকের প্রস্তুতি যদি একসময়ে তৈরি হয়ে যায়।আজ সমাজ রাজনীতি বা সংস্কৃতির পরিবেশের নিঃস্বতায় যদি সেই প্রস্তুতি আড়ালে চলে গিয়েও থাকে সাময়িকভাবে – কবিতার সেই উচ্চারণ কি আবার শোনা যাবে না, যদি তার মধ্যে আবহমান ও অবিনাশী সত্য কিছু থেকে থাকে। পাঠকের অপ্রস্তুতি বা অন্যমনস্কতার দায় কেন বহন করতে হবে সেই লেখককে যিনি সমগ্রের সঙ্গে অবিরল সংলগ্নতা ছাড়া বাঁচেন না? কেন অপেক্ষা করতে হবে সীমাবদ্ধ সেই দীক্ষিত পাঠকের জন্যই শুধু?অবশ্য সেই দীক্ষিত পাঠকের পক্ষপাত মানে এই নয় যে, সেই লেখকের সব লেখা সম্পর্কেই তাঁর সমান প্রশ্নাতীত অনুরাগ থাকতেই হবে। কিংবা, উলটো করে বলা যায়, যে-লেখক সম্পর্কে কোনো পাঠক তুলনায় উদাসীন, সেই লেখকের কোনো লেখাই ভালো লাগবে না বা লেখার কোনো গুণই ধরা পড়বে না – তাই বা হবে কেন? বিষ্ণু দে-র কবিতার অনুরাগী পাঠকও তাঁর সব কবিতা সম্পর্কে সমান আগ্রহী হবেন, এমন তো নাও হতে পারে। সমকালীন পাঠক যেমন, তেমনই পরবর্তীকালের পাঠকও – তিনি যখন বিষ্ণু দে-র কাব্যসম্ভারে উদ্দীপ্ত তখনও কবির কোনো কোনো কবিতায় সাড়া নাও দিতে পারেন।প্রথমদিকে বিষ্ণু দে-র কবিতায় দুরূহ শব্দ ও দেশবিদেশের পুরাণ থেকে উল্লেখ ছিল খুবই বেশি – রাবীন্দ্রিক যুগের পর প্রয়োজনও ছিল হয়তো আধুনিকের নন্দনে, কবিতাকে সংহত ও তীব্র করে তোলার জন্য। কিন্তু সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটে গেছে। এখন তা পাঠককে অনেকসময়েই বাধাগ্রস্ত করে। অবশ্য কবিরও কি মনে হয়নি তা অহেতুক – না হলে তাঁর কবিতা কেন ক্রমশই সেই কঠিনের পথ ছেড়ে সহজের দিকে, কঠিন সহজের দিকে যেতে চাইবে? নিজের পথ খোঁজার দুরন্ত তাগিদেই হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটেছে – শব্দের পুনরাবৃত্তি, ভাবনার পুনরাবৃত্তি, বাকপ্রতিমার পুনরাবৃত্তি। কবিস্বভাবের এই লক্ষণ বোধহয় সব কবির কবিতাতেই কমবেশি থাকে। এবং সেই কবিতাগুলো পরবর্তীকালে হারিয়ে যেতে চায়। কোথাও-বা, পাঠকের মনে হয়, তাঁর কবিতায় তথ্যটা বড়ো হয়ে উঠেছে, নিষ্প্রভ আপ্তবাক্য শোনা যাচ্ছে – সেকালের অবিশ্বাসী পাঠককে শুধু নয়, একালের সহৃদয় পাঠককেও যা স্বস্তি দিতে পারছে না। বাংলা কবিতার অতীত উজ্জ্বল, বর্তমান অন্ধকার, ভবিষ্যত

অনিশ্চিত।

পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল-জীবনানন্দ থেকে শুরু করে নজরুল এমনকী বিশ শতকের শেষ মুহূর্তে আবির্ভূত কবিদের রচনায় অতীত-ঔজ্জ্বল্যের প্রমাণ রয়েছে।মানবসভ্যতার কোনো কিছুই দীর্ঘকাল উর্ধ্বগামী থাকে না। প্রতিটি প্রপঞ্চ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতাপর্যন্ত ক্রমোন্নতির দিকে যায়। এরপর থেকে আবার ক্রমাগত নিম্নমুখীও হয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এর ব্যাত্যয় ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় জীবনানন্দ-বিষ্ণু দে-সুধীন্দ্রনাথ-বুদ্ধদেব বসু-অমিয় চক্রবর্তীদের আভির্ভাব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এই পঞ্চকবি বাংলা কবিতাকে নিয়ে গেছেন বহুরৈখিকে ও চরম উৎকর্ষে। এরপর থেকে গত শতকের শেষমুহূর্তপর্যন্ত আরও অন্তত ৫/৬ জন বাংলা কবিতাকে দিয়েছেন প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য। বলা চলে গত শতকের বারো আনা কালই বাংলা কবিতার ক্রমোৎকর্ষের কাল। কিন্তু সভ্যতার অন্যান্য দিকের মতো কবিতায়ও হঠাৎ ধস নেমেছে যেভাবে ইতিহাসে একেকটা রাজবংশের পতন হয়েছে। আরও সহজ করে বলা চলে, পরিশ্রমী শিল্পীদের বিপরীতে প্রায় স্টান্টবাজদের সময়ে এসে পড়েছে বাংলা কবিতা। ফলে এখন তেমন আর কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে না। যারা লিখছেন, তারা অকবি-স্টান্টবাজদের দৌরাত্ম্যে প্রায় উপেক্ষিত।এ সময়ে যারা কবিতা লেখার কসরৎ করতে চেয়েছেন, তাদের সিংহভাগেরই রচনা হয় তীব্র ভাবাবেগের স্ফূরণ মাত্র, নয় কোনো মতবাদ বা ইচ্ছা-অনিচ্ছার ভাষিক রূপ। যা তারা প্রেমিকা বা কোনো নারীর উদ্দেশে কিংবা মনোবিকলনের বিশেষ মুহূর্তে লিখেছেন। কিন্তু মনের স্বাভাবিক অবস্থায় ওই রচনার শিল্পমান নিয়ে কখনো ভাবেননি। প্রয়োজনও মনে করেননি। এ কথা সত্য ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রকাশ-প্রবণতা আধুনিকদের মজ্জাগত। কিন্তু আজকের যে তরুণরা কবিতা লিখতে এসেছেন, তাদের অভিরুচিই গড়ে ওঠেনি। যা গড়ে উঠেছে তা হলো অন্যকে বোঝার চেয়ে বোঝানোর, বহিঃজগতের নানা প্রপঞ্চ জানার চেয়ে নিজেকে বিজ্ঞপিত করার মানসিকতা। অথচ জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণুদে প্রমুখ কবির উত্থানকালে একচ্ছত্র অধিপতি রবীন্দ্রনাথ। লিখে চলেছেন মহৎ সব রোমান্টিক কবিতা। সাধনায় মগ্ন আধ্যাত্মের চরাচরের দৃশ্য-চিত্র-শব্দ-বর্ণ-গন্ধ অনুষঙ্গে কবিতাকে

আধুনিক মানুষের দিনানুদিনের অভ্যাসে পরিণত করেছেন। তবে সে সত্য প্রকাশে নাগরিক জীবনের বৈকল্য-যান্ত্রিক অস্বস্তিকে যতটা গুরুত্ব দিলেন, তারও বেশি পল্লীর বিশ্বাস-পরিবেশ ও প্রতিবেশকে ধারণ করলেন কবিতায়।ইতোমধ্যে বিশ্ববাসীর অভিজ্ঞতায় যোগ হয়েছে দুই দুটি বিশ্বযুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে। স্বপ্নের ভাষা ও ব্যাবহারিক ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। কারণÑ ‘মানব সমাজে রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্তন অনবরত ঘটে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে কোনো বৃহৎ পরিবর্তন আসে না। উপস্থিতকালে জীবিত বুদ্ধিজীবীরা সবাই ভাবেন যে, রাজনীতির পরিবর্তন মানুষের চিন্তার রাজ্যেও বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। পরিবর্তন হয়তো আসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আসে না।’ এ দিকে রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের ভয়াবহতাকে প্রত্যক্ষ না করেও অনুভব করার চেষ্টা করেছেন দার্শনিক প্রত্যয়ে-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। রবীন্দ্রকাব্যের শব্দ-ভাষাশৈলী সহজ সরল সত্য। কিন্তু তা কোনোভাবেই দিনানুদিনের ভাষা নয়। সে ভাষা সহজবোধ্য হলেও পোশাকি। অন্যদিকে জসীমউদদীনের কবিতার বিষয়বস্তু যেমন পল্লী থেকে আহরিত, তেমনি ভাষাও পল্লিবাসীর কথোপকথন থেকে সংগৃহীত। ফলে জসীমউদদীনের চেতনা প্রকাশভঙ্গিতে ঐকতান সুস্পষ্ট। জীবনানন্দ বিষয় নির্বাচনে যেমন জসীমউদ্দীনের সমগোত্রীয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও। কিন্তু শব্দ নির্বাচনে পল্লির বিষয়-আশয়কেন্দ্রিক হলেও তা সম্পূর্ণরূপে পল্লির নয়। পল্লি ও গ্রামীণ জনপদ থেকে শব্দ ও বিষয়-আশয় সংগ্রহ করেছেন সত্য; তাকেই অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ করেননি। নিজের অনুশীলনগুণে পল্লি থেকে মন্থিত বিষয়-আশয় এবং শব্দসমবায়কে করে তুলেছেন মার্জিত। ফলে তার কাব্যভাষা না-গ্রাম্য, না-শহুরে সংকরও নয় হয়ে উঠেছে শিক্ষিতজনেরর মার্জিত-পোশাকি কথ্যভাষা।

বাঙালির অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে প্রথম সংকট ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা, দ্বিতীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি। ইংরেজ কবি এলিয়ট যুদ্ধোত্তর

বিশ্বকে দেখেছেন রুক্ষ, রূঢ় ও নিরস রূপে। যা ওয়েস্টল্যান্ডের পংক্তি-পংক্তি উৎকীর্ণ। এদিকে বাঙালির মধ্যে একদিকে জাতীয়তাবোধ-দেশপ্রেম প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে কোনো-কোনো বাঙালি জাতীয়তার বৃত্তকে সংকীর্ণ বৃত্ত ভেবে দেশপ্রেমকে নিছক আঞ্চলিকতাপ্রীতি হিসেবে গণ্য করেছেন। প্রথমোক্তদের লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি-রাজনৈতিক স্বাধিকার। এ কারণে তাদের বিবেচনাবোধের কাছে সমগ্র মানবজাতির ঐক্য ও বিশ্বমানবতা গৌণ হয়ে উঠল। পক্ষান্তরে যারা মানুষকে প্রতিদিনের আচরণ ও ব্যক্তিস্বার্থের কদর্যময় চিত্রের ভেতর আবিষ্কার করতে চাননি, তারা মানুষকে গ্রহণ করতে চাইলেন সবধরনের দ্বেষ, প্রতিহিংসা, বৃত্ত ও সংকীর্ণতার বিপরীতে। ফলে তাদের চোখে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের টানাপড়েন ততটা মূল্য পায়নি, যতটা মানবপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত তাদের চিন্তা যে চিন্তায় তারা প্রকাশ করেছেন মানুষের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও ব্যক্তির মনোবিকলনের রূপ। বিষ্ণু দে এও এ শ্রেণীর বাঙালির প্রমূর্ত সত্তা। তার কবিতায় যতটা ভ্রাতৃত্ব ও আধ্যাত্মবোধ ব্যঞ্জিত, ততটা শোষিত-পরাধীন জাতির মুক্তির মূলমন্ত্র হয়ে ওঠেনি। এর কারণ বিষ্ণু দেও মানুষকে তার প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে আবিষ্কার না করে তাকে স্নেহে-প্রেম-মমতা এবং আত্মনিবেদনের চিরন্তন মানবধর্মের মধ্যে আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বিষ্ণু মানসে কখনো ঠাঁই পায়নি। অথচ ইউরোপের প্রধান কবিরা তখন ব্যক্তির নৈঃসঙ্গ, নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যকে প্রমূর্ত করে তুলছেন কাব্যে। তারা আধুনিক জীবনযাত্রায় দেখছেন বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব, সংশয় এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদগ্র বাসনা।বিষ্ণু দে ইউরোপীয় জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষদর্শী না হলেও ইয়েটস, পাউন্ড, এলিয়টের কবিতা পঠন-পাঠনের সুবাদে আধুনিক যুগ-যন্ত্রণার স্বরূপ উপলব্ধি করেন।বিষ্ণু দে কাব্যক্ষেত্রে আধুনিকতার রূঢ়-রূপ চিত্রায়নে ব্যাপক নিরীক্ষা করলেও, পশ্চিমের জীবনযাত্রার স্বরূপ বঙ্গীয়করণের চেষ্টা জোরালোভাবে করেননি।পৃথিবীতে যত প্রপঞ্চ আছে, তার মধ্যে ধর্ম সবচেয়ে বেশি প্রভাবসঞ্চারী। যখন কোনো একটি বিশেষ প্রপঞ্চ প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে ওঠে, তখন ওই প্রপঞ্চের প্রতি বিমুখ-আস্থাহীন-নিরপেক্ষ মানুষের শ্বাসরোধ হয়ে আসে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবসঞ্চারী প্রপঞ্চের বিরুদ্ধে নিকটবর্তী প্রভাবসঞ্চারী

প্রপঞ্চের অনুগামীরা হয়ে ওঠে প্রতিবাদমুখর। এ তথ্য অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, জাদু, ধর্ম, কবিতা ও শিল্পকলার তাবৎ অঞ্চল সম্পর্কে সত্য।১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ফলে ভারতবর্ষে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল, তার প্রভাব শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেভাবে পড়েছে, সেভাবে স্পর্শ করেনি এই কবিদের। তেমনি লাহোর প্রস্তাব, গান্ধী-নেহেরু-জিন্না মতবিরোধের ফলে দেশেসৃষ্ট দাঙ্গার ঘটনাও তাদের ব্যথিত করেনি। তাঁর কবিতায় ব্যক্তির মনোজগত যতটা প্রতিফলিত; বহির্জগতের আচরণ ও কর্মব্যস্ততা ততটা নয়। ফলে প্রেম, হিংসা, বিদ্বেষ, ভালোবাসা, মান-অভিমান কবিতার মূল অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে।রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সামাজিক অস্থিরতার বিষয়গুলো কবিতায় অঙ্গীভূত হতে পেরেছে। সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের আচরণে সাধারণ ও নিম্নবিত্ত অবদমিত থাকে। এই অবদমন থেকে সৃষ্টি হয় অসন্তোষ। সময়ে এই অসন্তোষই ক্ষোভে পরিণত হয়। ক্ষোভ থেকে জন্ম নেয় বিদ্রোহের। যা চিত্রিত হয়েছে, বিষ্ণু দের কবিতায়। তাঁর কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতা পূর্ববর্তী বাংলা কবিতারই ধারাবাহিক প্রপঞ্চ, ঐতিহ্যিকেও প্রভাবিত করেছে।এ ধরনের পরিবর্তনে কতগুলো নিয়ামক কাজ করেছে। প্রধম কারণ পারিবারিক-সামাজিক, দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক। মানুষ সামাজিক জীব, পারিবারিক বন্ধন মানুষকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও নির্ভরশীল করে তোলে। পারিবারিক ঐতিহ্যের কারণে ভাই-বোন, বাবা-মা পরস্পরের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সহযোগী হন। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান। এদেশের মানুষ মূলত কৃষিপ্রধান জীবিকা নির্বাহ করে। মানুষ যতদিন গ্রামে থাকে ততদিন তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনও সুদৃঢ় থাকে। একেক গ্রামে, একেক পরিবারের মানুষের খাদ্যাভ্যাস, রুচিবোধ ও আচরণবিধি, পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতাদর্শ একেক রকম। একজনের সঙ্গে অন্যজনের মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। কিন্তু মানুষ যতই শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করে ততই কৃষিভিত্তিক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগ দিতে চায় বেশি। শহরে শিল্প নির্ভর সংস্কৃতি ও পেশাদারিত্ব গড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। শিক্ষিত মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হয়। বিয়ে থেকে শুরু করে নানা রকম

সামাজিক সম্পর্কগুলো নতুনভাবে সৃষ্টি হয়। এক সময় শহরেই থিতু হতে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে অভিবাসনের ফলে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। একেক জনের সঙ্গে একেক জনের নানা রকম ভিন্নতা দেখা দেয়। শিথিল হতে থাকে পারিবারিক বন্ধন। শুরু হয় নিঃসঙ্গতা। এ নিঃসঙ্গতা হয়ে উঠেছে আধুনিক কবিতার বিষয়, একই সঙ্গে আঙ্গিকও। অর্থাৎ ত্রিশ শতকের বিষ্ণু দের কবিতায় বিষয়-শব্দ-বাক্যে যেমন একাকীত্ব-নিঃসঙ্গতাকে তুলে এনেছেন, তেমনি ছন্দ-মাত্রা-পঙ্ক্তিবিন্যাসে করেছেন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। স্বরবৃত্ত-মাত্রবৃত্তে পঙক্তিদৈর্ঘ্যে এনেছেন বৈচিত্র্য। পর্বের সমতা ভেঙে পঙ্ক্তিগুলো করে তুলেছেন বিসমপার্বিক। তুলে দিয়েছেন অন্ত্যমিল। এর পরিবর্তে মধ্যমিলকে দিয়েছেন গুরুত্ব। আর অক্ষরবৃত্তকে এমনভাবে গদ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন, তাতে গদ্যপদ্যের স্থূল প্রভেদ প্রায় ঘুচে গেছে।রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা,সামরিক শাসন- এসব ঘটনার সঙ্গে জাতির অর্থনৈতিক বিষয়গুলো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত অর্থনৈতিক মুক্তি অসম্ভব। অর্থনৈতিকভাবে দাসত্বের কারণে ব্যক্তি হয়ে পড়ে ভীরু, মেরুদন্ডহীন। তাই গত শতকের কবিরা রাজনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তিরও দাবি তুলেছেন। বিষয়-আঙ্গিকের পাশাপাশি তাদের চেষ্টা ছিল কণ্ঠস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠাও।

বিষ্ণু দের কবিতা কোনো শর্তই মানতে অনীহ। তাঁর মনে কোনো একটি বিশেষ ভাবের উদয় হওয়া মাত্রই তা অক্ষরে-শব্দে-বাক্যে রূপ দিচ্ছেন। আগেই বলা হয়েছে, সবকিছুরই উত্থান-পতন রয়েছে। তেমনি কাল-কালান্তরের কবিতারও। পদাবলির দীর্ঘকাল পর মাইকেল, এর দীর্ঘদিন পর রবীন্দ্রনাথ। তারপর রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে স্বীকার করেও সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে বিষ্ণু দের হাতে আধুনিক বাংলা কবিতার সৃষ্টি। তিরিশের কাব্যধারায় বাংলা কবিতায় নতুন ভাব ও নতুন ভঙ্গি দেখা দেয় । যারা প্রধানত এই নতুন ভাবভঙ্গি এনেছিলেন, তাদের বলা হয় তিরিশের কবি। বিষ্ণু দে এদেরই একজন। বিখ্যাত বাঙালি কবি লেখক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক বিষ্ণু দে

মন্তব্য

১৯৭১ সালে তাঁর ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ বইটির জন্য ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ লাভ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় কবি বিষ্ণু দে পালন করেছেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।কবি বিষ্ণু দে কে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও তাই অরুণ সেনের লেখা কবির ছোট্ট কিন্তু তথ্যবহুল সুন্দর জীবনীটির পাঠ নিয়েছি।সেখান থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও অন্যান্য আরো অনেক লেখার মতই এখানেও স্থান ও পরিসরের স্ফীতাকারের সীমাবদ্ধতার সূত্র মেনে আমাকে রক্ষণশীল হতেই হচ্ছে, লেখার আকার বা আয়তন প্রয়োজন অনুযায়ী বড় করা যাচ্ছে না বলে মনের অস্বস্তি দূর হচ্ছে না।কবি বিষ্ণু দে শৈশবেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সংক্রান্ত রচনাগুলো পাঠ করে এতটাই আলোড়িত হলেন যে, তিনি ঠিক করলেন স্কুলের পড়ালেখাই ছেড়ে দেবেন। ‘আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সব ভুল’ বলে মনে করে তিনি স্কুল জীবনেই চরম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বিরোধী হয়ে ওঠেন। যা তাঁর লেখাপড়ার স্বাভাবিক গতিতে ছেদ আনে।বয়ঃসন্ধির এই পর্বে কয়েকজন শিক্ষক অবশ্য তাঁকে ভীষণভাবে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করেন। ফলে পাঠ্য বইয়ের বাইরের বই পড়েও তিনি জীবনের গন্তব্যপথ হারাননি, লক্ষভ্রষ্ট হননি। শিক্ষকদের এবং অসম্ভব দূরদর্শী বাবার পরম সাহচর্য ও সহযোগিতাই তাই তাঁর জীবনে তেমন বিশেষ নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি বলেই জানা যায়।পারিবারিক, ব্যক্তিগত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার তাঁর জীবন বিকাশেও বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে তিনি আজীবন স্বীকার করে।মার্কসবাদী চেতনাই ছিল তাঁর কবিপ্রতিভার মৌল ভিত্তি।যদিও জন্মেছিলেন তিনি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে।কাব্য জীবনের প্রথম থেকেই তিনি ব্যতিক্রমী মনীষার দীপ্তিতে উজ্জ্বল, মার্কসবাদী চেতনায় ঋদ্ধ। কবিতার বিষয় নির্বাচন এবং প্রকরণ-প্রসাধনে বিষ্ণু দের স্বকীয়তা বাংলা কবিতার এক বিরল সম্পদ। আমরা সবাই জানি, বিষ্ণু দের কবিতার একটা মূল ব্যাপারই হল, সেখানে সমকালীন জীবনের, দেশ ও কালের, রাজনীতি ও সমাজের প্রতিধ্বনি। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানের সময়টা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, তেভাগা-আন্দোলন ইত্যাদি থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরের ঘটনাবহুল জীবন ও আন্দোলন তাঁর কবিতায় সরাসরি ছায়া ফেলে।

সমালোচক অরুণ সেন লিখছেন, 'বিষ্ণু দে-র কবিতার ভিন্ন চারিত্র্য যদি একদা বহু পাঠককে স্পর্শ করে থাকে – তাঁর কবিতার বিস্তার ও সমগ্রতা, তাঁর কবিতার ভাষা ও বাচনের স্বরূপকে ভর করে সেই পাঠকের প্রস্তুতি যদি একসময়ে তৈরি হয়ে যায় – আজ সমাজ রাজনীতি বা সংস্কৃতির পরিবেশের নিঃস্বতায় যদি সেই প্রস্তুতি আড়ালে চলে গিয়েও থাকে সাময়িকভাবে – কবিতার সেই উচ্চারণ কি আবার শোনা যাবে না, যদি তার মধ্যে আবহমান ও অবিনাশী সত্য কিছু থেকে থাকে। পাঠকের অপ্রস্তুতি বা অন্যমনস্কতার দায় কেন বহন করতে হবে সেই লেখককে যিনি সমগ্রের সঙ্গে অবিরল সংলগ্নতা ছাড়া বাঁচেন না? কেন অপেক্ষা করতে হবে সীমাবদ্ধ সেই দীক্ষিত পাঠকের জন্যই শুধু? অবশ্য সেই দীক্ষিত পাঠকের পক্ষপাত মানে এই নয় যে, সেই লেখকের সব লেখা সম্পর্কেই তাঁর সমান প্রশ্নাতীত অনুরাগ থাকতেই হবে। কিংবা, উলটো করে বলা যায়, যে-লেখক সম্পর্কে কোনো পাঠক তুলনায় উদাসীন, সেই লেখকের কোনো লেখাই ভালো লাগবে না বা লেখার কোনো গুণই ধরা পড়বে না – তাই বা হবে কেন? বিষ্ণু দে-র কবিতার অনুরাগী পাঠকও তাঁর সব কবিতা সম্পর্কে সমান আগ্রহী হবেন, এমন তো নাও হতে পারে। সমকালীন পাঠক যেমন, তেমনই পরবর্তীকালের পাঠকও – তিনি যখন বিষ্ণু দে-র কাব্যসম্ভাবে উদ্দীপ্ত তখনও কবির কোনো কোনো কবিতায় সাড়া নাও দিতে পারেন।'কবি আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব| শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনো এক বিদেশি চিত্রকরকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, 'শিল্প আনন্দভ্রমণ নয়, সংগ্রাম।' কবিতাও সংগ্রাম, সংস্কৃতির সংগ্রাম। বিষ্ণু দের কবিতায় সেই সংগ্রামের ধ্বণি প্রতিধ্বণিত হয়। সাহিত্য সমালোচকগণ বলছেন, বিষ্ণু দে মনীষা ও আবেগের সমন্বয়জাত, দেশজ ঐতিহ্য ও বিশ্ব সাহিত্যের বিচিত্র ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেছেন। তাঁর কাব্যচিন্তার গঠনে যেমন ইউরোপীয় আধুনিক কবিদের দান অতি স্পষ্ট, তেমনই প্রভাবশীল মার্কসীয় দর্শন| যদিও জীবনের কোন এক সময়ে তিনি কমিউনিস্ট নেতৃত্বের প্রতি আস্থাহীনতার দোলাচলের মধ্যেও কাটিয়েছেন, যা তাঁর বেশ কিছু কবিতায় ফুটে উঠেছে | রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের প্রতি সচেতনতা, বাংলাদেশের লৌকিক জীবনচর্চার প্রতি অনুরাগ,

ব্যঙ্গপ্রিয়তা এবং ইতিহাস বোধ, ছন্দের সুচারু ব্যবহার, অপ্রত্যাশিত মিলের চমকে, শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্যে এবং সর্বোপরি এক বিরাট বিশ্ব ও মানবিকবোধে আধুনিক কবি সমাজে বিষ্ণু দে অপ্রতিদ্বন্দ্বী | তিরিশ কালপর্বে কবিরা প্রচল কাব্যধারার পরিবর্তনের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। ফলে তাদের কবিতায় শ্রমজীবী ও জনতাভিত্তিক সমাজচেতনার উন্মেষ দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যে একসময় উপেক্ষিত ও বিতর্কিত মার্কসবাদ তিরিশের কবিদের আবেগে মনন যুগিয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ পর্বের কবিরা নিজেদের অ্যান্টি-রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্রদর্শন ত্যাগ করে নৈরাশ্যবাদী ভাবধারায় কবিতা চর্চার প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্যাসিস্টবিরোধী ভূমিকায় দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বিষ্ণু দেও এ পথে শামিল হন, এ ধারায় ক্রমশ তার শৈল্পিক অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ রবীন্দ্রবিযুক্তির প্রত্যয়ে বাংলা কবিতায় বিষ্ণু দে যে ভাবাদর্শে তার কাব্যসৌধ নির্মাণ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পশ্চিমা জ্ঞান ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং পূর্বসূরি জারিত। তার কবিতার বিমুগ্ধ পাঠে ধরা পড়ে মার্কসীয় মতাদর্শ। সমকালীন যুগযন্ত্রণা এবং আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের সমন্বয় এবং স্বদেশ চিন্তাও তার কবিতার একটি বিশেষ লক্ষণ। বেঁচে থাকার তাগিদে এ পর্বের কবিরা মানুষের মূল আকাঙ্খার দাবিতে প্রতিবাদী চেতনা তুলে আনতে সচেষ্ট থেকেছিলেন তাদের কবিতায়। যা বিশ্বসাহিত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃত। তবে মার্কসীয় দর্শনতাড়িত হলেও বিষ্ণু দে নিজে কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেননি। তিনি সচেতনভাবেই কবিতায় দর্শন ও বিজ্ঞানের মিশেল ঘটিয়েছেন। তার কবিতায় যেমন আছে নিসর্গ চেতনা তেমনি আছে ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের প্রবল উপস্থিতি। আছে মিথ-পুরানের সফল প্রয়োগ। তৎকালীন ভারতবর্ষে সমাজবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্মাণে সাংস্কৃতিক ধীমানরা বিদেশী সাহিত্যে নিজেদের মুক্তি খুঁজেছিলেন। এ ধারায় অগ্রবর্তী কবি বিষ্ণু দের অধিকাংশ কবিতায় মার্কসীয় আদর্শের তাত্ত্বিক ঘোষণা স্পষ্ট হয়। তিনি মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক চেতনা ভিন্ন মানবিক চেতনার বিজয় অসম্ভব। সুতরাং বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে তার কবিতায় মৃত্যুহীন মানুষের জয়গাঁথা রচিত হয় অনায়াসে- অমর

দেশের মাটিতে মানুষ অজেয় প্রাণ,/ মুঢ় মৃত্যুর মুখে জাগে তাই কঠিন গান।/ হে বন্ধু জেনো, আজ যবে খোলে মুক্তিদ্বার,/ দেশে আর দশে ভেদাভেদ শুধু ভীরুতা ছার।তিরিশি আধুনিকতায় যে স্বল্পসংখ্যক কবি বাংলা কবিতার পালাবদল ঘটিয়েছিলেন, তাদেরই একজন বিষ্ণু দে। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম প্রধান কবির বিশেষণেও ভূষিত করা হয়ে থাকে এই কবিকে। জীবনানন্দ দাশ, সুধীনদত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ তিরিশি কবিকে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হলেও বিষ্ণু দে সে তুলনায় খুব কমই আলোচিত। বলা যায় বিষ্ণু দে পাঠকও সীমিত। কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অনিবার্য এই নাম। বিষয় বৈচিত্র্যে, ভাষা আর আঙ্গিকের নিরীক্ষায়, দার্শনিক প্রজ্ঞায় আলোকিত তার কবিতা বোধ্যতা আর দুর্বোধ্যতায় কবিতার আলো-আঁধারি পথে চলতে গিয়ে বিষ্ণু দে নিরন্তর নিজেকে ভাংচুর করেছেন। মার্কসবাদী দর্শনের সঙ্গে মিলে-অমিলে বিতর্কিত হয়েছেন প্রবলভাবে। একদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে এলিয়টীয় নৈঃসঙ্গ আর হতাশার বোধে প্রবলভাবে আক্রান্ত তার কবিতা; অন্যদিকে পরিণত পর্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে তার প্রত্যয়ী-আশাবাদী কবিতা। মার্কসবাদে বিশ্বাসী সমাজসচেতন একজন কবি বিষ্ণু দে। স্বভাবতই তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে লোকায়ত বিভিন্ন চরিত্র ও অনুষঙ্গ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরাণের নান্দনিক প্রয়োগ তাঁর কবিতায় ভিন্নমাত্রা পেয়েছে। ‘উর্বশী’, ‘আর্টেমিস’, ‘শ্রীকৃষ্ণ’, ‘হেক্টর’, ‘ইউলিসিস’ প্রমুখ তাঁর কবিতায় বিচিত্র রূপ নিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সাত ভাই চম্পা কাব্যের নামটিই লোকজ চেতনার স্মারক। আহমদ রফিকের ভাষ্যে পাই, ‘বিষ্ণু দে র কাব্যব্যক্তিত্বে জটিলতা যেমন সত্য তেমনি সত্য প্রাথমিক পর্বের কবিতায় এলিয়ট প্রভাবিত দুর্বোধ্যতার আভাস সেই সঙ্গে আদর্শগত দ্বন্দ্ব।’ বিষ্ণু দে’র পিতার নাম অবিনাশচন্দ্র দে এবং মায়ের নাম মনোহারিণী দেবী। বাবা ছিলেন অ্যাটর্নি। বিষ্ণু দে কলকাতারই ছেলে এবং কলকাতায় তিনি পুরো জীবন কাটিয়েছেন। কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউট ও সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে বিষ্ণু দে অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ সালে তিনি এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএ (১৯৩০), সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স (১৯৩২) ডিগ্রি লাভ করেন। প্রথম

থেকেই তিনি ইংরেজিতে খুব ভালো ছিলেন এবং বিএ পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভালো করার জন্য পুরস্কারও পান। ১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাস করেন। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৫ সালে কলকাতা রিপন কলেজে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এখানে তিনি সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলেন কবি বুদ্ধদেব বসুকে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবেই বিভিন্ন সরকারি কলেজে চাকরি করেছেন। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৭ সময়কাল মৌলানা আজাদ কলেজে এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সময়কাল কৃষ্ণনগর কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৯ সালে চাকরি থেকে অবসর নেন। ততোদিনে তিনি বাংলা সাহিত্যের এক অতি সম্মানিত কবি। ১৯৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি পরলোকগমন করেন। বিষ্ণু দের স্ত্রীর নাম প্রণতি দে। তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৪ সালে।তরুণ বয়স থেকেই বিষ্ণু দে একজন উদীয়মান কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতায় যেসব নতুন সাহিত্যিকগোষ্ঠী জন্ম নিয়েছিল, তাদের পত্রিকায় বিষ্ণু দে লিখতেন। বিষ্ণু দেই প্রথম স্পষ্টভাবে বলেন, তরুণ কবিদের রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া উচিত। ১৯২৩ সালে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের ফলে যে নতুন সাহিত্য উদ্যম ও ব্যতিক্রমী শিল্প চেতনার সৃষ্টি হয়, বিষ্ণু দে ছিলেন তার অন্যতম উদ্যোক্তা। কিন্তু ১৯৩০ সালে কল্লোল পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি সুধীন্দ্রনাথের ‘পরিচয়’ পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন, ১৯৪৭ পর্যন্ত এর সম্পাদক মন্ডলীর অন্যতম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ‘সাহিত্যপত্র’ নামে একটি রুচিশীল পত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৪৮)। তিনি নিজেও নিরুক্ত নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিষ্ণু দে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু করেন। শুধু সাহিত্য বিষয় নয়, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির বিবিধ বিষয় নিয়ে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রচনা অভিনন্দিত হয়েছে। গদ্য ও পদ্যে তাঁর বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ক্যালকাটা গ্রুপ সেন্টার, সোভিয়েত ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশন, প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার

অ্যাসোসিয়েসন, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ছবিও আঁকতেন।কবিতার বই ছাড়া বিষ্ণু দের অনেক গদ্য রচনাও আছে। তিনি একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও সমালোচক। তার কয়েকটি ইংরেজি বইও রয়েছে।বিষ্ণু দে'র উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ: উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯৩৩), চোরাবালি (১৯৩৭), সাত ভাই চম্পা (১৯৪৪), রুচি ও প্রগতি (১৯৪৬), সাহিত্যের ভবিষ্যৎ (১৯৫২), নাম রেখেছি কোমল গান্ধার (১৯৫৩), তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ (১৯৫৮), স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত (১৯৬৩), রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা (১৯৬৬), মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা (১৯৬৭), 'In the Sun and the Rain' (১৯৭২), জনসাধারণের রুচি (১৯৭৫), যামিনী রায় (১৯৭৭), উত্তরে থাকো মৌন (১৯৭৭), সেকাল থেকে একাল (১৯৮০), আমার হৃদয়ে বাঁচো (১৯৮১) প্রভৃতি। In the Sun and the Rain' নামে রচনা সংকলনের প্রাপ্য রয়্যালটি তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে দান করেছিলেন। ছড়ানো এই জীবন নামে তাঁর একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ আছে। এছাড়াও রয়েছে ১০টি কাব্য সংকলন, ৭টি অনুবাদগ্রন্থ এবং ২টি সম্পাদিত গ্রন্থ। তাঁর একটি সম্পাদিত গ্রন্থ হচ্ছে এ কালের কবিতা।বিষ্ণু দে ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতার নব্যধারার আন্দোলনের প্রধান পাঁচজন কবির অন্যতম ছিলেন। তিনি মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কাব্যভাবনা ও প্রকাশরীতিতে বুদ্ধিবৃত্তি ও মননশীলতাকে অঙ্গীকার করেই তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতায় টি.এস এলিয়টের কবিতার প্রভাব রয়েছে। দেশের অতীত ও বর্তমানের নানা বিষয় এবং বিদেশের বিশেষত ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র প্রসঙ্গ তাঁর কাব্যের শরীর ও চিত্রকল্প নির্মাণ করেছে। এসব কারণে তাঁর কাব্য দুর্বোধ্যতার অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। বিষ্ণু দে একজন সমাজসচেতন কবি ছিলেন। তার কবিতায় মধ্যবিত্ত মানুষের নানা সমস্যা ও সঙ্কটের কথা রূপ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে তার অনেক বিখ্যাত কবিতা আছে। নাগরিক জীবনের শূন্যতার কথা তিনি তার কবিতায় লিখেছেন। বিষ্ণু দে মার্কসবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি সমাজের পরিবর্তনে খুব আশাবাদী ছিলেন। সমাজের পরিবর্তন কামনা করে কবি-সাহিত্যিকের 'প্রগতি লেখক সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন। এ সংঘের একজন কর্মী

ছিলেন বিষ্ণু দে। বিষ্ণু দের কবিতা পড়লে বোঝা যায়, লোকসংস্কৃতির প্রতি তার মনের একটা টান ছিল। সে জন্য আদিবাসীদের জীবন সম্পর্কে তার গভীর আগ্রহ ছিল। একবার বেশ কিছুদিন সাঁওতালদের এলাকায় ছিলেন তিনি। সাঁওতাল ও ছত্রিশগড়িদের নিয়ে কবিতাও লিখেছেন। বিষ্ণু দে বিখ্যাত ইংরেজ কবি টিএস এলিয়টের দারুণ ভক্ত ছিলেন। তিনি এলিয়টের কবিতা অনুবাদসহ বেশ কয়েকজন আধুনিক ইউরোপীয় কবির কবিতাও অনুবাদ করেছেন। বিখ্যাত বাঙালি চিত্রশিল্প যামিনী রায়ের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল এবং যামিনী রায়ের চিত্র নিয়ে তিনি ইংরেজি ও বাংলায় বই লিখেছেন। তিনি একজন মননশীল চিত্রসমালোচক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্প ও ভারতীয় চিত্রকলা নিয়ে তার ইংরেজি বই আছে।খ্যাতনামা কবি বিষ্ণু দে ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সতীর্থ এবং চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের বন্ধু। যামিনী রায়ের অনুপ্রেরণায়ই তিনি শিল্প-সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বেশ কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। Art of Jamini Ray (১৯৪৪), 'The paintings of Rabindranath Tagore' (১৯৫৮), 'India and Modern Art' (১৯৫৯) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর এ উদ্যোগের ফল।বিষ্ণু দে একজন দক্ষ কবি ছিলেন। শব্দে ও ছন্দে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি। তার কবিতা পড়লে বোঝা যায়, পুরনো সাহিত্য তার বেশ পড়া ছিল। আধুনিক ইউরোপীয় কবিতার সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল নিবিড়। বিষ্ণু দের কবিতার বইয়ের সংখ্যা বিশের অধিক। কবিতার জন্য তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৫৯ সালে বিষ্ণু দে'কে কবি-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সাহিত্য কৃতির জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৬), নেহেরু স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬৭) ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭১) লাভ করেন। তিনি 'রুশতী পঞ্চশতী'র জন্য 'সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার' পেয়েছেন। ক্যালকাটা গ্রুপ সেন্টারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি, প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। শুধু রাজনীতির কবিতা নয়, শুধু দেশ ও কালের কবিতা নয় – তাঁর কবিতা তো ব্যক্তিরও কবিতা – প্রেমের কবিতা, প্রকৃতির কবিতা। তবে এককভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সবার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সবাই। কখনও

ব্যক্তিগত কবিতাই স্পর্শ করে নৈর্ব্যক্তিককে , কখনও-বা পুরাণ প্রতিমাতেই পেয়ে যাই ব্যক্তিগতের ইশারা। তা আমরা জেনেছিলাম ‘ওফেলিয়া’ বা ‘ক্রেসিডা’ লেখার সময় থেকেই। ‘ঘোড়সওয়ার’কে যৌন-আকাঙ্ক্ষার রূপক বলা হয়েছিল তা তো আমরা জানি, সে-সময়েই তার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে একজন ইংরেজ বিদগ্ধ পাঠকের মনে হয়েছিল, ঘোড়সওয়ার বিপ্লবের বার্তাবহ। কয়েকদিন আগে শুনলাম আজকের কোনো পাঠক প্রশ্ন তুলেছেন, প্রেমের কবিতাই-বা নয় কেন? ‘চাই না তুমি বিনা শান্তিও’ উচ্চারণ করতে-করতে একদা একজন মনে করেছিলেন তাঁর সঙ্গিনীকে শোনাবার যোগ্য এই গান – তিনিও সে-সময়েই কি টের পাননি ভবিষ্যতের জন্য একটা বড়ো স্বপ্নের ইশারা আছে এই শব্দগুলির আড়ালে? তা না হলে শেষ হবে কেন কবিতাটি এইভাবে?- ‘তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই / জীবনে তার আর, সেই হীরার।’ প্রেমের সমুদ্রে ‘পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ’ খুঁজতে-খুঁজতে যদি বলা যায় :‘আমার মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি /বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,/ দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে ...’ সেই দামিনীই তো তাঁর কবিতার স্বপ্নসম্ভব। তাই তো এর অনেকদিন পরেও তাঁর কণ্ঠে শুনতে পাই, ‘বহুদিন দেখেছে সে, দেখে শুনে মেটে কি এ-সাধ? / বহুদিন দেখে-দেখে হয়ে গেল মরমী সাধক।’ এরকমই যে-কবিতাগুলি ঘরোয়া উচ্চারণে দৈনন্দিনকে স্পর্শ করে, তা চকিতে ছুঁয়ে যায় একটা বড়ো অভীপ্সাকে, পৌঁছে দেয় ঊর্মিল স্বপ্নবীজের জগতে। এক কিশোরীর লঘুলাবণ্যের ছোটাছুটি দেখতে-দেখতে, তার কোমল শরীরের তরল স্রোতের ছন্দ কবিকে নিয়ে যায় প্রতীক্ষার এই গাঢ় কিন্তু অনায়াস অনুভবে, ‘এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে / আমরা সবাই কেনই বা পার হব না / সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ?’ বিষ্ণু দে-র কবিতাই আজও স্বরে ও স্বরান্তরে উচ্চারণ করতে পারেন যদি কোনো পাঠক, বিষ্ণু দে বেঁচে থাকবেন, বেঁচে আছেন সেই পাঠের মধ্যেই।‘বিষ্ণু দে'র কবিসত্তা দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের সমগ্রতায়’ রচনায় অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান সরল ভাষায় লিখছেন, ‘ত্রিশ শতকের বাংলা কবিতার ধারায় বিষ্ণু দে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা দ্বান্দ্বিক চেতনার শিল্পী। এই দ্বন্দ্ব তার কবিচৈতন্য ও কবিজীবনে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। বাঙালির সহজিয়া কাব্যধারায় এ কারণেই তিনি ব্যতিক্রম।

পুরাণ ও ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন প্রবণতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যকে যে দিকচিহ্নহীন গতি ও চাঞ্চল্য দান করে, বিগত শতাব্দির তিরিশের দশকের কাব্যধারায় বিষ্ণু দের মধ্যেই তার সার্থক অঙ্গীকার লক্ষ্য করা যায়। যাত্রালগ্ন থেকেই তিনি বিচিত্র শিল্প ও দর্শনের তত্ত্বজ্ঞান শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টির অভিপ্রায় থেকে আত্মস্থ করেছিলেন। যে কারণে এলিয়টীয় পোড়ো জমির সাদৃশ্যসূচক 'চোরাবালি'র আগেই তিনি রচনা করেন 'উর্বশী' ও 'আর্টেমিসে'র কবিতাগুলো। ক্ষয়চেতনার আগেই চলেছিল সমন্বয়ের সাধনা- প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের, উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিসের এবং আরও অনেক নাম ও অনুষঙ্গ, যেগুলো গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় পুরাণের দীর্ঘ সময়-কালের লুপ্ত ইতিহাসের সত্য দৃষ্টান্ত। সভ্যতা ও ইতিহাসের বিবর্তন পরম্পরার অনুভবে উজ্জীবিত ব্যক্তিচৈতন্যে বর্তমানের ক্ষয়, নৈরাজ্য এবং শূন্যতার সর্বময় বিস্তারের মধ্যেও বিষ্ণু দে তার মানসদৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অতীত ও ভবিষ্যতের বিপুলা পটভূমিতে। এজন্যই কবির চৈতন্যের যুক্তি অন্বেষণা কেবল ব্যক্তিক আত্মবিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বাংলা কবিতার মুক্তি সম্ভাবনাদীপ্ত অরুণোদয়কেও নির্দেশ করে। তার সভ্যতার আদি উৎসলালিত স্মৃতিসত্তা স্বপ্নিল হয়ে ওঠে এ স্বপ্নরঙিন ভবিষ্যতের অনুধ্যানে। পরাক্রান্ত অন্ধকারের সাম্রাজ্যকে খুঁড়ে খুঁড়ে তিনি নির্মাণ করে চলেন আলোকিত সম্ভাবনার সিংহতোরণ- জ্ঞান, বৈদগ্ধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ সংহতির অন্তরালে লালন করেন রোমান্টিকতার অন্তর্গত স্রোতস্বিনী। উর্বশী ও আর্টেমিস বা চোরাবালি কাব্যে তার যে শিল্প নিরীক্ষা টিএস এলিয়টের ছত্রচ্ছায়ায় উপমা, প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্পের সাধর্ম্য সন্ধান করে, সেখানেও কবির অন্যতর অভিনিবেশ প্রযুক্ত হয় এলিয়টের যুগান্তকারী ঐতিহ্যভাবনার মধ্যে। তাই নেতিতে যাত্রা শুরু হলেও তার বিস্তার ঘটে মানস প্রগতিতে, আবিশ্ব চৈতন্যের নিগূঢ় অন্বিষ্ট কামনায়। কিন্তু এলিয়টের খণ্ড চৈতন্যের একাগ্র উপলব্ধিকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। তার কাম্য ছিল অখণ্ড চৈতন্যের সার্বিক মুক্তি।'সমালোচক অধ্যাপক দীপ্তি ত্রিপাঠির যথার্থই বলছেন, তাঁর কথা দিয়েই শেষ করছি- পদধ্বনিতে বিষ্ণু দে অর্জুনের প্রতীকে আসন্ন বিপ্লবের সম্মুখীন বুর্জোয়ার ক্লৈব্যের ছবি এঁকেছেন। পদধ্বনি এখানে তাই শোষিত সমষ্টির

সামাজিক বিপ্লবেরই পদধ্বনি।একথা বলা অসঙ্গত হয় না যে, বিষ্ণু দে দীক্ষিত কবি যেমন স্বাদেশিকতায় তেমনি আন্তর্জাতিকতায়। বিষয়ের ব্যাপকতায়, নানা ভাষ্যে এবং একাধিক প্রতীকে। তাঁর কবিতায় মানবিক প্রাণের স্পন্দন প্রভাবসঞ্চারী পাশাপাশি দেশজাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষ মানুষের জয়গানে একাত্ম। মার্কসীয় দর্শনে প্রভাবিত হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন সবার ওপরে মানুষ সত্য। যে কারণে ঈশ্বর ভাবনাও তার কবিতার মর্মমূলে সঘন। জীবনকে সত্য করে তুলতে তাঁর যাত্রা অবিশ্রাম ভাঙনের সাগর সঙ্গমে। তবে ভাষাগত সারল্য সংকটে তাঁর কাব্যপ্রাসাদ সাধারণ পাঠকে ব্যাপক সমাদৃত নয়। কিন্তু মনোযোগী ও নির্বিচারী পাঠক কবি চৈতন্যের মেলবন্ধনে। তাঁর বিচ্ছিন্নতা ভৌগোলিক অবস্থানগত এবং ভাষা, পেশাও নেপথ্য কারণ। বুদ্ধদেব বসুও বিচ্ছিন্নতাবাদী। তাঁর বিচ্ছিন্নতা মতাদর্শগত এবং স্বভাবগত। তাঁর নিজের মতে, ছোটবেলা থেকে তোতলা হওয়া এবং উচ্চতায় খাটো হওয়ার কারণে। বিষ্ণু দে'র মতে ব্যক্তিগত অহঙ্কারের কারণে। বুদ্ধদেবের নাটকগুলোয় বিষ্ণু দে'র মতের সত্যতা পাওয়া যায়। বিষ্ণু দে'র কবিতা ভালোভাবে না পড়ে, শুধু অন্যের ভাষ্য এবং মন্তব্যধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ পড়লে মনে হবে বিষ্ণু দে বুঝি সাম্যবাদী সমাজের গণঐক্যের কবি। কিন্তু বিষয়টা তা নয়। কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা জনতামুখী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও তাই। যদিও সুকান্তে আবেগ আছে, সুভাষে আছে পার্টির পক্ষে লোকদেখানো, পাল্লা ভারী করার কৃত্রিমতা। কিন্তু বিষ্ণু দে'র কবিতায় সেই কৃত্রিমতা নেই। তিনি অবস্থাপন্ন পরিবারের বাম চিন্তাবিদ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে নিজের শ্রেণীগত অবস্থান থেকে নেমে এসে কুবের-গণেশদের শ্রেণীতে অবস্থান নিয়ে লিখেছেন। তাঁর মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না; ছিল যথেষ্ট আন্তরিকতা। সেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাত্ত্বিক ঝগড়াঝাঁটি করে বিষ্ণু দে সমকালে নিজের 'সাহিত্যপত্র' এবং বন্ধুর 'পরিচয়'-এর শক্তিতে কিছুটা বিজয়ের আনন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু আজকে বিষ্ণু দে'র মৃত্যুর সায়ত্রিশ বছর পরে একজন পাঠক হিসেবে আমার কাছে মনে হয়, বিষ্ণু দে আসলে জেতেননি। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অল্পায়ুর জীবনের শেষের দিকে যথেষ্ট ভাববাদী হয়ে পড়েছিলেন এবং

শ্যামাসাধনা করেছেন; এটাকে অসুস্থতাজনিত বিকার ধরে নিয়েই বলতে পারি জনগণের প্রতি, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির তত্ত্বে মানিকই আন্তরিক। বিষ্ণু দে'র মার্কসীয় চেতনা কৃত্রিম না হলেও বিলাসিতাপূর্ণ। এ নিয়ে তাঁকে মাথার ওপরের জ্বলন্ত রবি থেকে শুরু করে অনেক তরুণ এমনকি মরণোত্তর পাঠক-সমালোচকেরও কথা বলার সুযোগ হয়েছে। 'নিরুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'তুমি' কবিতায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে'কে খোঁচা দিয়েছিলেন,

শুঁটকি মাছের যারা রাঁধুনিক
হয় তো সে দলে তুমি আধুনিক।
তব নাসিকার গুণ কী যে তা,
বাসি দুর্গন্ধের বিজেতা
সেটা প্ররিটেরিটের লক্ষণ,
বুর্জোয়া গর্বের মোক্ষণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন সেই পত্রিকার সম্পাদক। তিনি 'নিরুক্ত' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় লেখেন, "কিন্তু এই অর্থহীন শব্দসমষ্টি যদি নতুন আঙ্গিকের নিদর্শন হয় তাহলে 'ক্রস ওয়ার্ড পাজল্' শ্রেষ্ঠ কবিতা। দুটো 'লাল' বুলি কপচান যদি বিপ্লবী কাব্য হয়, তাহলে তোতাপাখীর কৃষ্ণনামও ভগবদ্গীতা।"

প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় সঞ্জয় ভট্টাচার্য লেখেন, "বাংলাদেশে আবার এমন কয়েকজন কবিও আছেন, যারা বামপন্থী নামে কীর্তিত অথচ যাদের কবিতার অর্থ 'বিদগ্ধ' জনেরও বিদ্যা-বুদ্ধির অগোচর। যে আদর্শ বামপন্থায় প্রেরণা দেয়, তাতে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকমাত্র সংশ্লিষ্ট নয়, জনগণই তা লক্ষ্য— বামপন্থী রচনা তাই জনগণের অগম্য হয়ে উঠলে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকে না। দুর্বোধ্যতা আর বামপন্থা বিরোধাত্মক কথা।" অজিত দত্ত 'বদ্যিনাথও পদ্য লেখে' নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে'কে নিয়ে। পরিমল রায় লেখেন,

উদিনবাবুর কঠিন পদ্যের
জুটলো এসে অনেক খদ্দের।

বুদ্ধদেব বসু চল্লিশের দশকে এসে প্রগতি লেখক সংঘের 'ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্য' আন্দোলন থেকে সরে যাওয়ার কারণে তার সাথে বামপন্থী লেখকদের দূরত্ব রচিত হয়। এর পরেই সম্ভবত বিষ্ণু দে আর বুদ্ধদেবের 'কবিতা'য় লেখেন নাই। নিজেই সম্পাদনা করেন 'সাহিত্যপত্র'।বিশ শতকের বাংলা কবিতার ধারায় বিষ্ণু দে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা দ্বান্দ্বিক চেতনার শিল্পী। এই দ্বন্দ্ব তাঁর কবিচৈতন্য ও কবিজীবনে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। বাঙালির সহজিয়া কাব্যধারায় এ-কারণেই তিনি ব্যতিক্রম। পুরাণ ও ঐতিহ্যের পুনর্মূল্যায়ন-প্রবণতা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় সাহিত্যকে যে দিক্-চিহ্নহীন গতি ও চাঞ্চল্য দান করে, বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকের কাব্যধারায় বিষ্ণুদের মধ্যেই তার সার্থক অঙ্গীকার লক্ষ করা যায়। যাত্রালগ্ন থেকেই তিনি বিচিত্র শিল্প ও দর্শনের তত্ত্বজ্ঞান শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টির অভিপ্রায় থেকে আত্মস্থ করেছিলেন। যে-কারণে এলিয়টীয় পোড়ো জমির সাদৃশ্যসূচক চোরাবালি'র আগেই তিনি রচনা করেন 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'র কবিতাসমূহ। ক্ষয়চেতনার আগেই চলেছিল সমন্বয়ের সাধনা— প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের, উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিসের এবং আরও অনেক নাম ও অনুষঙ্গ, যেগুলো গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় পুরাণের দীর্ঘ সময়-কালের লুপ্ত ইতিহাসের সত্য-দৃষ্টান্ত।সভ্যতা ও ইতিহাসের বিবর্তন-পরম্পরার অনুভবে উজ্জীবিত ব্যক্তিচৈতন্যে বর্তমানের ক্ষয়, নৈরাজ্য এবং শূন্যতার সর্বময় বিস্তারের মধ্যেও বিষ্ণু দে তাঁর মানসদৃষ্টি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন অতীত ও ভবিষ্যতের বিপুলা পটভূমিতে। এজন্যেই কবির চৈতন্যের যুক্তি অন্বেষণা কেবল ব্যক্তিক আত্মবিস্তারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বাংলা কবিতার মুক্তিসম্ভাবনাদীপ্ত অরুণোদয়কেও নির্দেশ করে। তাঁর সভ্যতার আদি উল্লাসিত স্মৃতিসত্তা স্বপ্নিল হয়ে ওঠে এ স্বপ্নরঙিন ভবিষ্যতের অনুধ্যানে। পরাক্রান্ত অন্ধকারের সাম্রাজ্যকে খুঁড়ে খুঁড়ে তিনি নির্মাণ করে চলেন আলোকিত সম্ভাবনার সিংহতোরণ—জ্ঞান, বৈদগ্ধ্য ও যুক্তিসিদ্ধ সংহতির অন্তরালে লালন করেন রোমান্টিকতার অর্ন্তগত স্রোতস্বিনী। উর্বশী ও আর্টেমিস, বা 'চোরাবালি কাব্যে' তাঁর যে শিল্পনিরীক্ষা টিএস এলিয়টের ছত্রছায়ায় উপমা, প্রতীক, রূপক, ও চিত্রকল্পের সাধর্ম্য সন্ধান করে, সেখানেও কবির অন্যতর অভিনিবেশ প্রযুক্ত হয় এলিয়টের যুগান্তকারী

ঐতিহ্যভাবনার মধ্যে। তাই নেতিতে যাত্রা শুরু হলেও তার বিস্তার ঘটে মানস-প্রগতিতে, আবিশ্ব চৈতন্যের নিগূঢ় অন্বিষ্ট কামনায়। কিন্তু এলিয়টের খণ্ড চৈতন্যের একাগ্র উপলব্ধিকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। তাঁর কাম্য ছিল অখণ্ড চৈতন্যের সার্বিক মুক্তি। বিষ্ণু দের এই জাগরণকামী কবি-স্বভাবের স্বীকৃতি মেলে তাঁর গদ্যভাষ্যে—যেখানে দ্বন্দ্বজটিল যুগচৈতন্যের অনিবার্য অভিক্ষেপ সত্ত্বেও শিল্প-অস্তিত্বের দ্বন্দ্বোত্তরণ ও মীমাংসার প্রশ্নে তিনি আস্থাশীল : 'নেতিতে আরম্ভ হতে পারে এই মানস-প্রগতি। তারপরে মিনারবাসীর ভূতলে অবতরণ। মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে ঐ চৈতন্য ঐ বোধ।... জীবনের প্রত্যক্ষে আর সর্বসংস্কৃতিগত পরোক্ষের দ্বন্দ্ব থেকে মাটিতে এসে মেশে প্রচণ্ড পলায়নীতে। তাই প্রয়োজন শিল্পীর অপক্ষপাত, পিকাসোর মতো নৈর্ব্যক্তিকতার সিদ্ধান্তে যাতে করে দ্বন্দ্বটা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে । ... আর নেতি নেতি ধ্বনিতে প্রত্যক্ষের অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।' ('বাংলা সাহিত্যে প্রগতি', সাহিত্যের ভবিষ্যত্)।একদিকে এলিয়টের কাব্যবিষয় ও প্রকাশরীতির প্রতি অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ, অন্যদিকে বস্তুবাদী বিশ্বদৃষ্টিলব্ধ মানস প্রক্রিয়া—এই দ্বৈতের মধ্যবিন্দুতে অবস্থিত তাঁর চৈতন্যের স্বভাবগত আত্মমুক্তির অভিপ্রায়; এভাবেই বিষ্ণুদের কবি-চৈতন্য এত গভীরভাবে আন্দোলিত ও তরঙ্গিত যে, তাঁর মৌল কাব্যস্বভাব একটা সার্বক্ষণিক অস্থিরতা এবং অনিবার্য দ্বন্দ্বময়তায় আভাসিত। যার ফলে তার প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পৌরাণিক মিলন মোহনায় জাগ্রত, রবীন্দ্রপ্রভাব অতিক্রমী শিল্পচৈতন্য এক স্বপ্নবিলাসী রোমান্টিক মানসাভিসারে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু চেতনার যে বিশ্বগ্রাসী একাগ্রতায় তিনি এলিয়টীয় শিল্পদৃষ্টির মধ্যে সমকালীন নাগরিক মধ্যবিত্ত মন ও কবিতার মুক্তির সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। রবীন্দ্রনাথ নির্মিত আধুনিক বাংলা কবিতার প্রচলিত সংস্কার ও সংজ্ঞার্থকে ভেঙে সেখানে কেবল নৈরাশ্য এবং অবক্ষয় চেতনাকেই সংযোজিত করলেন না, একটা অনুসন্ধানী মানস-প্রসারণে ক্রমাগত অন্বেষণ করে চললেন উত্তরণের নিহিত শক্তিমত্তা ও সম্ভাবনাকে। এই মানদণ্ডে গোড়া থেকেই বিষ্ণু দে বিপ্লবী কবি। উপনিবেশিত কলকাতার মধ্যবিত্তের সার্ধ শতাব্দী তাঁর প্রায় শৈশবেই অতিক্রান্ত হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে। আর কৈশোর

যুদ্ধোত্তর ক্ষতজর্জর জটিল সমাজ, রাজনীতি আর ভাব ও তত্ত্বের আন্দোলন-আলোড়নে অস্থির হয়ে উঠেছে।যে বৈচিত্র্যপাগল মানস-প্রবণতা, বৈদগ্ধ্য ও প্রবল ব্যক্তিত্ববোধ কোনো শিল্পীর চৈতন্যকে সমগ্রতা সন্ধানী ও অনুপুঙ্খচারী করে তোলে, বিষ্ণু দের মানসকাঠামোর মৌল চারিত্র সেখানেই নিহিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র উৎসধারায় গোড়া থেকেই লালিত হয়েছে তাঁর মানস ও বিশ্বদৃষ্টি। মননশীলতার অনিবার্য পদবিক্ষেপে তাঁর অন্তর্গত রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি ক্লাসিক বীজমন্ত্রে সংহত ভিত্তিরূপ অর্জন করে। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐকান্তিক সম্বন্ধ স্থাপনে কবির যে বুদ্ধিদীপ্ত প্রয়াস, প্রতীক, রূপক ও চিত্রকল্প নির্মাণের প্রথারহিত ঐশ্বর্য—সেখানে চেতনার তরঙ্গিত উৎসারণ পাঠকের গভীরতর অভিনিবেশ দাবি করে। সেজন্য দেখা যায় , ধ্রুপদ ঐতিহ্যের রহস্যলোক থেকে তিনি যে যুগান্তকারী কাব্যিক উপাদান আহরণ করেন, সেখানেও তার স্বপ্নবিলাসী রোমান্টিক চিত্তবৃত্তিই মুখ্য হয়ে ওঠে। এবং এই ব্যতিক্রমী ও স্ব-স্বভাবী অনুধ্যানের ফলে এলিয়টীয় যুদ্ধক্ষত, অবক্ষয়তাড়িত আবেগের অঙ্গীকার সত্ত্বেও আত্মগত ও শৈল্পিক উত্তরণের নতুন উৎস সন্ধানে গোড়াতেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তিনি। চোরাবালি-উত্তর পর্যায়ে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তায় উদ্বুদ্ধ, বাংলার আবহমান লোকজীবন ও লোক-ঐতিহ্যস্নাত এবং রাবীন্দ্রিক উত্তরাধিকারবোধে উজ্জীবিত বিষ্ণু দে চৈতন্যকে বিস্তৃত করে দেন কবিতার বিষয় ও প্রকরণের বিচিত্র ধারায়।বিষ্ণু দে-র কবিতার আদি-অন্তব্যাপী মনস্তাতিক জঙ্গম ব্যবহার বাংলা কবিতার ধারায় তাঁর বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। তবে তাঁর রূপক ব্যবহারের ধরন সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। সময় ও সমাজের ক্ষয়, ধ্বংস ও দ্বন্দ্বময় বিকাশের সমান্তরালে তাঁর অন্তর্গত রক্তক্ষরণও এই রূপক-ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। এবং পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে পরিক্রমণ বিষ্ণু দের আত্ম-পরিক্রমণকে অনেকটা নিয়ন্ত্রিত ও বিচারশীল পর্যায়ে উন্নীত করেছে। অরুণ সেনের বিবেচনাকে এ-সূত্রেই অনিবার্য মনে হয় আমার কাছে। ‘উর্বশী ও আর্টেমিস যেমন অপরিণত তারুণ্যের ও সঙ্কটসঙ্কুল ব্যক্তিত্বের কাব্য, তেমনি আবার এখানেই ইশারা পাওয়া যায় কীভাবে যৌবনারম্ভের এই স্তরকে তিনি পার হয়ে যাচ্ছেন, পরিণতি অর্জন করে

চলেছেন, বলা যায় এমন সব চাবি খুঁজে নিচ্ছেন, যা নিয়ে যেতে পারে কাব্য-অকাঙ্ক্ষার অন্য প্রকোষ্ঠে।' আর এই বিচারেও উর্বশী ও আর্টেমিস বিষ্ণু দে-র 'ভেতরকার সংগ্রাম ও বিকাশের ইতিহাস' হয়ে ওঠে। আর ইংরেজি সাহিত্যের এমএ শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায়ই চোরাবালি-র অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন বিষ্ণু দে। কিন্তু এ পর্যায়েই যেন বয়সের চেয়ে বেশি আত্মসচেতন, পরিণত ও প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেছে তাঁর মনের জগত্। মননবিহারের কারণে গোড়া থেকেই এসে গেছে নৈর্ব্যক্তিকতা, যা কবির দীর্ঘ সমাজ, ইতিহাস ও আত্ম-পরিক্রমার দ্বান্দ্বিক সমীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। যে 'জঙ্গম সমীকরণে'র কথা অনেক পরে বলেছেন কবি, তা-ও শুরু হয়ে গেছে 'চোরাবালি-পূর্বলেখ'-এর পর্যায়েই। এরই পরিণত প্রকাশ শুরু হলো 'সৃতি সত্তা ভবিষ্যত' থেকে, মনস্তাত্ত্বিক জগতেও ধ্বনিত হতে থাকে মহাসংগ্রামের অপরাজেয় কণ্ঠস্বর-

তোমরা নবিন,এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ।
তোমরা নবিন,আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা?
বিশ-বাইশের ইতিহাস
করেছে কি কালের গণনা
তোমাদের সদ্য সুখে মানা?.....
(স্মৃতি সত্তা ভবিস্যত)

মনস্তাত্ত্বিক, ও ইতিহাসচেতনার সঙ্গে সমীকৃত হলো সমকালীন বিশ্বজনীন সংগ্রামের চেতনা, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টি এবং উভয়ের সঙ্গে বিশ্বের গতিময় আন্তরক্রিয়া। বিষ্ণু দের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীমনের পরিকল্পিত পন্থায়ই সৃজিত হয়েছে এই গতির ব্যাকরণ। ইতিহাস অন্বেষণের সূত্রে ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থান শনাক্তিকরণও এই বহুবিভঙ্গ

সমাজবাস্তবতায় তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বিষ্ণু দের প্রগতিচেতন মন তটসন্ধানী। কিন্তু এই অনুসন্ধানও চূড়ান্ত সমীকরণে উপনীত হতে ব্যর্থ হয় বার বার। কারণ, সমাজ ও রাষ্ট্রের দ্বৈরথ, ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বৈরথ, এবং ব্যক্তি ও তত্ত্বের দ্বৈরথ। মানবসভ্যতার স্বপ্ন একজন ব্যক্তির অনুভবের সাথে একীভূত হয়ে যায়। আর অন্ধকার কামনার পুনরাবৃত্তিতে ('সেই অন্ধকার চাই') ইতিহসের বেদনাদীর্ণস্বরূপ উন্মোচন প্রত্যাশায় (ইতিহাসের ট্রাজিক উল্লাসে) তাঁর চৈতন্য বারবার আলেড়িত ও স্পন্দিত হতে থাকে। অতঃপর ক্ষত-বিক্ষত মধ্যবিত্ত মানসের উজ্জীবন প্রয়াসী চেতনাস্রোতে অনুরণিত হয় কাঙ্ক্ষিত উত্তরণের বরাভয় বাণী -

দ্বন্দ্বিক বটে তাই সর্বদা উত্তরণ
মননে অস্থিমজ্জায় শ্বাসবায়ুতে।.....
জানি যে শরীর মনে ইতি-নেতি স্মরণ
আজন্ম চায় জঙ্গম সমীকরণ
(জঙ্গম সমীকরণ, 'ঈশাবাস্য দিবানিশা')

কিন্তু মনন ও তত্ত্বাবেগচালিত আদর্শ সন্ধানের এই কাব্যভূগোলে এক পরিপূর্ণ শিল্পজগতের আলোকরশ্মি ক্রমাগত প্রকাশমান হতে থাকে। বিষ্ণু দের আত্মপরিক্রমার পথে একদা অতিক্রান্ত রবীন্দ্রবিশ্ব ১৯৪১ থেকেই অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয় যে, শিল্পযাত্রায় আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও বিশ্বসন্ধানের যে আকুলতা লক্ষ করি, সেখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুতত্ত্বের বিবর্তনশীলতা অপেক্ষা রূপান্তরের চারিত্র্যধর্মই বেশি ক্রিয়াশীল। অবশ্য বস্তুধর্ম ও মানবস্বভাব কোনোক্রমেই অভিন্ন ব্যাকরণনিয়ন্ত্রিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কৃতি ও কীর্তি রূপান্তরের শৃঙ্খলায়ই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে। বিষ্ণু দে-র মধ্যেও এর সাধর্ম্য সুস্পষ্ট। মননাবেগের সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংযুক্তির মধ্যেই তিনি সন্ধান করেন আত্মমুক্তি ও শিল্পমীমাংসার অপার উৎস। এবং পরিণামে রাবীন্দ্রিক জীবনবোধের আনন্দময় পরিপূর্ণতার মধ্যেই তিনি খুঁজে পান চৈতন্যমুক্তির পরম আশ্রয়। মরুচারী 'ঘোড়সওয়ার' রবীন্দ্রনাথের পারমার্থিক চেতনার অন্তরঙ্গ উপলব্ধি থেকেই যেন উচ্চারণ করেন, '—মরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে

শূন্যে, উড়াও, হে প্রবল প্রাণ!' (আমার চেনা গাছ ক'টি, 'আমার হৃদয়ে বাঁচো', ১৯৮১)

এভাবেই মননশীল তত্ত্বনিষ্ঠ ও বুদ্ধিবাদী বিষ্ণু দে প্রত্যাবর্তন করেন হৃদয়বৃত্তির

সংবেদনঘন পটভূমিতে—যেখানে 'চিরসুন্দরের দূতী' আনন্দের নিত্যনৈমত্তিক

উপহারসামগ্রী নিয়ে কবির আপন প্রাঙ্গণে আর্বিভূত,

চিরসুন্দরের দূতী,

আপন প্রাঙ্গণে এলে অসতর্ক আবির্ভাবে,

আমার চোখের হীরা

হৃদয়ের মর্মস্থলে জ্বলে তাই যেন সাক্ষাত্ প্রস্তাবে

মূর্তি ধরে, মৃদঙ্গ মন্দিরা

বাজাও অজ্ঞাতে নিজে আমারই আকুতি।

তুমি তো জানো না তুমি আজীবন সুদীর্ঘ আয়ুতে

আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে

আনন্দেও নিত্যনৈমিত্তিক আমারও প্রস্তুতি

(আমার হৃদয়ে বাঁচো মননে স্নায়ুতে, ঐ)

বিষ্ণুদের সুদীর্ঘ কাব্যসাধনা একটা শূন্যতা থেকে পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকশিত।

চৈতন্যময় বিশ্বভ্রমণের উন্মোচন, বিবর্তন ও বিস্তারে পথে পথে তাঁর যে শত

ক্ষতচিহ্নজর্জর ও দ্বন্দ্বময় মানসিক রক্তপাত ও উত্তরণের সূত্র আবিষ্কার প্রচেষ্টা—

তিরিশের কোনো কবির মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে না।

১২.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- বিষ্ণু দের জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

বিষ্ণু দের জন্ম ১৯০৯ এবং মৃত্যু ১৯৮২।

২- বিষ্ণু দের উল্লেখ যোগ্য কাব্য গুলি কি?

তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাব্য- *উর্বশী ও আর্টেমিস* (১৯৩৩), *চোরাবালি* (১৯৩৭), *সাত ভাই চম্পা* (১৯৪৪), *রুচি ও প্রগতি* (১৯৪৬), *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*

(১৯৫২), *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার* (১৯৫৩), *তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ* (১৯৫৮), *স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত* (১৯৬৩), *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা* (১৯৬৬), *মাইকেল রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা* (১৯৬৭), *In the Sun and the Rain* (১৯৭২), *উত্তরে থাকো মৌন* (১৯৭৭), *সেকাল থেকে একাল* (১৯৮০), *আমার হৃদয়ে বাঁচো* (১৯৮১) ইত্যাদি।

৩- তিনি তাঁর সাহিত্য কৃতির জন্য কি কি পুরস্কার পান?

তিনি তাঁর সাহিত্য কৃতির জন্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬৬), নেহেরু স্মৃতি পুরস্কার (১৯৬৭), ও রাষ্ট্রীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৭১) লাভ করেন। তিনি 'রুশতী পঞ্চশতী'র জন্য 'সোভিয়েত ল্যান্ড পুরস্কার' পেয়েছেন।

১২.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- বিশ-ত্রিশ দশকের বাংলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি ভাবে বিষ্ণু দের কবিতায় ফুটে উঠেছে।

২- চল্লিশের প্রেক্ষাপটে কবি বিষ্ণু দের কাব্য ভূমিকা আলোচনা কর।

১২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

কাব্য গ্রন্থ- বিষ্ণু দে,

করোক সাহিত্য পত্রিকা।

একক-১৩ অমিয় চক্রবর্তী ও আধুনিক কবিতা

বিন্যাস ক্রম

১৩.১ শিল্পীত কাব্যিক প্রকাশে অমিয় চক্রবর্তী

১৩.২ সঙ্গতি, বৃষ্টি, মাটি কবিতার সারাংশ ও কবিতায় প্রতীকবাদ এবং ছন্দের ব্যবহার

১৩.২.১ প্রতীকবাদ।

১৩.২.২ ছন্দ

১৩.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১৩.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১৩.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১ শিল্পীত কাব্যিক প্রকাশে অমিয় চক্রবর্তী

প্রথম আধুনিক বাংলা কবিতা পাওয়া যায় মাইকেলের কাছ থেকেই। তাকে বেশিরভাগ বোদ্ধাই 'আধুনিক বাংলা কবিতার জনক'বলেছেন। তিনি 'মেঘনাদবধ' মহাকাব্য এবং চতুর্দশপদী কবিতা লিখে বিখ্যাত হন। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করেন মহাকাব্য, সনেট ও মনোনাট্যের। চৌদ্দ মাত্রার পয়ারে আট-ছয়ের চাল ভেঙে দেন এবং আঠারো মাত্রার মহাপয়ার রচনা করেন। যদিও অনেক বিশ্লেষক, শামসুর রাহমানকে আধুনিক বাংলা কবিতার রাজপুত্তুর হিসেবে আখ্যা দেন। আবার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বলা হয় যুগসন্ধিকালের কবি। তিনি মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সংযোগ-ঘটিয়েছেন। একই ধরনের বিশ্লেষণ রয়েছে অমিয় চক্রবর্তীকে নিয়ে। ত্রিশের প্রধান পাঁচ কবির অন্যরা

হলেন অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তখনকার সময়ে তারা আধুনিক বাংলা কবিতায় 'পঞ্চ পাণ্ডব' হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। ১৯৩০-এর দশকে আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রভাবশালী ভূমিকা রাখেন তারা। এর মধ্যে অন্যতম ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী। ত্রিশের কবিরাই মূলত আধুনিক কবিতার পুরোধা। অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক কবি।তবে আধুনিক কবি কিংবা কবিতা, এই রচনার মুখ্য বিষয় নয়। অধিকাংশ খ্যাতনামা কবির সঙ্গে একটি মৌলিক পার্থক্য নিয়েই মূলত আলোচনা। তা হলো, উপমার ব্যবহার ছাড়া নিজ শিল্পীক দক্ষতায় কবিতা রচনা। এ ক্ষেত্রে অমিয় চক্রবর্তী অন্য সবার থেকে আলাদা। শৈল্পিক ব্যবহারের পরিবর্তে তার কবিতায় এসেছে অভিনবত্ব।

জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, শৈল্পিক গুনেই অর্থ বহুল ছন্দ হয়ে ওঠে কবিতা। সেই প্রাচীন যুগের কালীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল বড় কবির রচনাতেই এ সত্য প্রমাণিত। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় ছিল শৈল্পিক উপমার ছড়াছড়ি। শৈল্পিক উপমার ছড়াছড়ি ছিল রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্দিনের কবিতাতেও। শৈল্পিক উপমা ছিল বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথের কবিতাতেও। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় শৈল্পিক উপমার উপস্থিতি অভাবিত রকমের কম। কোনো কোনো কাব্যে নেই বললেই চলে।কবিতা কেবল বক্তব্য বা বর্ণনা নয়, চিত্র অঙ্কনও। সব কবিই এই চিত্র অঙ্কন করেন। চিত্র অঙ্কনের অভিনবত্বই একজন কবির পান্ডিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে। আর এই চিত্র অঙ্কনে কবিতার যে নান্দনিক উপাচার সর্বাধিক কাজে লাগে তা হলো উপমা। উপমা মানে তুলনা। প্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা বিষয়ের অভিনব তুলনার মাধ্যমে একজন কবি তার উপভোগ্য চিত্রকল্পগুলো তুলে ধরেন পাঠকের সামনে। অন্য সবাই যেখানে ছবি আঁকার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই উপমার আশ্রয় নিয়েছেন অমিয় চক্রবর্তী সেখানে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে, বর্ণনার পর বর্ণনা শানিয়ে চিত্রের পর চিত্র অঙ্কন করেছেন। একটি বিষয় তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তা সর্বমহলে গৃহীত এবং নন্দিত হয়। কবির ছন্দ, উপমা, গাঁথুনির সার্থকতাও সেখানে। অমিয় চক্রবর্তীও সেখানে সফল। তার উপমাবিহীন কাব্য বাহবা পেয়েছে।যেমন-এক

মন্তব্য

মুঠো কাব্যের বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন কবিতায়।ছন্দ, শব্দ চয়ন, শব্দ ব্যবহারের ধাঁচ, পংক্তি গঠনের কায়দা সবকিছু মিলিয়ে তিনি ছিলেন বাঙালী কবিদের মধ্যে অনন্যসাধারণ। কঠিন সংস্কৃত শব্দও তার কবিতায় প্রবেশ করেছে অনায়াস অধিকারে।তার-কবিতায়,অবচেতনার-প্রক্ষেপ;পরিলক্ষিত-হয়।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাকে বলা হয় 'দৃষ্টির দর্শন'। সব কবিই দেখেন। এবং দেখাকেই তুলে ধরেন কাব্যিক চিত্রময়তায়। অমিয় চক্রবর্তীও যা দেখেছেন তা-ই তুলে ধরেছেন। এবং তার দেখার মধ্যে এক ধরনের দার্শনিক অভিজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে। না হলে তাকে দর্শন বলা হবে কেন? অমিয় চক্রবর্তীর পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশে ভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল। বিশ্বভ্রামণিক হিসেবে যা দেখেছেন, যা অনুভব করেছেন, অনেক ক্ষেত্রেই অবিকল তা তুলে ধরেছেন কবিতায়। যেমন- বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন নামক কবিতায় : থার্ডক্লাসের ট্রেনে যেতে জানলায় চাওয়া,/ধানের মাড়াই, কলা গাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।/মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা,/সুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা;/গঙ্গার ভরা জল; ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়াতীর.....

কালজ্ঞান কবিকে সমকালের কাছে যেমন মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে তেমনি উত্তরকালে করে তোলে স্মরণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর কালজ্ঞান স্পষ্ট এবং কবিতায় তার চিত্রায়ন করেছেন সহজে। তার কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব এবং তার প্রকাশের সহজ শৈলীর ভেতর ফুটে ওঠে তার মানবজাতির জন্য শুভবাদী চিন্তা।

অমিয় চক্রবর্তী কবিতা, বিচিত্রা, উত্তরসূরী, কবি ও কবিতা, পরিচয়, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে— কবিতা: খসড়া, এক মুঠো, মাটির দেয়াল, অভিজ্ঞান বসন্ত, দূরবাণী, পারাপার, পালাবদল, ঘরে ফেরার দিন, হারানো অর্কিড ও পুষ্পিত ইমেজ। গদ্য: চলো যাই, সাম্প্রতিক,পুরবাসী,পথ-অন্তহীন।

অমিয় চক্রবর্তী ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলিতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। তার পিতার নাম দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা অনিন্দিতা দেবী। পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী আসামে

গৌরীপুরএস্টেটের দেওয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং তার মা অনিন্দিতা দেবী ছিলেন সাহিত্যিক। যিনি 'বঙ্গনারী' ছদ্মনামে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করতেন। অনিন্দিতা দেবী সংস্কৃতে পারদর্শী ছিলেন বলেই চার সন্তানকে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন নিজেই। গৌরীপুরের সংস্কৃত টোল থেকে প্রখ্যাত পণ্ডিতকে তিনি নিযুক্ত করেছিলেন কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি প্রমুখের রচনা পাঠের সুবিধার্থে। পঁচিশ বছর বয়সে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য-সচিব হিসেবে যোগ দেন। এজন্য ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন তিনি। সাহিত্য সচিবের দায়িত্ব ছাড়াও পরে অবশ্য বিশ্বভারতীর সকল প্রকার কাজেই অমিয় চক্রবর্তীকে জড়িয়ে পড়তে হয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব হিসেবে কাজ করেন।

১৩.২ সঙ্গতি, বৃষ্টি, মাটি কবিতার সারাংশ ও কবিতায় প্রতীকবাদ এবং ছন্দের ব্যবহার

আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আধ্যাত্ম সংকট। কারণ একদিকে আধুনিকতার যুগলক্ষণ বলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে 'ভগবান এবং প্রথাগত নীতিধর্মে অবিশ্বাস', অন্যদিকে এ ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করার পরও কবিতায় বারবার ঈশচিন্তা, মৃত্যুচেতনা এবং এই দুয়ের প্রভাবে কবিমানসে শুরু হয় অধ্যাত্ম্য সংকট। অমিয় চক্রবর্তী আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র্য নাম। বুদ্ধদেব বসুর মতে সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতা, জীবনানন্দের দৃশ্যগন্ধময় নির্জনতা, বিষ্ণু দে'র মিতবাক শৈলী থেকে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার সুর, স্বর এবং শৈলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য কেবল নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ নয়, বিশ্বলোক এবং দেশজ বিষয়াবলির সংমিশ্রণের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

তার প্রথম কবিতার বই, 'উপহার' রবীন্দ্রসুরে সিক্ত হলেও দ্বিতীয় কাব্য 'খসড়া'

রবীন্দ্রমানসের প্রচ্ছন্ন ছোঁয়া সত্ত্বেও স্বতন্ত্র সুরের। এই কাব্যেই অমিয় চক্রবর্তীর আলাদা স্বর স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এবং তার মৌলিকত্ব প্রকাশ পায়। বুদ্ধির দীপ্তি ও দার্শনিকতা তার প্রধান অবলম্বন। প্রচলিত নিয়মের প্রতি উপেক্ষাসুলভ মনোভাব তার মজ্জাগত। এসব বিষয় তার দ্বিতীয় কাব্যের শব্দ চয়ন, শব্দ গঠন এবং প্রয়োগের কুশলায় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

বিশ্বব্যাপী মানুষের দুর্দশা, দুঃখ-কষ্ট দেখে একদিকে রবীন্দ্রনাথের মতে রোমান্টিক কবিরা আশার বাণী শুনিয়ে মানবজাতিকে সান্তনা দিচ্ছেন, অন্যদিকে এলিয়টের মতো আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক কবিরা যান্ত্রিক যুগের বিভীষিকার বর্ণনা দিয়ে মানুষকে সচেতন করে তুলছেন। নিত্য-অনিত্য ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে মানুষের চিন্তার রেখা সব সময় সমান্তরাল চলে না, সেখানে দেখা দেয়, চিন্তার বিপ্লব এবং বিপর্যয়। সফল বিপ্লবে মানুষ ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়, ব্যর্থতায় হয় বিচারের মুখোমুখি। ফলে একই ঘটনায় যে মানুষ সাফল্যের ফলে বীর খেতাব, পরাজয়ে পায় তীব্র নিন্দা এবং খলনায়কের গ্লানিকর কুখ্যাতি। অমিয় চক্রবর্তীর মানসগড়নে এই বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করেছে, কিন্তু তিনি সমসাময়িক বিষ্ণু দে, সুধীন দত্তের মতো কেবল হতাশা-বিচ্ছিন্নতার চিত্র আঁকায় মনোনিবেশ করেননি, মানবজাতিকে শুনিয়েছেন আশার বাণী। তার মাঙ্গলিক চিন্তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ‘সংগতি’, ‘বৃষ্টি’, ‘চিরদিন’, ‘রাত্রি’। এ কবিতাগুলোয় প্রবল আশাবাদী মাঙ্গলিক চিন্তায় আচ্ছন্ন একজন মানুষের দেখা মেলে। চিন্তার অধিকাংশ অঞ্চলজুড়ে আশা এবং আশ্বস্ততার সুর সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও ফুটে ওঠে। আধুনিক কালের নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যের প্রতি তার উপেক্ষা সুস্পষ্ট। চারদিকের যান্ত্রিক সমাজের রূঢ়তা, আশাভঙ্গের বেদনা তাকে স্পর্শ করে না তেমন, যতটা চেষ্টা ও সাধনা এবং মানুষের সাফল্য দেখে উচ্ছ্বসিত হন। ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষার ফল ইতিবাচক বলেই তার বিশ্বাস। এ ধরনের জীবনাদর্শ এবং বিশ্বাসের বিশ্বস্ত দলিল ‘সংগতি’। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিপুল অসঙ্গতি ও অব্যবস্থাপনার মধ্যেও কবি সমন্বয় ও প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখেন। খুব উচ্চকিত না হলেও ‘সংগতি’ কবিতায় দৃঢ়কণ্ঠে

ঘোষণা করেন'মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর/পোড়ো বাড়িটার/ঐ ভাঙা দরজাটা/মেলাবেন।'

'বৃষ্টি' নামে তার দুটি কবিতা রয়েছে।প্রথমটি হল-

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্ত পিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিরাষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ধনশ্যাম রোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারা জলে ॥
যাই ভিজে ঘাসে-ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে ॥
অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্যা বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥
মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে-
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজল ধারে ॥
রুচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্রমাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে-ঘাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর ॥

মন্তব্য

বৃষ্টি নামক দ্বিতীয় কবিতায় যেন একটু হতাশ বলেই মনে হলো তাকে-

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলাধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।

শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।

লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;

আকাশে বিদ্যুৎ জ্বলা বর্শা হানে

ইন্দ্রমেঘ;

কালো দিন গলির রাস্তায়।

কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝরঝর বুকে

অবারিত।

চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে

পরায় মুহূর্ত টিপ,

নিভে যায় চোখে

কম্পিত নগর শীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।

বিরাম স্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে

আবার ঘনায় জল।

বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া

খুজেঁও পাবে না যাকে বর্ষার অজ্রস জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া পৃথিবীর।

মত্তদিন স্ক্ষুব্ধক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার

অবিরহ

সেই সৃষ্টিক্ষণ

স্রোত: স্বর্ণা

মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা

প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়

এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।

ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।

কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়

গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল।

বারে বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে-ফিরে

ঘনমেঘলীন

কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে ॥

এই কবিতায় যখন বলেন, 'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'। কিন্তু এই হতাশা কেবল শুরুতে, কবিতার পুরো শরীরে ভিন্ন চিত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতার ভেতর মানুষের স্বপ্ন দেখার রকম পরিবর্তন হয়। সেখানে সুখস্বপ্ন দেখার পরিবর্তে মানুষ দেখা শুরু করে দুঃস্বপন। ঠিক ওই বিশেষ স্থবিরতা কিংবা তুমুল বিশৃঙ্খলার ভেতরও কোন কোন বিশেষ মুহূর্তে মানুষ আশাবাদী হয়ে ওঠে।

'বিনিময়' সর্বস্ব হারানো এক নৈসঙ্গের মনোবেদনার চিত্র। কিন্তু সে কেবল মনোজাগতিক বিষয়-আশয় হারানোর বেদনা নয়, সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জন মাটিকে শস্য শ্যামলা করার মধ্যে দিয়ে আত্মসম্মান বরণ করারও দৃশ্য দেখা যায় মাটি কবিতায়। যেমন-ধান করো ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি/ তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি। শব্দ ব্যবহারে তার নিচু এবং মৃদু কণ্ঠ যেমন চিত্তের দাঢ্য প্রকাশে আপস করে না, তেমনি চিত্রকল্প নির্মাণেও তিনি মাঙ্গলিক চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন না করলেও 'সাবেকি' কবিতায় অন্তমিল নিয়ে অনেকটা জবরদস্তিই করেছেন। যেমন গেলো/গুরুচরণ কামার, দোকানটা তার মামার/হাতুড়ি আর হাপর ধারের (জানা ছিলো আমার)'। মধ্যমিল ও অন্তমিলের আঘাতে কবিতা প্রায় গ্রামীণ

নববধূর মতো লজ্জায় আনত। ঘোমটা তুলে সংসারের আর কিছু দেখার বাসনা থাকলে চোখ মেলতে পারছে না, আর কিছু স্পর্শ করার সাধ থাকলেও জড়তার কারণে হাত নাড়ানোর ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছে ওই ঘোমটারূপী অন্তমিল।বাংলা কবিতার আধুনিকতার উৎসকালে আধুনিকদের জন্য বড় বাধা ছিলেন 'সম্মুখে পথ রুধি' রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রকাব্যের শৈলী ও সুরকে উপেক্ষা করে নতুন সুর সৃষ্টি করা অসাধ্য না হলেও সহজ ছিল না। বিশেষত যুগ রুচি এবং নতুন রুচির আবাহনে প্রথাগতদের বৈরিতায় আধুনিকতাবাদীদের মনে এক ধরনের বিষাদ ময়তার সময়। কিন্তু আধুনিকরা চিন্তা ও কল্পনায় স্বাধীন এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং বিশ্বলোকের সঙ্গে তাদের ভাবনার নিরন্তর বিনিময় প্রবহমান ছিল বলেই, আপন-আপন সাধনার জোরে তার নিজেদের সৃষ্টি তুলে ধরতে পেরেছিলেন। অমিয় চক্রবর্তী তাদেরই একজন। ফলে তার সামনে রবীন্দ্রনাথ বাধা না হয়ে আধ্যাত্মিকতা এবং মাঙ্গলিকা ভাবনার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিলেন। তার রুচি ঐতিহ্যচেতাকে সমর্থন করে এবং ইতিহাসের পাঠকে করে তোলে মর্যাদাপূর্ণ। তার উল্লেখযোগ্য কাব্যের নাম 'খসড়া', 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'মাটি', 'বৃষ্টি', 'পারাপার', 'পালাবদল', 'সংগতি' এবং 'হারানো অর্কিড'। কাব্যের নামকরণেই স্পষ্ট তার রুচি এবং মনীষা।

কালজ্ঞান কবিকে সমকালের কাছে যেমন মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে তেমনি উত্তরকালে করে তোলে স্মরণীয়। অমিয় চক্রবর্তীর কালজ্ঞান স্পষ্ট এবং কবিতায় তার চিত্রায়ন করেছেন সহজে। তার কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাব এবং তার প্রকাশের সহজ শৈলীর ভেতর ফুটে ওঠে তার মানবজাতির জন্য শুভবাদী চিন্তা। শেষ পর্যন্ত অমিয় চক্রবর্তী হতাশাবাদী নন, তার কবিতা হয়ে উঠেছে প্রত্যাশা এবং স্বপ্নচারণের বিচরণ ভূমি।তাঁর কাব্যে এই বিশেষ ছন্দ ও প্রতীক ব্যবহার কাব্য কে দিয়েছে তাঁর নিজের পরিচয়। এই প্রতীক ইতিহাস যেনে নেওয়া যাক।

১৩.২.১ প্রতীকবাদ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের চিত্র আন্দোলন, রাশিয়া ও বেলজিয়ামের কবিতা ও অন্যান্য শিল্প-সংস্কৃতির উৎস ছিল প্রতীকবাদ। ১৮৫৭ সালে শার্ল বোদলেয়ার তাঁর প্রথম প্রকাশনা 'লেচ ফ্লিয়ার্স ডু মাল' (দি ফ্লাওয়ার্স অব ইভিল) গ্রন্থের

মাধ্যমে ফ্রান্স সাহিত্যে এ ধারার রচনাশৈলী সৃষ্টি করেন। ওই গ্রন্থের কবিতাগুলো ছিল অবক্ষয় ও নান্দনিক কামজভাব সম্পর্কিত। বোদলেয়ার এডগার এলেন পো'র রচনাগুলোর ব্যাপক প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তাঁর অনেক রচনা ফ্রান্স ভাষায় অনুবাদ করেন। সেগুলো ব্যতিক্রমধর্মী আবেগ ও চিত্রের ওপর ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে প্রতীকবাদের নান্দনিকতাকে স্টেফেন মালার্মে ও পল ভারলেইন উচ্চমাত্রায় নিয়ে যান। ১৮৮০ সালের পর থেকে তাদের ধারাক্রম অনুসারে ওই প্রজন্মের অনেক লেখক এ তত্ত্বের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। প্রখ্যাত সমালোচক জিন মরিস শিল্প ও সাহিত্যে অবক্ষীয়মানের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্যে 'প্রতীকবাদ' শব্দটি আবিষ্কার করেন।বিশেষ করে প্রকৃতিবাদ, প্রকৃতবাদ ও ভাববাদ তাদের নিজস্ব কণ্টকতা, দীনতা এবং সাধারণ আদর্শভাবকে উপস্থাপন করার ফলে তাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রতীকবাদ আবির্ভূত হয়েছিল। এটা ছিল আধ্যাত্মিকতা, উদ্ভাবন ও কল্পনা শক্তির পক্ষে বড় ধরনের একটা প্রতিক্রিয়া। জুরিস কার্ল হোয়াইসম্যানের মতো কিছু কবি প্রতীকবাদী লেখক হওয়ার পূর্বে প্রকৃতিবাদী কবি ছিলেন। তাঁদের এই পরিবর্তন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। নিশ্চিত অবক্ষীয়মান প্রকৃতিবাদী আদর্শ যৌন আবেদন এবং নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের বিষয়কে উপস্থাপন করে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাদের ক্ষেত্রে এটা ছিল বায়রনিক রোমান্টিসিজম এবং বিশ্ব-শ্রান্তির মিশ্রণ বৈশিষ্ট্যের। রোমান্টিসিজমের পরে এবং প্রতীকবাদের অব্যবহিত পূর্বে ফ্রান্স সাহিত্যে পারনাসিয়ানিজম ধারার অগ্রবর্তী সাহিত্যিকদের সঙ্গে প্রতীকবাদের সম্পর্ক ছিল অনেক জটিল। তখন রহস্যময় ধর্মীয় ও দর্শনের ঐতিহ্যের কারণে এবং রুদ্ধভাবের প্রভাবের ফলে মুক্তভাবে পদ্য লেখাকে অনুমোদন দেয়া হয়। পারনাসিয়ানের স্পষ্টতা ও নৈব্যক্তিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে হারমিটিসিজম (রহস্যমূলক ধর্মীয় দর্শন) বুদ্ধিদীপ্ত এবং সুরেলা গুণ সম্পন্ন কবিতাকে ধরে রেখেছিল। প্রতীকবাদীরা তখন থিওপিল গুইটারের 'শিল্পের জন্য শিল্পকে নাড়া দেয়া'র আদর্শবাণীর প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু তারা পারনাসিজমের বিদ্রুপাত্মক বিচ্ছিন্নভাবের রূপ পরিবর্তন করে তা ধরে রেখেছিলেন।

আলপেনস্ লিমেরির সম্পাদিত কবিতা সংকলন 'লি পারনেচ কনটেমপোরেইন'-এ স্টেফেন মালার্মে এবং পল ভারলেইন তাদের প্রথম দিকের লেখা প্রকাশ করেছিলেন। পারনাসিয়াজমের নাম এসেছে ওই কবিতা সংকলন থেকে। কিন্তু আর্থার রিমবাউড পারনাসিয়ানদের প্রধান লেখক ফ্রান্স কুইস কোপিসহ ওই মতবাদের আরও কিছু বিশিষ্ট লেখকদের লেখা নিয়ে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছেন। শুধু তাই নয় তিনি তাদেরকে নিয়ে অশ্লীল অনুরক্তিমূলক রম্যরচনা প্রকাশ করেছিলেন। জোসেপিন পিলডেন নামে প্যারিসের একজন চিত্র ও সাহিত্য সমালোচক প্রতীকবাদের অতি স্পষ্ট প্রচারক ছিলেন। তিনি রহস্যময় ধর্ম দর্শনের ধারাবাহিক আলোচনাকে উপজীব্য করে 'সেলন ডি লা রোজ ক্রোইক্স' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৮০ সালের দিকে ছয় ধরনের শিল্প এবং চার ধরনের গানের ধারাবাহিকতা উপস্থাপন করে শিল্পীদের জন্য আধ্যাত্মিকতা, রহস্যময়তা এবং আদর্শবাদিতার কাজকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য 'দি সেলোন' ফাঁক সৃষ্টি করেছিল। বেশ কিছু সংখ্যক লেখক 'দি সেলোন'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতি থেকে জ্ঞান অর্জন, মানুষের কার্যকলাপ এবং বিশ্বের অন্যান্য ঘটমান প্রকৃত বিষয় তাদের বিশ্বাস থেকে বর্ণনা করা যাবে না। এখানে তারা আদিম আদর্শের সঙ্গে গুঢ় সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন। স্টেফেন মালার্মে তাঁর বন্ধু কাজালিসকে এক পত্রে লিখেছেন, 'কোন বিষয়কে ছবির মত করে তুলে না ধরে বাদামের মতো তার মধ্যে সৃষ্ট বস্তুকে তুলে ধরতে হবে'। চাপল্যের বড় স্থানকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে প্রতীকবাদী কবিদের ইচ্ছা ছিল গুস্তাভ কান এবং এজরা পাউন্ডের মতো কবিদের সুস্পষ্ট ও মুক্ত প্রবণতার কবিতা লেখার পদ্ধতিকে সহজীকরণ করা।প্রতীকবাদী কবিতায় বর্ণনার চেয়ে বরং প্রচেষ্টার আহ্বান এবং কবির আত্মার অবস্থা বুঝাতে সাংকেতিক চিত্রাবলি ব্যবহৃত হয়েছিল। জুলেস লাফোর্জ, পল ভেলিরি এবং আর্থার রিমবাউট প্রমুখ লেখকরা প্রতীকবাদী স্কুলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। টিএস ইলিয়ট তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এজরা পাউন্ড এবং ইলিয়ট উভয়ই চিত্রকল্পবাদ ধারাকে সম্মতি দান করেছিলেন। বোদলেয়ারের 'করেসপনডেনস' এবং রিমবাউটের 'ডোভিলেচ' কবিতায় উভয় লেখক

একই দর্শন ধারণার অনুসন্ধান করেছিলেন। রোমান্টিক কবিতায় প্রথমদিকে প্রতীক শব্দ ব্যবহার করা হতো। প্রতীকবাদীদের 'প্রতীক' রূপক বর্ণনার পরিবর্তে মনের নির্দিষ্ট অবস্থার অভীষ্টতা উপস্থাপন করতে বেশি আহ্বান করে।প্রতীকবাদের সারাংশ ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। খুব সম্ভবত পল ভারলেইনের মতো এত প্রভাবশালী আর কেউ ছিল না। ১৮৮৪ সালে তিনি 'পয়েটিস মাউডিস' পত্রিকায় ট্রিসটন করবির, আর্থার রিমবাউট, স্টেপেন মালার্মে, মারসিলিন ডেসবোডেস ও ভালমোর ইত্যাদি প্রখ্যাত প্রতিকবাদী ঘরানার কবিদের উপর ধারাবাহিকভাবে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, এসব লেখকদের প্রত্যেকে তাদের স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য এবং পথের ভিন্নতার কারণে এ যাবৎকালে উপেক্ষিত ও প্রতিভার অভিশাপ পেয়েছেন। ফলশ্রুতিতে এসব লেখকরা হারমিসিজমের স্বকীয় ধারার লেখাকে মোটেই অগ্রাহ্য করতে পারেন নাই। যার ফলে তারা সমকালিনতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তারা সমাজের অসঙ্গতির সঙ্গে জড়িত থেকে দুঃখজনক জীবন যাপন করেছেন এবং তাদের মধ্যে আত্মঘাতী প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। ভারলেইনের তত্ত্ব বোদলেয়ারের সাহিত্যকর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কবিদের ভূমিকা সম্পর্কে ভারলেইন পরোক্ষভাবে দুঃখবাদের নন্দন তাত্ত্বিক দার্শনিক আর্থার সোপেন হাওয়ারের লালিত আদর্শের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, 'চিত্রের উদ্দেশ্য হলো পৃথিবী থেকে ইচ্ছা শক্তির দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ীভাবে প্রত্যাখ্যান করা'। প্রতীকবাদী ঘরানার কবিদের অনুক্রম সোপেন হাওয়ারের নান্দনিক ভাবনার অনুষঙ্গের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছিল। তারা উভয়ই পৃথিবীর দ্বন্দ্ব এবং ইচ্ছা শক্তির চিন্তাশীল প্রবণতাকে অস্বীকার করে চিত্রকে বিবেচনায় এনেছেন। শিল্পসুলভতাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে প্রতীকবাদীরা ক্ষতিকর যৌন আবেদন শক্তির কল্পিত বিষয়, নশ্বরতার তীক্ষ ধারণা ও অন্য পৃথিবীর রহস্যময় আখ্যান বিষয় ব্যবহার করেছিল। আলবার্ট সামেইন এটাকে বলেছেন, 'জীবন্ত গাছের মধ্যে ফলের মৃত্যু'। স্টেপেন মালার্মে তাঁর 'লেচ ফেনেট্রিস' কবিতায় এসব বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন মৃত্যুপথযাত্রী হাসপাতালের শয্যায় তার শরীরের ব্যথা এবং বিষন্নতা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকুলতায় তার নিজের জানালা খুলে

যায় এবং এটা আবার নিদারুণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।১৮৮০ সালে ফ্রান্স সাহিত্য সমালোচনায় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিষিদ্ধ বিষয়ের ওপর স্বত অসংযত লেখকদেরকে বুঝাতে সৃজনচ্যুতি (ডিকেডেনস) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এ সৃজনচ্যুত লেখকদের সঙ্গে প্রতীকবাদী ধারার লেখকদের বারবার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। কিছু সংখ্যক লেখক ওই বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ লেখক এ তত্ত্ব পরিহার করেছিলেন। জিন মরিস তাঁর ইস্তিহারে ওই বিতর্কিত বিষয়ের সমর্থনে সাড়া দিয়েছিলেন। ১৮৮০ সালের শেষের দিকে 'সিমবলিজম' এবং 'ডিকেডেন্স' শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নান্দনিকতার ধারাকে এক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু তারা স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ওইসব শিল্পীই প্রতীকবাদী যারা চিন্তা ও আদর্শ ভাবধারাকে গুরুত্ব আরোপ করে। অন্যদিকে সৃজনচ্যুতি রুদ্ধধারা এবং বিষাদগ্রস্ত বিষয়বস্তুর অনুশীলন করে থাকে।প্রতীকবাদীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করেছিলেন। ওসব ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৮৮৬ সালে 'লা ভোগ' নামে প্রথম প্রতীকবাদী সাময়িকী আত্মপ্রকাশ করেছিল। ওই বছরের অক্টোবর মাসে জিন মরিস, গুস্তাভ কান এবং পল এডাম 'লা সিমবলিস্ট' নামে প্রতীকবাদী সাময়িকী প্রকাশ শুরু করেন। ১৮৯০ সালে আলফেড ভেলেটি 'মারকিউরি ডি ফ্রেন্স' নামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতীকবাদী সাময়িকী সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ওই সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও 'লা রিভিও ব্লাঞ্চ', 'লা প্লাম' এবং 'লা ওয়ালেন' নামের আরও কিছু প্রতীকবাদী সাহিত্য পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।যদিও সাহিত্যে প্রতীকবাদ ও চিত্রে প্রতীকবাদ স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকক্ষেত্রে মিল রয়েছে। চিত্রের ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রতীকবাদকে রহস্যময় প্রবণতার নবোন্মেষ হিসেবে রোমান্টিক ধারার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আত্মসচেতনভাবে বিষাদগ্রস্ত ও নিজস্ব ডিকেডেন্ট আন্দোলনের কাছাকাছি মনে হয়। প্রতীকবাদী শিল্প ও দৃশ্যমান শিল্পের মধ্যে অনেক বিসদৃশ শিল্পীগোষ্ঠী ছিল। তাদের মধ্যে ফ্রান্সের গুস্তাভ মারিও, অডিলন রেডন, অস্ট্রিয়ার গুস্তাভ ক্লিমট পোলান্ডের ঝাচেক মেকজুয়ুস্কি, নরওয়ের এডবাড মান্স এবং ডাচ-ইন্দোনেশিয়ান

জেন টুরুপ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার মিখাইল ব্রুবেল, নিকোলাস বরিস, ভিক্টর বরিসব মুসাটব, মিখাইল নেসটিরব, এলেনা গেরোখোবা, আমেরিকার মারটিয়াস সারবান, ইলিহু বিডার, মরিচ গ্রেইবস, মেক্সিকোর ফ্রিদা কাহলো এবং স্পেনের চিত্রশিল্পী রেমেডিওস ভারো প্রভৃতি প্রতীকবাদী চিত্রশিল্পী এবং ভাস্কররা সাহিত্যের প্রতীকবাদের চেয়ে চিত্রের প্রতীকবাদকে সারাবিশ্বে অনেকগুণ বেশি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। মূলধারার মূর্তিশিল্পে প্রতীকবাদীদের প্রতীক স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয় নাই। বরং ছিল অস্পষ্ট ও তীব্রভাবে ব্যক্তিগত দ্ব্যর্থবোধক প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমসাময়িক শিল্পের কিছু বিনির্মাণ ধারাকে প্রতীকবাদী চিত্র প্রভাবিত করেছিল।

প্রতীকবাদের স্থিতিশীলতা ও পৌরহিত্য উপন্যাসের চেয়ে কবিতার মাধ্যমে বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৮৪ সালে জোরিস কার্ল হেইন্সম্যানের ‘এ বিবোরস’ (নেচার অর এগেইন্সষ্ট দি গ্রেইন) উপন্যাসটি প্রতীকবাদের নান্দনিকতার অনেক বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এ উপন্যাসে প্রধান চরিত্রের অদ্ভুত ও ক্ষতিকর মনস্তাত্ত্বিক ধারাবাহিকতাকে খুব কমভাবে দেখানো হয়েছে। আইরিশ লেখক অস্কার ওয়াইল্ড ওই উপন্যাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গান ‘সেলম’ ও ‘দি পিকচার অব ডরিয়ন গ্রে’ (পূর্ব জার্মানির অন্ধকার যুগ এবং দর্শন সম্বন্ধীয় উপন্যাস) হাইন্সম্যানের উপন্যাসকে উপজীব্য করে লেখা হয়েছিল।

পল এডামস ছিলেন প্রতীকবাদ উপন্যাসের সবচেয়ে কার্যকর প্রতিনিধি। ১৮৮৬ সালে তিনি জিন মরিসের সঙ্গে যৌথভাবে ‘লেস ডিমোসেলস গোবার্ট’ উপন্যাসের মাধ্যমে প্রকৃতিবাদ ও প্রতীকবাদের মধ্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ পরিবৃত্তিমূলক রচনা করেছেন। খুব কম সংখ্যক প্রতীকবাদীরা এ ধরনের বিন্যাস সাধন করেছেন। এর মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন গুস্তাভ কান। ১৮৯৬ সালে তিনি ‘রি রুই পো’ নামে একটি উপন্যাস প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক ও গল্পকার জুলস বার্বির রূঢ়ভাবে নারী-পুরুষ বিদ্বেষী উপন্যাস ‘ডি ওয়ারিভিলি’কে মাঝে মাঝে প্রতীকবাদ উপন্যাস হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

অতি সম্প্রতি ধারার নাটক স্বপ্নের আন্তজগৎ ও দিবা স্বপ্ন বৈশিষ্ট্য নাটকের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখতে প্রতীকবাদী থিয়েটারে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। অগাস্টি ভিলিয়ার্রস ডি ইসল-এডামের 'এক্স' নাটকটি যথাযথ প্রতীকবাদী নাটক। ওই নাটকে দেখানো হয়েছে, সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপের আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতি (রুচিক্রসিয়ান) সম্পন্ন দুজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে অপরকে হত্যা প্রচেষ্টার সময় তারা উভয়ই আত্মহত্যা করবে এই এক শর্তে একে অপরের প্রেমে পড়ে যায়। কারণ তাদের জীবনে কোনো কিছুই সমভাবে চরিতার্থ করা সম্ভব নয়। এডমন্ড উইলসন প্রতীকবাদী সাহিত্যের পরিণাম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করে এ নাটকের নাম রেখেছিলেন 'এক্সেল ক্যাসল'।

মোরিস মেটারলিংক ছিলেন একজন প্রতীকবাদী নাট্যকার। তিনি ১৮৯০ সালে 'দি ব্লাইন্ড' এবং 'দি ইনট্রুডার', ১৮৯১ সালে 'ইনটিরিয়র', ১৮৯২ সালে 'পিলিয়াস এ্যান্ড মিলাসেন্ড' নাটক লিখেন। পর্তুগীজ লেখক ইজিনিও ডি কাস্ট্রেকে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের একজন প্রতীকবাদী উপস্থাপক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি 'বিলকিস', 'কিংগেলোর' 'পলিক্রেটস' নাটক লিখে প্রতীকবাদের ফলপ্রসূ তাত্ত্বিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নাট্যকার, অভিনেতা এবং নাটক প্রযোজক লুয়িনপো স্বাতন্ত্র্য শৈলীর উপস্থাপনের মাধ্যমে কবিতা ও আবেগের সমন্বিত অবাস্তব থিয়েটার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রতীকবাদী থিয়েটারের ওপর গবেষণা করার পর অন্য কোন ধারা চর্চা করেননি। প্রতীকবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ার পর তিনি ফ্রান্সে 'ডি এল ইউভ্রি' নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতীকবাদ থিয়েটারে সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে আলফ্রেড জেরীর 'ইবু রুই' নাটক প্রযোজনা করেছেন। ফ্রান্সের নিয়মিত দর্শক শ্রোতাদের সামনে তিনিই প্রথমবারের মতো ইবসেন এবং স্টিট্রিনবার্গের মতো নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। রাশিয়ান নাট্যকার আন্তন চেখভের শেষদিকের নাটকগুলি প্রতীকবাদী হতাশা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। 'থিয়েটার ডি এল ইউব্রি' এবং 'থিয়েটার ডি আর্ট' মঞ্চে ব্যতিক্রমধর্মী নাটক

মঞ্চস্থ করে প্রতীকবাদী নাট্যকাররা একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা সৃষ্টি করেছিলেন।ইংরেজী ভাষাভাষী একদল শিল্পীদের সৌন্দর্যানুরাগ ছিল প্রতীকবাদের প্রতিরূপ। প্রতীকবাদের শুরুর দিকে ওই ঘরানার কবিতা, চিত্র ও চিত্র সমালোচকদের সঙ্গে প্রতীকবাদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল। আধুনিকতাবাদের উপর সিম্বলিজমের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। আধুনিক অনেক কবির কবিতার মধ্যে এটার প্রভাব স্পষ্ট। টি এস ইলিয়ট, ওয়ালস স্টেভেনস, কনরাড আইকেন, হার্ট ক্রেন ও ডব্লিউ বি ইয়েটস প্রমুখ ইংরেজী ও স্পেন ভাষীয় লাটিন আমেরিকার কবি রুভেন ডেরিওর কবিতার মধ্যে প্রতীকবাদ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। পর্তুগাল সাহিত্যে আধুনিকতাবাদের শুরুতে কেমিলো পিছানহা, ফান্দার্ন্দো ফিয়োসা প্রভৃতি লেখকদের লেখা প্রতীকবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রহস্যবাদ গীতধর্মী কবিতা, আধ্যাত্মবাদ ও ট্রানসসেনডালিজম (যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলের বুদ্ধিবৃত্তিক আধ্যাত্ম দর্শন)। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এডমন্ড উইলসনের ‘এক্সেল ক্যাসল’ ইলিয়ট, পল ভেলরি, মার্সল ফ্রস্ট, জেমস জয়েস এবং জারটুড স্টিন প্রভৃতি বরেণ্য লেখকদের লেখায় গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল প্রতীকবাদ। উইলসর জোর দিয়ে বলেছেন, প্রতীকবাদীরা বিষয়ের মধ্যে স্বপ্নের পশ্চাদপসরণকে উপস্থাপন করেছেন। সম্ভবত রেনেসাঁ সংস্কৃতিসম্পন্ন সৌন্দর্য যেমনিভাবে অধিক থেকে অধিকতর দক্ষ হতে বাধ্য হয়েছে, এটি নিজেই নিজের ওপর অধিকভাবে চালিত হয়েছে- তেমনিভাবে শিল্পায়ন ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা অতি নিকটে আসার জন্য ছাপ রেখেছে।বিংশ শতাব্দীর শুরুর পরপরই ফ্রান্স সাহিত্যে প্রতীকবাদের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার পরও রুশ কবিতায় প্রতীকবাদের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। রাশিয়ার প্রতীকবাদ ইস্টার্ন অর্থডক্সি ও ভ্লাদিমির সলোলভ এর ধর্মীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিল। নাম এক হলেও ফ্রান্সের প্রতীকবাদের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য ছিল খুব কম। আলেকজান্ডার ব্লক, এন্ড্রুবেলি ও মারিয়ানা তাবেতায়িভাদের মতো বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা নির্দিষ্ট নির্দেশনা হিসেবে প্রতীকবাদকে গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত বেলীর উপন্যাস ‘পিটার্রবার্গ’কে রাশিয়ায় প্রতীকবাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাশিয়ার প্রতীকবাদ

প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল ফ্রায়োডর তাইউসেভ এবং সলোইয়োভের অযৌক্তিক রহস্যময় কবিতা, দস্তোভস্কির উপন্যাস, রিচার্ড ওয়াগনারের অপেরা, আর্থার সোপেন হাওয়ারের দর্শন, হেনরিক ইবসেনের নাটক, ফ্রান্সের প্রতীকবাদী কবি শার্ল বোদলেয়ার, স্টেপেন মালার্মে ও পল ভারলেইন প্রমুখ লেখক দ্বারা। নিকোলাই মিনস্কির 'দি এনসিয়েন্ট ডিবেট', মেরিজকোভস্কির 'অন দি কজ অব ডিকলাইন' ও তৎকালীন রুশ সাহিত্যধারার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কারণে রাশিয়ায় প্রতীকবাদ ব্যাপকভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। উভয় লেখকই চরম ব্যক্তিত্ববাদ ও সৃষ্টির কার্যকলাপকে উচ্চমাত্রায় উন্নীত করেছেন। রাশিয়ায় প্রথমদিকে প্রতীকবাদের বড় মাপের কবি ছিলেন জিনেইডা জিপিয়াস। তিনি সেন্ট পির্টাসবার্গে একটি সেলুন খোলেন। যা পরবর্তীতে 'রাশিয়ার ডিকেডেন্ট' এর প্রধান কার্যালয়' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। বিংশ শতাব্দীতেও প্রতীকবাদের পুরনো ইতিহাস হিসেবে এনড্রি বেলীর 'পিটার্সবাগ'কে রাশিয়ার রাজধানীর সামাজিক প্রতিকৃতি হিসেবে বারংবার উদাহরণ হিসেবে উদ্ধৃত করা হতো।রাশিয়ার পিটার্সবার্গে জন্মগ্রহণকারী প্রখ্যাত প্রতীকবাদী কবি আলেকজান্ডার ব্লক তাঁর বর্ণনায় বিদ্রোহকে অতীন্দ্রিয় প্রতীকরূপে প্রকাশ করেছেন। ১৮৮০ সালে রোমানিয়ায় আলেক্সজেনড্রু মাসিডোনস্কি তাঁর প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'লিটারেটোরাল' এর মাধ্যমে যখন একদল যুবক কবিকে পুনর্মিলিত করেন, তখন থেকেই রোমানিয়ার প্রতীকবাদী কবিরা ফ্রান্সের কবিতা দ্বারা সরাসরিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। টুডুর আরথিজি, আয়ন মিনিলেস্কু, জর্জ বেকুবিয়া, টিস্ট্রন টাজারা, টুডোর ভিনো ও টুডোর ভায়ানো প্রমুখ লেখক ও আধুনিকতাবাদী ম্যাগাজিন 'সুরাটুরোল' দ্বারা প্রশংসিত ও উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করার পর ১৯৬৩ সালে বিতর্কিত সাহিত্য সংগঠন জুনিমিয়া ও মিহাল ইমিনেস্কোর ঔজ্জল্যের প্রভাবে রোমানিয়ান প্রতীকবাদ ১৯১০ সাল ও তারপরে অনুপ্রেরণা হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছিল।অভিব্যক্তিবাদ ও পরাবাস্তববাদী চিত্রে প্রতীকবাদ চিত্রশিল্পীদের অনেক প্রভাব ছিল। দুটি আন্দোলনই সরাসরিভাবে প্রতীকবাদ থেকে যথাযথভাবে অবতরণ করেছিল। পাবলো পিকাসোর 'ব্লু পিরিয়ড'-এর সময় তাঁর চিত্রকর্ম 'হারলিকুইন্স' (ষোড়ষ শতাব্দীর ইতালির কৌতুক অভিনেতা), 'নিঃস্ব ব্যক্তি' ও

'ভাঁড়'-এর মধ্যে প্রতীকবাদ এবং বিশেষভাবে পিয়েরে পুসিব ডি চেভানেসের প্রভাব প্রদর্শিত হয়েছিল।ভূদৃশ্য চিত্রের জন্য বেলজিয়ামের প্রতীকবাদ এত বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তখন এটিকে জাতীয় ধারা হিসেবে বিবেচনা করা হতো। রেনে ম্যাকগ্রিটিকে স্থিতির সৌন্দর্যময় শিল্পী হিসেবে সরাসরি প্রতীকবাদের ধারাবাহিক চিত্রশিল্পী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। জেন ট্রপ-এর মতো কিছু কিছু প্রতীকবাদী শিল্পীদের মূর্তমান চিত্রশিল্প বক্ররেখা বিশিষ্ট ধরনের 'আর্ট নোভিও'র (আন্তর্জাতিক চিত্র শিল্প এবং বিনির্মাণ ধারা) দ্বারা সরাসরিভাবে প্রভাবিত ছিল। অনেক আগে গতির ছবি তাদের অবস্থান থেকে প্রতীকবাদী মূর্তমান চিত্রাবলী এবং ধারণার সঙ্গে ব্যাপৃত ছিল। জার্মানির অভিব্যক্তিবাদী ছবিগুলি বহুলাংশে প্রতীকবাদী চিত্রাবলীর কাছে ঋণী। ডি ডব্লিউ, গ্রিফথের সতীত্ব রক্ষাকারী 'গুড গার্ল ও মূক ছবি 'বেড গার্লস' থিয়েডা বারা কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। উভয় ছবিতেই গ্রিফথের ব্যাবিলনীয় ধারণার 'ইনটলারেন্স' ছবির মতই প্রতীকবাদের প্রভাবের ধারাবাহিকতা ছিল। ভীতিকর ও ঘৃণাপূর্ণ ছবিতে প্রতীকবাদের চিত্রাবলী অনেকদিন ধরে অটুট রয়েছে। ১৯৩২ সালে ডেনিস পরিচালক কার্ল থিয়েডর ড্রিয়ার্স 'ভামপায়ার' ছবিতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীক চিত্রাবলীর প্রভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রথমদিকের চিত্র শিল্পী এডওয়ার্ড মাঞ্চ এই ছবির কিছু অংশ তাঁর চিত্রের মধ্যে পুনঃস্থাপন করেছেন।প্রতীকবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, শুরু থেকেই এ মতবাদটি লেখক, পাঠক ও শিল্পাঙ্গনে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। দেশ হতে দেশান্তরে ওহার বিস্তৃতি অতি দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় সব দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতীকবাদ অতি আগ্রহের সঙ্গে সমাদৃত হয়েছে। সিম্বলিজম শিল্প-সাহিত্যে অতি প্রভাবশালী ধারা হিসেবে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বিশেষ করে চিত্রকলায় প্রতীকবাদ এত বেশি প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে যে, প্রতীক ছাড়া চিত্রকলা চিন্তাই করা যায় না।

১৩.২.২ ছন্দ

কবিতা- সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে সবচেয়ে মহোত্তম শাখা; নোবেল বিজয়ী ওরহান পামুক এর চেতনায়- 'কবিতা লেখা মানে ঈশ্বরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন

করতে পারা', সমারসেট মম এর ভাষ্যে কবি ও কবিতার মাহাত্ম্য- 'একজন কবি যখন যাবেন, একজন গদ্যকার তখন পথ ছেড়ে দিয়ে একপাশে দাঁড়াবেন!' কবিতা সম্পর্কে এ রকম শত সহস্র বাক্য-বক্তব্য তুলে দেয়া যেতে পারে। তবু, প্রশ্নটি বারবার ফিরে ফিরে আসে, কর্ণকুহরে কুৎসিত বাদ্য-মাতম তোলে- "কবিতার প্রয়োজন কী?" অত্যন্ত বিব্রতকর এ প্রশ্নের উত্তর পাই কবি পার্সি বিশি শেলি'র এ ডিফেন্স অব পোয়েট্রি (১৮৪০) গ্রন্থটিতে; কবি বলছেন, Poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world, and makes familiar objects be as if they were not familiar.

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, কবিতার মাধ্যমে লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যগুলো প্রকাশিত হয় এবং একই সাথে কবিতা আমাদের চিরচেনা জিনিসগুলোকে নতুনভাবে দেখায়, অচেনা করে তোলে, কবিতা আমাদের মধ্যে নতুন একটি দৃষ্টিশক্তি উন্মোচন করে যা দিয়ে কবি অমিয় চক্রবর্তী 'ঝোড়ো হাওয়া' আর 'ভাঙ্গা দরজা' মেলালেন, আবার 'পাখির পাখার' সাথে 'জীবনের' তুলনা হিসেবে অবলোকন করলেন। আর এখানেই কবিতার মাহাত্ম্য- আমরা নতুনভাবে ভাবতে শুরু করি; একটি মহৎ কবিতা পড়ে ওঠার পর আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধু সূর্যকে দেখি না, দেখি তার ক্রোধ অথবা হাসি; বৃষ্টি দেখি না, দেখি বেদনা অথবা প্রশান্তি। পুরোপুরি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, কবিতা আমাদের ব্যক্তিগত চেতনায় পরিবর্তন আনে যা প্রবাহিত হয় সমাজে, রাষ্ট্রে- ধীরে ধীরে। এ কারণেই, প্রতিনিয়ত লেখা হয়ে চলেছে কবিতা, সে কবি লিখুন বা অকবি, ভালো হোক বা মন্দ, কবিতা হোক বা না হোক; এ গতি মানবসভ্যতার গতির সমার্থক বলেই বোধ করি।প্রত্যেকেরই কবিতা লেখার শুরু হয় সাধারণত পদের সাথে পদ মিলিয়ে ছোট ছোট পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে। এর একটি বিশেষ কারণ এটা হতে পারে যে, আমরা ছোট থেকেই এ বিষয়টির সাথে নানাভাবে পরিচিত হতে থাকি, মায়ের কাছ থেকে শোনা ঘুমপাড়ানি ছড়া- শিশুকালে, কিছুকাল পরে ছড়ায় ছড়ায় বর্ণমালা শেখা; এর কিছুকাল পরে ছন্দে ছন্দে নামতা বলা। এভাবে ছোট থেকেই আমরা চেতনায় অথবা অবচেতনায়, কোনো না কোনোভাবে কবিতাকে অথবা তার ছন্দকে আমাদের মধ্যে

বহন করে থাকি। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, কবিতার মতো দেখতে হলেই তা কবিতা হয় না।রবার্ট ফ্রস্ট এর উক্তি- "আমার দ্বারা এমন কোনো কবিতাই লেখা হয় নি যার শুরুতে আমি তার শেষ জানতাম।" কবিতা নিজে নিজেই আবিষ্কৃত হয়। কবিতা রচনা করা যায় না, কবিতা সৃষ্টি হয়। যাঁর চেতনায় কবিতা 'সৃষ্টি' হয়, তিনিই কবি; বাকি যাঁরা 'কবিতার মতো দেখতে' কবিতা লেখেন, তাঁরা লেখক হলেও হতে পারেন, কবি নন। আর এ কারণেই বুঝি কবি জীবনানন্দ দাশ বলেন, "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।" এ কবিতা সৃষ্টি হয় কীভাবে? জীবনানন্দেরই মতানুসারে এ সৃষ্টির মাধ্যমকে আমরা কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা বলতে পারি। সাধারণে যা দেখে, একজন কবি সেই সাধারণের দেখা সাধারণ জিনিসটিকেই আরো নিবিড়ভাবে অবলোকন করেন, তার করোটির মধ্যে প্রবেশ করেন, সেখান থেকে উৎসারণ করেন এমন কিছু যা দেখেও কখনো দেখা হয় নি; যা অচেনা, কিন্তু খুবই পরিচিত। এ চেনা জিনিসকে অচেনা করে তোলার এবং সাধারণ বস্তুকে অনন্য সাধারণ করে তোলার ক্ষমতাই হচ্ছে একজন কবির কল্পনাপ্রতিভা। কল্পনাপ্রতিভার প্রয়োজনটি আরেকটু স্পষ্ট হয় কবি অমিয় চক্রবর্তীর কথায়। তাঁর মতে, শুধু ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে দিলেই কবিতা হয় না, তাকে বরং 'জার্নালিজম' বলা যেতে পারে। কবির কাজ হচ্ছে, বলতে চাওয়া কথাটিকে কল্পনার বিশষত্বে নতুন করে বলা, বাস্তবে উপস্থিত বিষয়টিকে আরো মহৎভাবে উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই 'মহৎ' বলতে কল্পনার এবং ভাষার মাহাত্ম্যকে বুঝতে হবে। একটি ছোট্ট উদাহরণ গ্রহণ করা যাক- তাঁর সংগতি কবিতা-

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বারিতার
ঐ ভাঙ্গা দরজাটা
মেলাবেন।
পাগল ঝাপ্তে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকাশে আগুলে তৃষ্ণায় মাঠ ফাতা
মারী কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা

বন্যার জল,তবু ঝরে জল,

প্রল্য কাঁদনে ভাসে ধ্রাতল-

মেলাবেন।

একটু ভালোভাবে লক্ষ করলেই দেখি, কবি যখন বলছেন ‘তৃষ্ণার মাঠ’, তখন মাঠ আর ‘মাঠ’ থাকে না, জনজীবনের প্রতিনিধি হয়ে যায়; আবার যখন সে মাঠের খেত মারী কুকুরের জিভ দিয়ে চাটা তখন সে খেতও আর খেত থাকে না, বিপ্লবী চেতনার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এভাবেই কবি ন-বিশেষকে করে তোলেন সুবিশেষ এবং সাধারণকে করে তোলেন অনন্য সাধারণ।

কবিতা সৃষ্টির প্রসঙ্গ এলেই যে বিষয়টি প্রথমেই সামনে এসে হাজির হয়, সেটা হচ্ছে ছন্দ। ছন্দের বিষয়টি শুরুতেই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। অনেকে মনে করে থাকে, পদের সাথে পদ মেলানোটাই ছন্দ। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, কবিতায় শব্দের ছন্দের চেয়ে ভাবের ছন্দই বেশি বিবেচ্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, “শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ আছে ভাবের বিন্যাসে, সে কানে শোনবার নয়, মনে অনুভব করবার। অর্থাৎ কবিতায় ছন্দ তো অতি অবশ্যই আবশ্যক, কেননা ছন্দ হচ্ছে সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে পারে।” সেতারের তার বাঁধা থাকে ঠিকই, কিন্তু তা সুরকে দেয় মুক্তি; ছন্দের কাজও তা-ই। সে ছন্দ হতে পারে শব্দের সাথে শব্দ মিলিয়ে প্রতি চরণে অন্ত্যমিল দিয়ে, অথবা শুধুই কবিতার ভাবের মধ্যে দিয়ে। কোলরিজ বলেন, “Poetry: the best words in the best order.” এ শব্দসজ্জা তো ছন্দের জন্যেই। শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে ছন্দ থাকে, কবিতার ক্ষেত্রে তা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আরো স্পষ্ট হয় ডব্লিউ এস মারউইন এর কথায়; তিনি বলছেন, “Poetry is like making a joke. If you get one word wrong at the end of a joke, you’ve lost the whole thing.” সুতরাং, শুধু শব্দের পর শব্দ বসিয়ে দিলেই হবে না, বুঝতে হবে তার ছন্দ, এবং সে অনুযায়ী উপযুক্ত স্থানে তাকে স্থাপন করাটাও শেখা প্রয়োজন। অমিয় চক্রবর্তীর কবিটা বিশ্লেষণ করে কবিগুরুর উক্তি যুক্তি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে-

তোমার আমার নানা সংগ্রাম

দেশের দশের সাধনা সুনাম

ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত প্রিনাম

মেলাবেন

শুরুতে আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া কোমল শব্দবুনন, পঙতি চয়ন; উচ্চারণ করতেই হৃদয়ে কোথাও সূর্য-হাসির কোমল স্পর্শ অনুভূত হয়। কিন্তু, ওই যে, 'তোমার আমার নানা সংগ্রাম'প্রাণের এ জাগরণ ও স্পন্দন আরো স্পষ্ট পরের চরণগুলিতে— প্রাণ, অথবা হৃদয় জেগে ওঠে, সে জাগরণ ঘটে অতিদ্রুত, প্রথম দুটি পঙতি র দ্রুততাও সেই দ্রুততারই সমার্থক; সেই সাথে সাথে শব্দ নির্বাচনটাও অভিনব হয়ে ধরা পড়ে আমাদের সামনে— 'পরিণাম'— প্রাণের যে আবেগের কথা এখানে বলা হয়েছে, তার আস্ফালন প্রকাশ করতে এর চেয়ে ভালো শব্দ আর কী-ই বা হতে পারতো! যে তাল এবং লয় পঙতি দুটি পড়ার সময় বেজে ওঠে, তার মাধ্যমে হৃদয়-জাগরণের যে অস্থিরতা, চঞ্চলতা, অরোধ্য বিহ্বলতা কবিতায় প্রকাশ্য তা যেন কবিতা পড়ে বোঝার আগেই অনুভূত হয়ে যায়— টি এস এলিয়ট এর ভাষায়— কবিতা বোঝার আগেই অনুভূত হয়। এরপর, হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতিগুলো আর বদ্ধ বক্ষে আটকানো যায় না, বের হয়ে আসতে চায়, প্রাণের আবেগগুলো সব বন্ধন-শৃঙ্খল-দেয়াল চূর্ণ করে বের হয়ে আসে; উপরের শেষ পংক্তিটির অবয়ব-দীর্ঘতায়, কবির সে আবেগ তার অসীমতা নিয়ে, রোধ করার সকল শক্তি ভেঙে ছিটকে যেন বাইরে চলে আসে, তাকে রোধ করা যায় না। এর ঠিক পরেই—

"জীবন জিবন-মোহ

ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ

মেলাবেন।তিনি মেলাবেন।"

দীর্ঘ একটি চরণ শেষে ছোট ছোট পঙতি অবতারণা; কারণটি পরিষ্কার— ভূধরে যে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে তা কবিতার পংক্তি পড়েই অনুভূত হয়, কবিতার এ পংক্তিটি উচ্চারণের সময়ও সে কম্পন প্রতিবিম্বিত হয়। জীবনের মোহ স্বপ্নের বিদ্রোহ— এসব

কিছুই পংক্তিগুলোর অবয়বে ধরা পড়ে। এভাবে ভাবের সঙ্গে ছন্দ, ছন্দের আদলে শব্দ নির্বাচন, তাকে যথোপযুক্ত অবস্থানে স্থাপন করা— এগুলো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত— আর এ সব মিলিয়ে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার দ্বারাই কবিতার ভাব রচিত হয়, সৃষ্টি হয় কবিতা। সুতরাং, কবিতা সৃষ্টি যে কোনো দৈব প্রেরণা নয়, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।বর্তমান সময়ে, কবিতার ছন্দ নির্বাচনে, কবিগণের মধ্যে, বিশেষত নবীন কবিদের মধ্যে যে ছন্দটি সবচেয়ে বেশি স্বচ্ছন্দে গৃহীত হয়, তা হচ্ছে গদ্যছন্দ। খুব সম্ভব, 'গদ্যছন্দ' বিষয়টি পরিষ্কার না হওয়ার দরুণ অনেকেই এ ছন্দটিকে সহজ ভেবে কবিতা রচনায় গ্রহণ করেন, আবার অনেকেই উপহাসে উড়িয়ে দেন এ ভেবে যে, এটি গদ্যকে ভেঙে কবিতা বানানোর অপচেষ্টা। 'গদ্যছন্দ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি শব্দ পাই— গদ্য এবং ছন্দ। এ কথা সন্দেহাতীত যে, গদ্যেও ছন্দ থাকে; তাই বলে ছন্দ থাকলেই কোনো গদ্য কবিতা হয়ে ওঠে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ওই ছন্দটি গদ্যের না হয়ে কাব্যের হয়। অর্থাৎ, গদ্যের শরীরে কাব্যের ছন্দ ঠিকঠাকভাবে বসাতে পারলে, তখনই কেবল গদ্যছন্দ সৃষ্টি হয়। গদ্যের বাক্য ভেঙে দিলেই যে গদ্যছন্দের কবিতা হয়ে যায় না, তা তার ছন্দ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। কবি শামসুর রাহমান এর 'অক্ষরের ধারণ ক্ষমতা' কবিতাটিকে আমরা গদ্যের শরীরে লিখে দেখি গদ্যছন্দের এ কবিতাটি শেষ পর্যন্ত কবিতাই হয়ে উঠেছে—

'যখন তোমাকে দেখি আমি, পাঁচ হাজার বছর নিষ্পলক তাকায় তোমার দিকে; অথচ আমার দৃষ্টিকে করেছে বন্দি ওরা অদৃশ্য দেয়াল গেঁথে। রাশি রাশি সিমেন্ট এবং বালি চোখে পুরে দিতে চায় সকল সময়। যেন আমি অন্ধ হলে ছিল ভালো, নদীতে হতো না ভরাডুবি। ভালো ছিল, শৈশবের শ্যামল ছায়ায় ছিলে তুমি কোনোদিন। তখন তোমাকে ছুঁলে কারো ধিক্কারের বাজ পড়তো না আমার মাথায়। আর আজ চক্ষু মিলনেই ঢি ঢি পড়ে যায় দশদিকে; কেউ কেউ এমন কি রায়বেঁশে হয়ে ওঠে।'

একটু উচ্চারণ করে পড়লেই বোঝা যায় যে, গদ্যের শরীরে লিখলেও তা কিন্তু গদ্য হয়ে ওঠেনি, কাব্যের সুষমাই তার প্রতিটি বাক্যে প্রতিসরিত হচ্ছে। এ কবিতাটি তাই শুধু পংক্তি ভেঙে দেয়ার কারণেই কবিতা হয়ে ওঠেনি; কবিতা হয়ে উঠেছে তার

অন্তঃসার-সুষমার জন্যই। এ ক্ষণে একটি প্রশ্ন সামনে চলে আসে যে, যদি গদ্যছন্দে লিখি, তাহলে পংক্তি গুলি ভাঙা হবে কোন প্রক্রিয়ায়? মনে রাখা প্রয়োজন, সকল ধরনের ছন্দের ক্ষেত্রেই বিষয়টি প্রযোজ্য— বাক্যের এবং কখনো কখনো শব্দের বক্তব্য অনুযায়ীই পর্ববিভাগ ও পঙ্ক্তিবিভাগ করা প্রয়োজন। কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতার কিছু অংশের পঙতি বিভাগ দেখি—

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণিঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে।।

প্রথম পঙ্ক্তিটিতে চারটি পদ, এরপর এক একটি পদে এক একটি পংক্তি, এবং শেষে আবারো একটি বড় পংক্তি। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাই, 'বিদ্যুতে', 'আগুনে' এবং 'ঘূর্ণিঝড়ে' শব্দ তিনটি দ্বারা পৃথক পৃথক পংক্তি রচনার ফলে এ তিনটি উদ্দীপকই বিশেষভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে; প্রথমে বিদ্যুৎ, তারপর আগুন এবং এরপর ঘূর্ণিঝড়ের চিত্রগুলো আমাদের সামনে যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে; ওই তিনটি শব্দ এক পংক্তি তে লিখলে চিত্রকল্পটি এভাবে এতটা স্পষ্ট হয়ে ধরা দিত না। এবং শেষের তুলনামূলক বড় পংক্তি টিতে বৃষ্টির বহমানতা পংক্তিটির শব্দচয়নের সাথে সাথে তার আকারেও ধরা পড়ে; পংক্তিটির উচ্চারণ করে পড়লে আমরা ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়ার ব্যবধিটিও অনুভব করে উঠতে পারি।

এ তো গেল পংক্তি ভেঙে গদ্যছন্দের ব্যবহারের দিক; এবারে তবে একেবারে সরাসরি গদ্যের শরীরে লেখা একটি কবিতা বিশ্লেষণ করে দেখি। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এর 'পাহাড় চূড়ায়' থেকে—

'এখন আমি একটা পাহাড় কিনতে চাই। সেই পাহাড়ের পায়ের কাছে থাকবে গহন অরণ্য, আমি সেই অরণ্য পার হয়ে যাবো, তারপর শুধু রুক্ষ কঠিন পাহাড়। একেবারে চূড়ায়, মাথার খুব কাছে আকাশ, নিচে বিপুলা পৃথিবী, চরাচরে তীব্র নির্জনতা। আমার

কণ্ঠস্বর সেখানে কেউ শুনতে পাবে না। আমি শুধু দশ দিককে উদ্দেশ্য করে বলবো, প্রত্যেক মানুষই অহঙ্কারী, এখানে আমি একা- এখানে আমার কোনো অহঙ্কার নেই।' কবি ইচ্ছে করলে বাক্য ভেঙে ছোট-বড় পংক্তিতে সাজিয়েও লিখতে পারতেন; তা তিনি করেননি। আমাদের সামনে দৃশ্যত একটি গদ্য উপস্থাপন করেছেন; কিন্তু তার অন্তর্নিহিত কাব্য আমাদের সামনে সমহিমায় প্রকাশিত। তাই গদ্যের শরীরে লেখা হলেও তা গদ্য না হয়ে কবিতাই হয়ে উঠেছে; কীভাবে? কবি যে এখানে গদ্যের শরীরে পরিয়ে দিয়েছেন কাব্যের ছন্দ! আর এভাবেই একটি কবিতা তার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যগুণেই কবিতা হয়ে ওঠে, অবয়বটি তাই নিতান্তই গৌণ হয়ে যায়।

আগেই বলেছি, অনেকে গদ্যছন্দকে সহজ ভেবে যাচ্ছেতাই ব্যবহারে কবিতাকে আঁস্তাকুড়যোগ্য বানিয়ে ফেলেন। তাই শ্রীশচন্দ্র দাশ এর সতর্কবাণী তাঁদের জন্য— 'শক্তিমান লেখক না হইলে এই ছন্দে কবির অপমৃত্যু।' তবে ছন্দোবদ্ধ কবিতার তুলনায় গদ্যছন্দে যে ভাব-বিষয়টি আরও গভীর এবং স্বাধীনভাবে, আরও পরিষ্কারভাবে ধরে রাখা সম্ভব, তা বুঝতে পারি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর কথায়— 'গদ্যের আছে সহজ স্বচ্ছতা। তাই বলে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, গদ্যকাব্য কেবলমাত্র সেই অকিঞ্চিৎকর কাব্যবস্তুর বাহন। বৃহতের ভার অনায়াসে বহন করিবার শক্তি গদ্যছন্দের মধ্যে আছে।'

সবশেষে আরেকবার কবিগুরুকে স্মরণ— তিনি বলেছিলেন, 'কবিতা আমাদেরই এক আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটায়।' সকল কাব্যপ্রেমী পাঠক ও লেখকের নিকট তাই একটিই নিবেদন, আমাদের এ পুনরুত্থান যেন সৌন্দর্যমণ্ডিত সার্থক পুনরুত্থান হয়। কবিতা লেখায় ছন্দ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব লেগেই আছে। এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব কবিতার চিরকালীন রহস্যকে আচ্ছাদিত রাখে বিতর্কের বেড়াজালে। ছন্দ মানেই কবিতা নয়। ছন্দ কবিতার উপকরণ। শুধু উপকরণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কিন্তু কেউ কেউ কেবল ছন্দকে কবিতার অত্যাবশ্যক উপকরণ উল্লেখের পাশাপাশি এমন বিধান আরোপ করেন যে, ছন্দই কবিতা। আদতে 'ছন্দই পদ্য' এমন মন্তব্য করলে কিছুটা মেনে নেওয়া যায়।একথা অনস্বীকার্য যে, ছন্দের একরকম শক্তি আছে। প্রকৃতি ও সৃষ্টির পরতে

পরতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে ছন্দ ক্রিয়াশীল। এব্যাপারে বিস্তর লেখালেখি আছে। বর্তমান লেখার অন্বিষ্ট বিষয় তা নয়। কবিতায় ছন্দের অনিবার্যতা কতটা জরুরি কিংবা কবিতায় ছন্দ মুখ্য না হয়েও কবিতা হতে পারে কিনা। এধরনের সাধারণ প্রশ্ন কিন্তু অসাধারণ বিতর্ককে সামনে এনে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান থেকে পরখ করতে আগ্রহী। এখানে প্রত্যেক কবিই নিজেকে একজন আলোচক হিসেবে ভাবতে পারেন মনে মনে।ছড়া একান্তই ছন্দনির্ভর শিল্প বলে একজন ছান্দসিক ছন্দের খুব ঘনিষ্ঠ স্বজন। ছড়াকার নিয়ত ছন্দের বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করেন। ছন্দের ঝংকারে তিনি আনন্দস্রোত বইয়ে দেন মনে মনে জনে জনে।

পক্ষান্তরে, কবি হাঁটেন ভাবের বারান্দায়। কবির কাছে ‘ভাব’ আগে। ভাবের গভীরতাই সৌকর্যপূর্ণ বাণীরূপে কবিতামূর্তি লাভ করে। ছন্দ কবিতার একটি অনুষঙ্গ মাত্র। ছন্দই কবিতা নয়। হাল আমলে ছন্দনির্ভর কবিতাকে পদ্য হিসেবে দেখা হয়। ফলে আগেকার অন্ত্যমিল যুক্ত ছন্দময় কবিতায় অভ্যস্ত পাঠকের কাছে আধুনিক কবিতা উদ্ভট মনে হয়। কারণ আধুনিক কবিতার একটি প্রধান অঞ্চল জুড়ে আছে ‘গদ্যছন্দ’। প্রধান তিনটি ছন্দ (স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং অক্ষরবৃত্ত) ছাড়া অনেকেই গদ্য ছন্দের ভেতরগত চলন ধরতে পারেন না। ফলে সাধারণ গদ্য আর গদ্যকবিতার ভেদ তারা অতিক্রম করতে সীমাবদ্ধতায় আটকা পড়েন। অর্থাৎ ‘গদ্যছন্দ’ তাদের কাছে ছন্দ হিসেবে তেমন কদর পায় না। মিলযুক্ত ছন্দই কবিতায় তারা দেখতে আগ্রহী। কোনো কবি অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতা না লিখলে তাকে ‘ছন্দে আনাড়ি’ কবি বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে দেখা যায়। অথচ এটা কে না জানে, আধুনিক কবিতা মানে কাঠামোবদ্ধ ছন্দমুক্তির কবিতা। এখানে ছন্দের চেয়ে বেশি জরুরি কবিতার ভাবকে যথাবিহিত শব্দবিন্যাসে উপস্থাপন করা। ছন্দের ঝনঝনানির চেয়ে আধুনিক কবিরা বেশি গুরুত্ব দেন ব্যক্তিগত বোধকে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উন্নীত করা। কবিতা এখন নানামাত্রিক অর্থবহতাকে ধারণ করে অবিচল থাকে।খেয়াল করেছি, অমিয় চক্রবর্তী ছন্দের প্রয়োগ নিয়ে যতটা না দ্বন্দ্ব; তার চেয়ে বেশি দ্বন্দ্ব ছন্দ নিয়ে মুন্সিয়ানায় পরস্পরের শক্তিমত্তার প্রদর্শন নিয়ে। ছন্দ বিষয়ে অন্য কবির কবিতায় ছিদ্রান্বেষণ একধরনের বদ-অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

লেখায় কবিতার অনুভব ও উপলব্ধি আছে কিনা তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। কেবল ছন্দের গণিত কষতে বেশি উৎসাহী অনেকেই। গদ্যের মাঝেও যে 'অন্তছন্দস্রোত' আছে সে ব্যপারে কিছু বলছেন না। কবিতা এমন এক শিল্প, যেখানে কবি আবেগ ও কল্পনার নিজস্ব ভূখণ্ড তৈরি করেন ভাষা দিয়ে। শুধুই ভাষা নয়; ভাষার বাহনে চেপে কবি পাঠককে নিয়ে যান অদেখা, অধরা, অনাস্বাদিত কোনো অভিজ্ঞতার অন্তরালে। হ্যাঁ, আপনি হয়তো কবিতার কলকব্জাগুলো আলাদা করে পড়তে পারেন, বিশ্লেষণ করতে পারেন। এতে আপনি কবিতার দক্ষ সমালোচক কিংবা বিশ্লেষক। কিন্তু তাই বলে একজন দক্ষ সমালোচক কিংবা বিশ্লেষক চাইলেই মহৎ কবি হতে পারেন না। ছন্দ অলঙ্কার সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানের অধিকারী মানে এই নয় যে, তিনি ভালো কবিতা লিখতে পারবেন। একজন কবি ভালো কাব্য সমালোচক হতে পারেন। কিন্তু একজন কাব্য সমালোচক চাইলেই একজন মহৎ কবি হতে পারেন না। ছন্দ শাস্ত্রে পণ্ডিত হলেই তিনি কবি হয়ে যান না।এমনও হতে পারে, শুধু পুঁথিগত ছন্দজ্ঞান ছাড়াই শুধু অভ্যস্ততার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ছন্দ সম্পর্কে আনাড়ি কবি মহৎ কবিতা লিখতে পারেন। বোধকরি, বেশির ভাগ কবি প্রথম জীবনে কবিতা লিখেছেন ছন্দের পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন না করেই। ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই সেই ভিত তৈরি করে নেন। অনেকেই অন্ত্যমিল যুক্ত লেখা দেখলেই দারুণ ছন্দ খুঁজে পান। কিন্তু ছন্দের ভেতরে যে আরও ছন্দের কাঁপন আছে সেই শিহরণ গতানুগতিক ছন্দবিদ দেখতে পান না।

প্রকৃত কবি কাব্যচর্চার ঊষালগ্নে ছন্দ সম্পর্কে আনাড়ি হলেও ধীরে ধীরে ছন্দের অলিগলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। অভিজ্ঞ কবি একপর্যায়ে কবিতার বিষয় ও ভাবের প্রয়োজনে ছন্দ ভাঙেন, ছন্দ গড়েন। ছন্দের এই ভাঙাগড়ার খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন। আদতে কবিতা কখনো একেবারেই ছন্দহীন হতে পারে না। কারণ যেখানে স্বাভাবিক গদ্যেও আমরা ছন্দের নানা ভাঁজ খেয়াল করি, সেখানে কবিতায় ছন্দ থাকে না এমন চিন্তা করাও ভুল বৈকি।ছন্দের সাথে ধ্বনিময়তাও গুরুত্বপূর্ণ। কবির ধ্বনিগত রসবোধের ওপর নির্ভর করে ছন্দের স্ফূর্তি। আশ্চর্য ধ্বনি সৃষ্টি হয়। কবিতার ঐ ধ্বনিই কবিতার জাদুমন্ত্র। ছন্দের অভীষ্ট ঐ ধ্বনি, ছন্দ পথের

মতো ঐ মঞ্জিলের উদ্দেশে চলে গেছে, মঞ্জিল যেখানে সেখানে প্রকৃত-ছন্দ, আর প্রকৃত-ছন্দ যেখানে সেখানেই কবিতার অধিষ্ঠান।' (কবিতা / করতলে মহাদেশ)

কবিতার 'ভাব' কবির প্রয়োগ-দক্ষতার ওপর নির্ভর করে উদ্দিষ্ট ছন্দে নিজেই বাঁধা পড়ে। এখানে ছন্দ ভাবের অনুগামী। কখনো ব্যতিক্রমও হতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। মূলত মৌলিক কবি একেবারে সচেতন হয়ে, ছন্দের সংখ্যা হিসেব কষে কবিতা লিখতে বসেন না। এটা ছড়াকারের বেলায় হতে পারে। কবি আচমকা ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো হয়ে যান। কবিতায় নিমগ্ন হয়ে ডুব দেন ঘোরের পুকুরে। তখন কবির আরাধ্য কেবল ছন্দ নয়; সর্বাঙ্গীণ সুন্দর পঙক্তির আশায় তিনি যেন কবিতার ডুবুরি। রূপ-রস-গন্ধ সমেত বাণী যখন যথোপযুক্ত ছন্দে বাঁধা পড়ে। তখন কবিতার অন্তরঙ্গ অনুভব তনুমনকে স্পর্শ করে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, কবিতায় রস আরও বেশি মধুর হয়ে উঠতে পারে কেবল ছন্দের যথার্থ বুননের ফলে। অমিয় চক্রবর্তী কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ছন্দনির্ভর কবিতার দারুণ অধিকার। অর্থাৎ প্রকৃতিগত ভাবে তাঁর কবিতা ছন্দঘনিষ্ঠ। ছন্দের বন্ধনে কবিতার ভাব পাঠকের মনকে বেশি আন্দোলিত করেছে। কিন্তু হাল-আমলে ছন্দের ব্যাপারে কবিগণ কিছুটা বিমুখতা দেখিয়েছেন। মূলত এটাও একধরনের প্রবণতা। কবিতার টেকনিক বদলের ধারাবাহিকতায় হতে পারে এটাও একধরনের প্রয়াস। আলংকারিক উপকরণ ব্যতীত ছন্দের কোনো সার্থকতা তারা খুঁজে পাননি। আর তাই 'গদ্য' বা 'পদ্য' দু'টোই কবিতার মাধ্যম হিসেবে তারা বিবেচনা করেন। তবুও ছন্দকে এড়িয়ে আদৌ কবিতা লেখা সম্ভব কী? সম্ভব নয়। কারণ কবি না চাইলেও কোনো না কোনো ছন্দের ফ্রেমে বাঁধা পড়বেন। ছন্দমুক্তি খুব কঠিন। তবে 'ছন্দই কবিতা' এমন অবশ্যম্ভাবী মন্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। কবিতায় ছন্দ প্রয়োগে মুন্সিয়ানা দেখানো মানেই উত্তম কবিতা নয়। অনেকেই দাবি করেন, তাঁর কবিতা ছন্দে লেখা বলে তিনি কালোত্তীর্ণ কবিতা লিখেছেন। আমরা ভুলে যাই, 'মিস্তিরি শিল্পী নন, কিন্তু প্রতিটি শিল্পীই নিপুণ মিস্তিরি।' অর্থাৎ শিল্পী এবং মিস্তিরি এ দু'য়ের সমন্বয়ে তৈরি হয় শিল্প তথা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক। প্রথাবিরোধী

লেখক হুমায়ুন আজাদ 'কবিতা কি ও কেনো' প্রবন্ধে বেশ সাহসের সাথে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এবং ঈশ্বর গুপ্তের রচনাকে ‘পদ্য’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, আগে বাংলা কবিতা হতে গেলে দুটি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। প্রথমে পদ্য, তারপর কবিতা। অনেক কবির কবিতা ছন্দের নিপুণতায় ‘পদ্য’ স্তরে এসে থেমে যেতো। যেহেতু একালে গদ্য হয়ে উঠেছে কবিতার মাধ্যম, সেহেতু কবিতাকে মুখ্যত ছন্দের স্তর অতিক্রম করতে হয় না। ফলে ‘ছন্দোবদ্ধ রচনামাত্রই পদ্য’, কবিতা নয়। হুমায়ুন আজাদের ভাষায়, ‘আমাদের গৌণ কবিদের কথা ছেড়ে দিই; প্রধান কবি বলে যাঁদের গণ্য করি, তাঁদের বহু রচনাকে ছন্দোবদ্ধ রচনা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। কিন্তু প্রথাগতভাবে সেগুলোকে কবিতাই বলি আমরা, কারণ ওই রচনাগুলো মিটিয়েছে কবিতার সমস্ত রৌপ শর্ত।’

কবিতার আঙ্গিক বিবেচনায় ছন্দের উপস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবে কবিতা লেখার প্রাথমিক পর্যায়ে কবি যেন ছন্দ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে না ভোগেন। ছন্দ কবিতার অলঙ্কার; ছন্দই কবিতা নয়। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি অগ্রসর হবেন কবিতাভিমুখে। ছন্দের বই পড়ে বোধকরি কোনো কবিই কবিতা লেখায় অবতীর্ণ হননি। ফলে ছন্দ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কিংবা জড়তার কিছু নেই। মৌলিক কবি ধীরে ধীরে ছন্দকে আয়ত্বে এনে শাসন করেন আপন ইচ্ছায়। ছন্দ কবিতা হয়ে ওঠার বাহন মাত্র। কবিতার বিষয় কিংবা ভাবকে আরও বেশি ক্ষিপ্রতা দেয়ার জন্যেই ছন্দের স্পন্দন প্রয়োজন। তাই কবিতায় ছন্দ থাকুক। ছন্দনির্ভর পদ্য যেন কবিতা হয়ে ওঠে সেদিকেও দৃষ্টি পড়ুক।

১৩.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- অমিয় চক্রবর্তী কবে জন্ম ও মৃত্যু সাল কত?

জন্ম: এপ্রিল ১০, ১৯০১ - মৃত্যু: জুন ১২, ১৯৮৬।

২- অমিয় চক্রবর্তী এর কবিটা বৃষ্টি কবিতা কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া?

একমুঠো (১৯৩৯)।

৩- অমিয় চক্রবর্তী এর সংগতি কবিতা কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া?

অভিজ্ঞান বসন্ত ১৯৪৩।

৪- অমিয় চক্রবর্তীর এর মাটি কবিতা কোন কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া?

পারাপার ১৯৫৩।

১৩.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর সাহিত্য চর্চা আলোচনা কর।

২- অমিয় চক্রবর্তীর হপকিনসের দ্বারা প্রভাবিত কবিতা গুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৩.৫ গ্রন্থপঞ্জী

কবিতা- অমিয় চক্রবর্তী,

কারুভাস পত্রিকা।

একক-১৪ জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

বিন্যাস ক্রম

১৪.১ জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

১৪.২ বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

১৪.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১৪.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্গম স্থান হচ্ছে মানুষের মন। এ কারণেই মানুষই মানুষের কাছে সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় রহস্য।মানুষে মানুষে দুর্লঙ্ঘ ব্যবধান।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘প্রত্যেকটি মানুষ একটি যেন দ্বীপ, কোনোটির সঙ্গে কোনোটির সংযোগ নেই -

মাঝখানে বিস্তীর্ণ লবণাম্বুরাশি'। আসলেই তাই, যে মানুষটি এ মুহূর্তে আমার পাশে গা ঘেঁষে বসে আছে মনের দিক থেকে হয়তো সে শত-সহস্র যোজন দূরে। নিকটতম আত্মীয়-আপনজনও সুদূর মনোরাজ্যের অধিবাসী। এদিক থেকে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে অপরিচিত। এটি মানব সংসারের অতি নির্মম একটি সত্য বিষয়।প্রতিটি মানুষের চেহারা আলাদা, কণ্ঠস্বর আলাদা, এমনটি আঙুলের ছাপও আলাদা। এ কারণেই বোধ করি মানুষে মানুষে চিন্তা-ভাবনাতেও ফারাক। মানুষের মধ্যে সূক্ষাতিসূক্ষ পার্থক্য বিদ্যমান। একই বিষয়ে একেকজনের একেক মত বা বিশ্লেষণ। আসলে রহস্যটা মানুষের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত। প্রতিটি মানুষ চাঁদের মতো, যার একটি অন্ধকার দিক আছে, যে দিকটি সে কাউকে দেখাতে চায় না।মানুষের ব্যক্তিত্বের যে দিকটা প্রয়োজনের ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটি হলো তার অহং-এর দিক, অপূর্ণতার দিক। জীবনযুদ্ধের তাগিদে যেখানে মানুষ বিশ্বজগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, সেখানেই মানুষ নিজেকে খণ্ডিত ও খর্ব করে রাখে। সেখানে নয়, জীবনলীলার প্রেরণায় যেখানে বিশ্বজগতের সঙ্গে মানুষের আনন্দের যোগ সেখানেই মানুষের আসল পরিচয়। মানুষের মধ্যকার সেই সত্তাই নিত্যকালের মানবসত্তা -প্রত্যেক মানুষের মধ্যকার বিশ্বমানবসত্তা। মানুষের এই সত্তাই সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা যে মানুষ, সে ব্যক্তিবিশেষ নয়, সে হলো মানুষের ভেতরের চিরন্তন মানব।প্রতিভাবানের প্রতিভাই সাধারণ মানুষ থেকে তাদের মধ্যে আড়ালের সৃষ্টি করে। প্রতিভাবান তারাই যারা গতানুগতিক পরিচিত গণ্ডি ছাড়িয়ে অপরিচিত রাজ্যের বা ভাবনার সন্ধান দেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেই যেহেতু চিন্তা-ভাবনার ব্যবধান অনেক, সেখানে অনন্য সাধারণ প্রতিভাবান এবং সাধারণের মধ্যে ব্যবধান যে কত দুস্তর তা কল্পনা করাও কঠিন। প্রতিভাবান মানুষ -বিশেষ করে যারা কবি, শিল্পী -তারা মনন রাজ্যের অধিবাসী। সে রাজ্যের পথঘাট সাধারণ মানুষের জানা নেই। সে জন্য ভাবনার রাজ্য ছেড়ে আমরা তাকে ঘটনার রাজ্যে খুঁজে বেড়াই। ঘটনার সঙ্গে রটনা যোগ হয়। ঘটনা আর রটনার অরণ্যে ভাবুক মানুষটি হারিয়ে যান। তার ভাবনার সূত্রগুলো আমরা সাধারণরা ঠিক ধরতে বা বুঝতে পারি না বলে তার অনেক কথা ভুল বুঝি।

ঋতুরাজের মতো রসরাজও রহস্যাবৃত। মালতি মাধবীর মতো আমাদেরও মন দ্বিধাগ্রস্ত - ‘কে সে মোর কেই বা জানে, কিছু তার দেখি আভা, কিছু পাই অনুমানে, কিছু তার বুঝি না বা।’ রূপস্রষ্টা এবং রসস্রষ্টাকে বুঝতে হলে প্রচুর পরিমাণে কল্পনা শক্তির প্রয়োজন হয়।বাল্মীকি, বেদব্যাস, হোমার, এমনকি অনেক পরবর্তী কালের কালিদাসও আমাদের কাছে কিম্বদন্তী তুল্য। তাঁদের সম্পর্কে কিছু কৌতুক কাহিনী ছাড়া আমরা অনেক কিছুই জানি না। শেক্সপীয়র মাত্র চারশ বছর আগের মানুষ। যিনি বিশ্ববাসীকে ‘ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড’ এর বার্তা দিয়ে গেলেন। তিনিও তার যুগের মানুষের কাছে অজানা ছিলেন। প্রায় ত্রিশ বছর লন্ডন শহরে বসবাস করেন শেক্সপীয়র। লন্ডনের পাট চুকিয়ে তিনি বাড়ি ফিরে যান এবং কিছুকাল পরেই মৃত্যুবরণ করেন। তখন লন্ডনে বহু কবি-সাহিত্যিক বাস করতেন। তারা সেই সময়ের সেরা প্রতিভা শেক্সপীরের কাছাকাছি বসবাস করে একই কাজে সাহিত্য চর্চায় লিপ্ত ছিলেন, বলা চলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করতেন কিন্তু সেই সব কবি-সাহিত্যিকরাও বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারেনি বা জানতে পারেননি। মহাকবি শেক্সপীয়রকে অতি কাছে পেয়েও তারা তাকে চিনতে পারেননি। তার কারণ তারা ছিলেন খুদে মানুষ, খুদে লেখক। মহাকবিকে তাই অতো কাছে দেখেও চিনতে পারেননি। একজন মাত্র চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বেন জনসন। সে যুগের এক অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি। নাট্যকর হিসেবে শেক্সপীয়র এবং বেন জনসন ছিলেন ভিন্নধর্মী। সমগোত্রীয় ছিলেন না। তথাপি শেক্সপীয়রের মতো অসামান্য প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি বেন জনসন। এ জন্যই বলা হয় রতনে রতন চেনে। ইংরেজরা শেক্সপীয়রকে জেনেছে তার কবিতা ও নাটকে। তারা তার ব্যক্তি জীবন নিয়ে কিছু কৌতুক কাহিনী ছাড়া কিছুই জানে না। প্রতিভাবানদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকাটাই স্বাভাবিক। কারণ কি ধরনের মন নিয়ে তিনি এমন সব ভাবনা-চিন্তার আঁধার হতে পারেন। কি করে এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করে কালজয়ী কবিতা-নাটক রচনা করলেন!

প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ ও সুধিন্দ্রনাথ প্রথম সারির কবি। একইভাবে মহাকবি কলিদাসকে সাধারণরা চিনতে না পারলেও চিনেছিলেন প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কালিদাসের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তাই তো তিনি লিখেছেন, ‘আমি যদি জন্ম নিতেম / কালিদাসের কালে /দৈবে হতেম দশম রত্ন/ নবরত্নের মালে /একটি শ্লোকে স্তুতি গেয়ে /রাজার কাছে নিতেম চেয়ে /উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে /কানন ঘেরা বাড়ি। রবীন্দ্রনাথ চিনেছিলেন আরো এক প্রতিভাবানকে, তিনি ফকির লালন সাঁই। তাই তো তিনি লালন-এর গান সংগ্রহ করে বই আকারে ছেপেছিলেন। হার্ভার্ড বক্তৃতায় তিনি লালনকে তুলে ধরেছিলেন বিশ্ব সাহিত্যের আসরে।প্রতিভাবানরা সর্বকালেই পাগল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছে। যাদের চিন্তার পারম্পর্য আছে। যিশু, সক্রেটিস, আইনস্টাইন, গ্যালিলিও, ভলতেয়ার, ভ্যানগগ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাধর। পাগল এবং প্রতিভার ফারাক সামান্যই -লক্ষণের গণ্ডির এ পাশ ও পাশ।যারা জনসমাজ তোলপাড় করেন, তাদের জানা সহজ। যেহেতু তাদের কাজের বাস্তব রূপ বা চিহ্ন আছে। আমরা যুগান্তকারী ধর্ম প্রবর্তক, পরাক্রমশালী রাজা-বাদশা, দিগিজয়ী যোদ্ধাদের সম্পর্কে অল্প বিস্তর জানি। জানি না শুধু কবি, সহিত্যিক ও দার্শনিকদের। আমরা কবি-সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নাড়াচাড়া করি, বিশ্লেষণ করি; কিন্তু তার রচনা নিয়ে ভাবি না, পড়ি না বা বিশ্লেষণ করি না। অবশ্য কবির ভাবনা একান্তই তার নিজস্ব। কারণ আমরা যা দেখতে পাই না, কবি চোখ মেলে তা দেখেন; আমরা যা শুনতে পাই না, তিনি তা কান পেতে শোনেন। কবি কাজ করেন নীরবে। তার কাজ সাধারণের চোখে পড়ে না, মনে ধরলেও ধরতে পারে। সে মনে ধরাটাতেও মানুষে মানুষে ভিন্নতা থাকে। এ কারণেই হয়তোবা কবিতাকে বলা হয় ‘সাহিত্যের মা’।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘সহিত-ত্ব’ থেকে সাহিত্য কথাটির উৎপত্তি। যার মৌখিক অর্থ হচ্ছে মিলন বা সাহচর্য। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক কোন গুণে ঘনিষ্ঠ, কোন দোষে বিচ্ছিন্ন -এই নিয়ে যার কারবার তারই নাম সাহিত্য। সাহিত্য মানুষের আত্মীয়বোধকে জাগিয়ে দেয়। সাহিত্য চর্চার অপর নাম আত্মীয়তার চর্চা। এ জন্য সাহিত্যিককে দুই অর্থেই সাহিত্য চর্চা করতে হয় অর্থাৎ একদিকে যেমন সাহিত্য রচনা করবেন অপরদিকে তেমনি মানুষের সাহিত্য বা সাহচর্যের চর্চা করতে হবে। পৃথিবীর কোনো মানুষই ফ্যালনা নয়।

চলমান জীবনের স্রোত থেকেই সাহিত্যের মালমশলা সংগ্রহ করতে হবে। চতুষ্পার্শ্বে যা ঘটছে এবং তার ফলে সমাজে যে আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে সাহিত্যে তার প্রতিফলন তো হবেই, তা ছাড়া ওই সব ঘটনাবলি এবং তজ্জনিত সামাজিক পরিবর্তনাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের গতি এবং গন্তব্য স্থির করতে হবে। বলা বাহুল্য এই থিওরি সাহিত্যসেবীদের তৈরি নয়, সমাজসেবীদের তৈরি। সাহিত্য ইতিহাসের অনুচর নয়। ইতিহাস এবং সমাজের যেটুকু প্রাপ্য সাহিত্য সেটুকু তাদের অবশ্যই দেবে এর বেশি নয়। সাহিত্যের জীবন অনেক বা ঢের বেশি গভীর। ইতিহাস অগভীর জলের প্রাণী, জীবনের প্রবল স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পৃথিবীর কত যুদ্ধ, কত বিপ্লব, কত রাজ্য-সাম্রাজ্য কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে গেছে -'রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।' অথচ কত ক্ষুদ্র ঘটনা কত সামান্য জিনিস - ইতিহাস যার দিকে ফিরেও তাকায়নি -কবি মনের জাদুস্পর্শ পেয়ে হাসিকান্নায় হীরা-পান্নার মতো আজো জ্বলজ্বল করছে। সাহিত্য যথার্থই যা মূল্যবান তাকে মূল্য দিতে জানে। চলমান ইতিহাস তড়িঘড়ি চলতে গিয়ে নিত্যকালের অনেক কিছুই বাদ দিয়ে যায়।আর ইতিহাসের বয়সই বা কত? পৃথিবীর তুলনায় সে তো শিশু। মাত্র সেদিন তার রূপ। মহাকবিরা পৃথিবীর কবি, ইতিহাসের কবি নন।সাহিত্য বা কাব্যের উৎস্য সন্ধান করতে হলে ইতিহাসের যুগকে ছাড়িয়ে অতি দূর অতীতে যেদিন এই পৃথিবীর বুকে প্রথম সূর্যকিরণ স্পর্শ করেছিল সেই দিনটিতে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। সেই আদিম যুগে পৃথিবীর বুকে যখন প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল সেই প্রাণেই ছিল কাব্যের উৎস। মানুষ যখন থেকে মানুষ তখন থেকেই, জেনে হোক, না জেনে হোক -সেই মনুষ্যত্বের উন্মেষের কাল থেকেই মানুষ শিল্পী এবং সাহিত্যিক। একটি আদিকাল আমরা কল্পনা করতে পারি যখন শিল্প ছিল, সাহিত্য ছিল, মানুষ সহজভাবে স্বাভাবিকভাবে শিল্প ও সাহিত্য উপভোগ করত কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে স্বতন্ত্র্যভাবে খুব বেশি সচেতনতা ছিল না। তখন শিল্পতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বও ছিল না। যখন থেকে স্রষ্টা নিজের সৃষ্টির সম্পর্কে সচেতন, পাঠক বা ভোক্তা নিজের সাহিত্যসম্ভোগ শিল্পসম্ভোগ সম্পর্কে সচেতন, সাহিত্য চিন্তা শিল্পচিন্তার সূত্রপাত তখন থেকেই। সব চিন্তার মতো সাহিত্যচিন্তারও শুরু

জিজ্ঞাসা থেকে।যেখানে আদত মানুষটি আছে অর্থাৎ যেখানে বুদ্ধি এবং হৃদয় বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলো এক সঙ্গে মিশে গিয়ে ঐক্যলাভ করেছে, তাকে বলা হয় মানবিক জীবন। সেখানেই সাহিত্যের জন্মলাভ। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ডভাবে প্রকাশ পায়। এই খণ্ড অংশগুলো বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি রচনা করে -পর্যবেক্ষণকারী মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে, চিন্তশীল মানুষ দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে। সাহিত্যের জগৎ চতুর্মাত্রিক অস্তিত্বের জগৎ নয়। সে যেন সদসদ্বিলক্ষণ। থেকেও নেই, না থেকেও আছে। এ যেন মায়ার জগৎ। দর্পণে প্রতিবিম্বিত অগ্নির মতো এতে দীপ্তি আছে কিন্তু দাহ নেই। রূপ আছে, রক্ত-মাংস নেই। দেশকালকে স্পর্শ করে, কিন্তু দেশ-কালের আলিঙ্গনকে ধরা দেয় না। অনেকটা স্বপ্নের মতো। কিন্তু অবিকল নয়। স্বপ্ন বাস্তবের দ্বারা বাধিত হয়, ভ্রান্তি বাস্তবের দ্বারা খণ্ডিত হয়। এ তা হয় না। বাস্তবের পাশাপাশি বিরাজ করে। স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে জানি না। ভ্রান্তিকে ভ্রান্তি বলে জানলে তার শক্তি চলে যায়। এর ক্ষেত্র উল্টো। সাহিত্যকে জীবন বলে জানলে সে ব্যর্থ হলো। সাহিত্য জীবন নয়। আবার সে স্বপ্নের মতো মিথ্যাও নয়, আবার জীবনের মতো সত্যও নয়। এটি হচ্ছে রূপের জগৎ। সাহিত্যের বাণী সংকেতের বাণী। সে সংকেত রূপের সংকেত। রূপটা জগতের -বলা বাহুল্য 'হৃদয়ের জগতের'। সে রূপ মানবিক তাৎপর্যের সূত্রে গ্রথিত। এই তাৎপর্যের পেছনে মানুষের মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল। এই মূল্যবোধের উৎস্য -শেষ পর্যন্ত-জীবন। সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে মূল্যবোধ ও জীবনবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্যে মানুষের বা সমাজের অন্ধকার দিকটিও প্রতিফলিত হয়। যা মানুষ চাঁদের অপর পৃষ্ঠের মতো সর্বদাই লুকাতে চায়।সাহিত্য এমন এক সুগন্ধি যা মানুষকে সুস্থ মানসিকতা নিয়ে বাঁচার অনুপ্রেরণা দেয়। সাহিত্য মানবতার ছায়া ছাড়া আর কিছু নয়। এক কথায় বলা যায়, সাহিত্য চিন্তাই আত্মার চিন্তা স্বরূপ।

কবিতার অনুষঙ্গ আলোচনার পূর্বে কবিতা কী এটি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক। মানুষের অন্তরের চিন্তা-চেতনা যখন ভাবানুভূতির বর্ণবৈচিত্র্যে যথোপযুক্ত শব্দবিন্যাসে সুবিন্যস্ত চিত্রে ও ছন্দিত বিন্যাসে উপস্থাপিত হয় তখনই সে হ'য়ে ওঠে

কবিতা। এদেশের কবিদের মধ্যে কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। জগন্নাথ বলেন, 'যে শব্দ রমণীয় অর্থের প্রতিপাদক, তাহাই কাব্য' (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১১)। শ্রীশচন্দ্র দাশ বলেন, 'অসংখ্য শব্দ যখন কবির লেখনী মুখে ভিড় করিয়া আসে, তন্মধ্যে একটিমাত্র যথাযথ শব্দই কবিতায় ব্যবহারোপযোগী অপরিহার্য শব্দ; এই জাতীয় শব্দ লেখকের কল্পনা বা অনুভূতি-বিধগদ হইতে স্বতঃউৎসারিত বলিয়া ভাব প্রকাশের পক্ষে ইহা একান্ত উপযোগী' (সাহিত্য-সন্দর্শন, পৃষ্ঠা : ২৯)।মেকলে বলেছেন, 'কবিতা হচ্ছে সেই রচনা যেখানে শব্দ এমনভাবে ব্যবহৃত হয়, যাতে পাঠকের কল্পলোকে ঐ শব্দ একটি চিত্রিত সৌন্দর্যের বিশ্ব উন্মুক্ত করে দিতে পারে (বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, পৃষ্ঠা : ৬৯)। বস্তুত মানুষের বিশেষ ও তীক্ষè ভাবানুভূতি-ই কবিতা সৃষ্টির মূল উপাদান। অনেক কবিই একমত যে কবিতার মূল উপজীব্য বুদ্ধি বা হৃদয় নয়, তার শক্তিশালী কল্পনা, ভাব-বিলাসিতা বা তার চিত্রকল্প। কবিতা কখনও এতই বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে, তার ভাবানুভূতি কবিতার পশ্চাতে সর্বাধিক মুখ্য ও দীপ্রভাবে ক্রিয়া করে। শরতের আকাশ কবিকে প্রেমিকা, নদী এবং কাশফুলের কল্পলোকে বিচরণ করাতে সক্ষম। একজন সার্থক কবি প্রচন্ড রকমের কল্পনাবিলাসী হন। আধুনিক কবি তিনি যিনি, 'বিশিষ্ট কবি-প্রতিভা বিশিষ্ট কল্পনাবলে বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ বিষয়বস্তুকে পরিবেশন করিবার কবিদৃষ্টি বিশেষভাবেই বিশেষ নির্বিশেষ। সাহিত্যে কাব্যের বিষয়বস্তু অপেক্ষা উহার বিশিষ্ট রূপসাধনাই অধিকতর গৌরবের দাবি করিতে পারে, (সাহিত্য-সন্দর্শন, শ্রীশচন্দ্র দাশ, পৃষ্ঠা : ৩২)। এই বিশিষ্ট রূপদান শুধুমাত্র কবির কল্পনা শক্তির দ্বারাই সম্ভবপর।একটি কবিতার পিছনে থাকে তার সততা ও শুদ্ধতা। তাকে ভাব ও ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। কবিতা শব্দাশ্রয়ী হলেও তাকে সালংকারা না দেখলে যেন কিছুটা নিরাভরণ বা সাদাসিধে মনেই হতে পারে। এ ছাড়া আধুনিক কবিতায় পাঠক একটি ন্যূনতম চিত্রকল্প আশা করেন। এ ছাড়া কবিতাকে ছন্দাশ্রয়ীও হতে হবে। কবিতা হচ্ছে কবির নিজস্ব এক সুশৃঙ্খল ভাবনার অভিব্যক্তি। তাই তা সর্বদাই ছন্দোবদ্ধ, ও প্রয়োজনীয় শব্দের বাহক।কবিতার ক্ষেত্রে কেউ এর ভাষা আবার কেউ কেউ এর বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য

দিয়েছেন। তবে কবিতার ভাষা ও বিষয়বস্তু দুটিরই যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। নচেৎ কবিতার শরীর দুর্বল হতে বাধ্য। ফরাসি কবি স্তেফান মালার্মে এই ধারণার অনুসারী। আমাদের মুখনিসৃত ভাষা ও গদ্যের ভাষা এ দুটির ভাষা থেকে পৃথক। কবিতা ছন্দোবদ্ধ বলেই আমাদের মুখ নিসৃত কথ্য বা চলিত ভাষার সঙ্গে এর একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। কবিতা অনেকেই গদ্যের মতো বড় কলেবরে লেখেন। তবু এটি কবিতাই, কারণ এর ছন্দ কবিতার মতোই। তবে অন্তমিলের কবিতা এভাবে লেখা সম্ভব না। কবিতার প্রবাহমানতা বা গদ্য ছন্দের জন্যই তা সম্ভবপর। এ ছাড়া কবি যা লেখেন সেটুকুই কবিতা নয়। এর মধ্যে থাকতে পারে কিছু অনুক্ত বক্তব্য। এটাই আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে 'শব্দের প্রয়োগমূল্যের চেয়েও কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থব্যঞ্জনার মূল্য অনেক বেশি।' (কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা, মাহফুজউল্লাহ, পৃষ্ঠা : ১৭)। গদ্য কবিতার ভাষা যে কিছুটা পৃথক এ কথা স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই স্বীকার করে গেছেন। তিনি সেক্ষেত্রে 'তার', 'সনে', 'মোর' এ জাতীয় শব্দ পরিহার করেছেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির স্বাধীনতা আছে। বাংলা সাধু ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে গদ্য দোষযুক্ত হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অপরিহার্য হতে পারে। যেমন কবি জীবনানন্দ দাশ তার 'বনলতা সেন' কবিতায় লিখেছেন, 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি, পৃথিবীর পথে'। এখানে কবি হাঁটিতেছি না লিখে যদি চলিত ভাষা হাঁটছি লিখতেন তাহলে ছন্দ পতন হতো। ছন্দের অপরিহার্যতার জন্য কবিতায় সাধু-চলিতের ব্যবহার হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কবিতার ভাষা তাই, 'মুখের ভাষা থেকে আলাদা, আবার গদ্যের ভাষা থেকেও বিশিষ্ট' (পবিত্র সরকার) যেমন কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের এক দিন' কবিতায় তিনি যা লিখেছিলেন তার অতিরিক্ত এক অনুক্ত কথা পাঠককে ভাবায় তাকে চিন্তার অতলে টেনে নিয়ে যায়। যেমন

কোনদিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম---অবিরাম ভার

এইকথা বলেছিল তারে

চাঁদ ডুবে চলে গেলে -অদ্ভুত আঁধারে

যেন তার জানালার ধারে

উঠের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা এসে।

ফলে কবিতা হতে পারে প্রতীকাশ্রয়ী, রূপকাত্মক, ধ্বনিবহুল, চিত্রবহুল কিংবা সালংকরা। তিনি 'বনলতা সেন'-এ লিখেছেন, 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে';

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তার 'সাগর থেকে ফেরা' কবিতায় লিখেছেন,

নীল! নীল!

সবুজের ছোঁয়া কিনা তা বুঝি না,

ফিকে গাড় হরেক রকম

কম বেশী নীল!

তাঁর মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল

কটা গাঙ চিল।(সাগর থেকে ফেরা)

কবিতা মূলত গদ্যের ছন্দিত রূপ। কবিতায় স্বরবিত্ত ছন্দ, মাত্রাবিত্ত ছন্দ, অক্ষরবিত্ত ছন্দ ছাড়াও ত্রিপদী ছন্দ, গৈরিশ ছন্দ, মুক্তক ছন্দ এসবের মিশ্রিত বিভিন্ন ছন্দ আছে। এরপরেই গদ্য ছন্দের স্থান। মাইকেল মধুসুদন দত্ত যেমন স্বার্থক অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, পরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুক্তক ছন্দ এবং গদ্য ছন্দের মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করেছিলেন। 'গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদের সময় তিনি অন্তমিলের পরিবর্তে মুক্ত ছন্দ ব্যবহার করেন। এই বিষয়টিই তাকে গদ্য ছন্দ লিখতে অনুপ্রাণিত করে। গদ্য ছন্দে পর্ব সৃষ্টিতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। পদ্যের পর্ব যতিনির্ভর বলেই তাকে ধ্বনিপর্ব বলা হয়। কিন্তু গদ্য ছন্দে আবেগ ও ভাবের ওপর নির্ভর করে পর্ব তৈরি হয়। যেজন্য একে অর্থপর্ব বা ভাবপর্ব বলা হয়ে থাকে। যেমন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর শাশ্বতী কবিতায় লিখেছেন

শ্রান্ত বরষা, অবেলার অবসরে,

প্রাঙ্গণে মেলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;

স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে

গগনে-গগনে পলাতক আলো-ছায়া।

আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;

হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :

মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,

মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।

কুহেলীকলুষ, দীর্ঘ দিনের সীমা

এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;

বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা

রঞ্জিত হবে দলিত শেফালি শেজে।

মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকী,

নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা :

পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি ;

একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—

মনে হয় যেন শত জনমের আগে—

সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে,

চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে ;

সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া

মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;

অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া

খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।

একটি কথার দ্বিধাথরথর চুড়ে

ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;

একটি নিমেষে দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,

থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;

একটি পণের অমিত প্রগলভতা

মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে

একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা

প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।।

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সগৌরবে ;

অধরা আবার ডাকে সুধাসংকেতে,

মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে

অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।

ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,

অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে ;

অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি

স্বাতি মণিময় তারই প্রত্যভিষেকে।

স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম ;

সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে-ঘাসে ;

পুনরাবৃত্ত রসনায় প্রিয়তম ;

কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে

আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা :

সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে

আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ।।

ভাব, ভাষা বা ছন্দের পর এর চিত্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা যাক। এর আবিষ্কারক কে ছিলেন তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ড. শ্যামকুমার ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখকবৃন্দ

মনে করেন, শব্দটির প্রথম উদগাতা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তবে কবিতায় চিত্রকল্প থাকাটা অত্যাবশ্যক নয়। চিত্রকল্পবিহীন বহু কবিতাও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে ইংরেজি শুদ্ধ রূপ কে বাংলায় চিত্রকল্প আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'চিত্রকল্প' শব্দ বলতে আমরা কী বুঝি? খুব সাধারণ ভাষায় বলা যায়, কবিতায় শব্দবিন্যাসের প্যাটার্ন বা আকারকে 'চিত্রকল্প' বলা হয়। অর্থাৎ কবির ভাবানুতির চিত্রই 'চিত্রকল্প'। ড .জীবেন্দ্র সিংহ রায় এ প্রসঙ্গে খুব চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'যদি কোনো অলংকারের মধ্যবর্তিতায় বা অন্য কোনো ধরনের তুলনায় সূত্রে একটি চিত্র থেকে অধিক দূরসঞ্চারী ও গূঢ়গম্ভীর আরেকটি চিত্র পাওয়া যায় তবে তাকেই বলে চিত্রকল্প। কবি জীবনানন্দ দাশ তার 'ঘাস' কবিতায় লিখেছেন,

এই ঘাসের শরীর ছানি-চোখে চোখ ঘষি
ঘাসের পাখনায় আমার পাজক,
ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।'

চিত্রকল্প দুই ধরনের হয়ে থাকে। যে চিত্রকল্প উপমা-উৎপ্রেক্ষার সংযোগে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ চিত্রকল্প। যেমন 'মুখখানি তার ঢলঢল ঢলেই যেত পড়ে / রাঙা ঠোঁটের লাল বাঁধনে না রাখলে তায় ধরে।' অন্যদিকে যে চিত্রকল্প কবিতার শরীরে গুপ্ত থাকে, পাঠক যখন বিষয়টি অনুধাবন করে পুলকিত হন তাকেই পরোক্ষ চিত্রকল্প বলে। যেমন,

শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়---
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি সূর্যোদয়।

এখানে 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়' বক্তব্যে কবি যা প্রকাশ করেছেন তার বাইরেও অনুক্ত কথা আছে। যা পাঠককে ভাবায় এবং বিষয়টি অনুধাবন করতে পারলে এক অনাস্বাদিত পুলক অনুভব করে।

কবিতার আরও একটি অনুষঙ্গ এর অলংকার। লেখক হাবিব রহমান তার 'বাংলা ছন্দ

ও অলংকার' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সংস্কৃত "অলম" থেকে অলংকার শব্দটির জন্ম। অলম শব্দের একটি অর্থ হলো ভূষণ। কাজেই যা দিয়ে ভূষণ করা হয় তাই-ই অলংকার।' সাহিত্যে অলংকারের ব্যবহার বহু আগে থেকেই হয়ে আসছে। প্রাচীন যুগের বোদ্ধারা বিষয়টি নিয়ে এতটাই উদগ্রীব ছিলেন যে, এটি যেন এক আলাদা শাস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে একে অলংকার শাস্ত্র বলা হতো। একে সৌন্দর্যবিজ্ঞান বা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। তারা ভাবতেন কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে অলংকার অপরিহার্য। তবে আধুনিক যুগের কবিরা মনে করেন অলংকার ছাড়াও কাব্য সৃষ্টি করা সম্ভব। ধ্বনিবাদীরা এই ধারণার অধিকারী। তাদের ধারণা কবিতা তখনি কবিতা হয়ে ওঠে যখন সেখানে বস্তু, রস ও অলংকার ধ্বনি সংযুক্ত হয়। সাধারণত বাক্যের অন্তর্বর্তী শব্দ উচ্চারণের সময় এর ধ্বনিরূপ কর্ণগোচর হয় এবং সেই সঙ্গে এর অন্তর্গত অর্থ বা অনুমিত হয়। "শব্দের ধ্বনিরূপ আমাদের কর্ণগোচর হয়, আর অর্থ হয় আমাদের মনোগোচর (হাবিব রহমান, বাংলা ছন্দ ও অলংকার)। অর্থাৎ এর সুসংযত ও সুশ্রাব্য সংশেষ যেমন কানকে পরিতৃপ্ত করে তেমনি অর্থের অভূতপূর্ণ ব্যঞ্জনা আমাদের মনকেও মুগ্ধ করে তোলে। ধ্বনিরূপ ও অর্থরূপের সাহায্যে দুই ধরনের অলংকার সৃষ্টি হয়-শব্দালংকার এবং অর্থালংকার। শব্দালংকারের মধ্যে আনুপ্রাস, যমক, শেষ, বক্রোক্তি ও পুনরুক্তবদাভ্যাস প্রধান। আপাতত অর্থালংকার নিয়েই কিঞ্চিৎ আলোকপাত করতে চাই। কবিতায় তার অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি হয় যে নির্মিতি সেখানে উপমার একটি বিশেষ স্থান আছে। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান তার 'কবিতার রূপকল্প' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, 'কাব্য শব্দ বা বাক্য একটি বিশেষ সংহতি এবং ধ্বনিবৃত্তির সাহায্যে বক্তব্যকে মুক্ত করে। যে কৌশল অবলম্বন করে একজন কবি তার বক্তব্যকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকাশ করেন তার মধ্যে উপমা একটি আশ্চর্য কৌশল।' আধুনিক কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। যখন কোনো বাক্যে বিশেষ গুণ, ধর্ম বা ক্রিয়ার ভিত্তিতে ভিন্ন জাতীয় দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা তুলনা করা হয় তখন উপমা অলংকার তৈরি হয়। কবি মোহিতলাল মজুমদার তার 'সাহিত্য-বিচার' গ্রন্থে লিখেছেন, "এক বস্তুকে অপর বস্তুর দ্বারা রূপকে ভাবে এবং

ভাবকে রূপে; সাদৃশ্য যোগে ফুটাইয়া তোলার যে কাব্য সৃষ্টি তাকেই উপমা বলিতেছি।" উপমাকে কবি জীবনানন্দ দাশ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'উপমাই কবিতা'। উপমা কবিতার শরীর ও প্রাণও বটে। উপমাকে যথার্থরূপে প্রয়োগ করতে পারলে তা অত্যন্ত সুষমামণ্ডিত ও ঋদ্ধ মনে হয়। কোলরিজ বলেছেন যে, কবিতা যদি 'সুন্দরতম শব্দের সুষম বিন্যাস হয় তাহলে কবিতায় উপমা অপরিহার্য।' কখনও কখনও কবিতায় উপমা এত ঋদ্ধ হয়ে ওঠে যে উপমাই যেন একটি কবিতা হয়ে ওঠে। যেমন,

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল আকাশে একতিল ফাঁক ছিলো না
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা
চোখের মতো ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল
চামড়ার শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ
কাল এমন রাত ছিল।

(হাওয়ার রাত, জীবনানন্দ দাশ)

কবি এখানে প্রকাশ করেছেন যে, আকাশের সমস্ত নক্ষত্রেরা ঝলমল করছিল শিশির-ভেজা প্রেমিক চিলপুরুষের চোখের মতো। তিনি অন্ধকারে জেগে থাকা রিরংসু চিলপুরুষের চোখের সঙ্গে নক্ষত্রের আলোর তুলনা করেছেন। এক অসাধারণ উপমা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপমা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তাই উপমা হলেই চলবে না উপমার মধ্যে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা থাকাটাও বেশ জরুরি।

অন্যদিকে উৎপ্রেক্ষা শব্দের অর্থ উৎকট জ্ঞান। কখনও সংশয় বা মিথ্যা কল্পনা। উৎপ্রেক্ষার নানাবিধ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ১) উপমান, ২)উপমেয়, ৩) তুলনামূলক শব্দ এবং ৪) সাধারণ ধর্ম। যেমন 'রোদের রঙ শিশুর গালের মতো লাল'। এখানে শিশুর গাল-উপমান) যাকে তুলনা করা হয়(, রোদের রং -উপমেয় (যাকে তুলনা করা হয়), সাধারণ ধর্ম-লালিমা (যে গুণ, ক্রিয়া বা ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা হয়) এবং তুলনামূলক

শব্দ-মতো(এ ছাড়া যেন, হেন, মম, ন্যায়, যথা, প্রায়, তুল্য ইত্যাদি শব্দ দ্বারা তুলনামূলক শব্দ প্রকাশ করা হয়)। তবে উপমায় এই চারটি বৈশিষ্ট্যই একসঙ্গে অপরিহার্য নয়। যেমন 'বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোরে। এখানে শিশুরা-উপমান, বন্যেরা-উপমেয়, সুন্দর-সাধারণ ধর্ম। কিন্তু তুলনামূলক বা সাদৃশ্যবাচক কোনো শব্দ নেই।

'তড়িত-বরনী হরিণ-নয়নী
দেখিনু আঙিনা মাঝে'

এখানে তড়িত-বরনী ও হরিণ-নয়নী হচ্ছে উপমেয়। এখানে উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং তুলনামূলক শব্দ নেই। যার বর্ণনা করা হয়েছে তিনি রাধা। আবার উপমেয় একটি হলেও উপমান একাধিক হতে পারে। যেমন,

'আমার হৃৎপিন্ডের মতো
আমার সত্তার মতো
আমার অজানা স্নায়ুতন্ত্রের মতো
সর্বক্ষণ সত্য আমার দেশ'।

এখানে দেশ উপমেয়, উপমান একাধারে হৃৎপিন্ড সত্তা, অজানা।তুলনামূলক শব্দ মতো। তবে সাধারণ ধর্ম অনুপস্থিত। উৎপ্রেক্ষা কবিতার মানকে উচ্চাঙ্গে পৌঁছে দেয়। উপমানের অভিনবত্ব এবং দক্ষতার ওপর এর আলংকারিক সৌন্দর্য পাঠককে বিমোহিত করে তোলে। উৎপ্রেক্ষা সর্বদাই পঠকের অনুভূতি ও কল্পনাকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দান করে। তিনি যেন এক নতুন ব্যাখ্যা খুঁজে পান। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র 'পথ' কবিতায় লিখেছেন,

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে;-
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদকশান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।

শ্রান্ত উটের পায়ে পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,

চমরীর খুরে লেগেছে বরফ-গলা কাদা!

বাদক্শানের চুনি আর খোটানের নীলার নিষ্ঠুর ঝিলিক-দেওয়া,

ভেঙ্গে-পড়া ক্যারাভানের কঙ্কালে আকীর্ণ,

লুব্ধ বণিক আর দুরন্ত দুঃসাহসীর পথ-

লাদকের কস্তুরির গন্ধ যেখানে আজো আছে লেগে পুরানো স্মৃতির মতো।

সেই সব মধুর পথের কথা ভাবি;-

আকাশের প্রচন্ড সূর্যকে আড়াল-করা

দু'ধারের দীর্ঘ দেওয়ালের

শ্যাওলাগন্ধ ছায়ায় ছায়ায় সংকীর্ণ সর্পিল পথ,

সাপের মতো ঠান্ডা পাথরে বাঁধানো।

ভাঙা ধাপ দিয়ে উঠে-যাওয়া,

ঝিলমিল-দেওয়া বাতায়নের নিচে থমকে-থামা,

ধূপের গন্ধে সুরভি; দেবায়তনের দ্বারে ভূমিষ্ঠ-হওয়া পথ।

ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করি সে-পথ;-

ঘন ঘাসের বনে, শিকার ও শ্বাপদের নিঃশব্দ সঞ্চরণের 'ঠৌরি';-

যুগযুগান্ত ধ'রে দুর্বল ও ভীত, হিংস্র ও নির্মম পায়ে মাড়ানো ।

যে পথে তৃষ্ণার টানে চলে ভয়-চকিত মৃগ;

অন্ধকারে শাণিত চোখ চমকায়।

যে-পথ কুরুবর্ষ থেকে বেরিয়ে এল রক্তাক্ত,

দুর্বার তাতার বাহিনীর অশ্বক্ষুর-বিক্ষত;

করোটি-কঠিন যে পথে

তৈমুরের খোঁড়া পায়ের দাগ।

স্বপ্ন দেখি সে-পথের,

অস্তাচল উত্তীর্ণ হয়ে আগামী কালের পানে-

স্বপ্ন যেখানে নির্ভীক,

বৃদ্ধের চোখে শিশুর বিস্ময়,

পৃথিবীতে উদ্দাম দুরন্ত শান্তি।

উৎপ্রেক্ষা যেন অর্থালংকারের মাঝে এক দ্বৈত দ্যোতনা। উৎপ্রেক্ষায় উপমেয়কে কোনোভাবে তুচ্ছ জ্ঞান না করে তাকে বরং আপন করে উপমানকে কল্পলোকে অবিরত দোলায়িত করে এক জাতীয় তুলনা বা বিসদৃশ্য তুলনা করে অর্থালংকার তৈরি করা হয়। কবিতা কবির হৃদয় মন্থিত কল্পনা, স্মৃতি, বাসনা, আকাঙ্খা ও প্রজ্ঞার সজ্ঞান ঢেউয়ে এক বিমূর্ত অনুভূতি তৈরির প্রচেষ্টা। কবি এখানে অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যকে বের করে নিতে প্রতিজ্ঞ। যা দিয়ে তিনি পাঠককে পুলকিত, আলোড়িত এবং উদ্দীপ্ত করে থাকেন। কবিতার শব্দ যদি হয় শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ; উপমা-উৎপ্রেক্ষা হচ্ছে যা তাকে সজীব ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই আধুনিক কবিতা সচেতন শব্দ, চিত্রকল্প, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থ, ছন্দ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সংমিশ্রণে গঠিত একটি সুগঠিত রচনা। এখনকার কবিতা যতটা দেখা বা শোনার, তার চেয়েও যেন বেশি উপলব্ধির। বনলতা সেনের চোখ শুধুমাত্র চোখ নয়, পাখির নিড়ের মতো কবির এক নিরাপদ আশ্রয়-শান্তির নিবাস। ক্ষুধিত মানুষের কাছে একটি রুটী যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলসানো-ক্ষুধাকে নিবৃত করে না। তাই অতীতের কবিতার চেয়ে আধুনিক কবিতা আরও বেশি দার্ঢ্য আরও বেশি বাঙময়। শনিবারের চিঠি' যে কবির কবিতায় সীমাহীন বিদ্রুপ হেনেছে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাঁকে কবি বলে স্বীকৃতি দেন নি, আবার বুদ্ধদেব বসু যাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা পড়েই বুঝেছিলেন বাংলা সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল তারকার আবির্ভাব ঘটতে চলেছে, তিনি আমাদের প্রাণের কবি, কবি জীবনানন্দ দাশ। একবিংশ শতাব্দির পাঠকদের কাছে এই নামটি এক বিস্ময়! নবীন সাহিত্যানুরাগীরা ভেবে পান না কিভাবে কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ঐতিহাসিক শব্দ, স্বদেশী চিত্রকল্প আর উপমার এমন শক্ত জাল বুনেছিলেন, নশ্বর পায়ে কেমন করে পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে পথ হাঁটা যায়, কেমন করে জীবন সবুজ হয়ে ফলে।বুদ্ধদেব বসুর মতে, নবীন কবি ও পাঠকদেরও স্মৃতিতে যেক'টি পঙক্তি ঘোরেফেরে তার মধ্যে

জীবনানন্দের লাইন সবচেয়ে বেশি। এ কথা আমাদের জন্য অনেক বেশি সত্য। জীবনকে খুব কাছ থেকে জেনেছিলেন কবি জীবনানন্দ। জীবনের গ্লানি, হতাশা, সংশয়, জাটিলতা বা জীবনের অকৃপণ দান কিছুই এড়ায়নি তাঁর কবিতায়। তাই হয়তো এমন অকাতরে পাঠকদেরকে নিজের মুদ্রাদোষে একা হওয়ার গল্প বলতে পেরেছিলেন তিনি।ত্রিশোত্তর কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে সাধারন মানুষের কবিতা বলে মানতে চান নি। অভিজ্ঞতার কথা তুলেছেন তাঁরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় সাধারন মানুষের পীড়ন-যন্ত্রনার কথা না থাকার কারণ হিসেবে কবির বিলাশবহুল, স্বচ্ছল জীবনকে দেখিয়েছেন তাঁরা। অভিজ্ঞতা যদি এমনই অনিবার্য হবে তবে কি জীবনানন্দ দাশ বেবিলনকে মিশর- 'অসুর' কুয়াশাকালে হারিয়ে যেতে দেখেছিলেন? সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, বিদর্ভ নগরে ছিলেন কবি? বেবিলোনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার জ্বলজ্বলে শাল দেখেছিলেন? অথবা গাঙুরের জলে ভেসে চলার সময় কোকিলের ডাক শুনে বেহুলার চোখে যে কুয়াশা ফুটেছিল দেখেছিলেন কি কবি তা? না ! কবি দেখেন নি। তবে এমন স্থান-কালজয়ী কল্পনাশক্তি কবি কিভাবে অর্জন করেছিলেন? জীবনের ভাঁড়ার শূন্য করে চলে যেতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। তিনি কি তা পেরেছিলেন? জীবন কতটুকু আশা নিয়ে ধরা দিয়েছিল তাঁর কাছে? যদিও লেখকের ব্যক্তিগত জীবনকে লেখার সাথে মেলানোকে সমালোচনার ত্রুটি হিসেবে দেখা হয়, তবু বলতে হয় এ সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য জীবনানন্দের মত নিঃসঙ্গ-একাকি কবির ক্ষেত্রে কবিতাই একমাত্র আশ্রয়।'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের একটি Argumentative কবিতা। আট বছর আগের এক মৃত্যুকে কবি তাঁর কবিতায় আত্মহননের রূপ দিয়েছেন। পুরো কবিতাজুড়ে আমরা কবিতার Narrator বা বক্তার ধাপে ধাপে জীবন ও জীবন ত্যাগের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিগুলো পাই। বক্তার এ সব যুক্তি তর্কের মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে কবি তাঁর নিজের জীবনদর্শন ইঙ্গিত করেছেন।

মন্তব্য

আমাদের সমাজ জটিলতাপূর্ণ, আমরা মূহুর্মূহু অস্তিত্বের বিপর্যয় অনুভব করি, বাস্তব জীবন ও আকাঙ্ক্ষিত জীবনের মাঝে ভারসাম্যহীনতায় আমাদের মাথায় বারবার আত্মহননের চিন্তা খেলে যায়। কবির সেই বোধই হয়তো 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় কবির মূল প্রেরনা হিসেবে কাজ করেছে। বধু-শিশু-প্রেম-আশা সবই ছিল মৃতের জীবনে। কোন নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নি সে, বিবাহিত জীবনের সাধে কোথাও কোন খাদ ছিল না। সময়ের উর্দ্ধতনে উঠে এসে বধূ জানতে দিয়েছিল মধূ আর মননের মধূ। হাড়হাভাতের গ্লানি, বেদনার শীতে তার জীবন কোনদিন কেঁপে ওঠে নি। এই কথাগুলোর সাথে কবি একটি শব্দজোড়ের সংযোগ ঘটিয়েছেন: 'বিপন্ন বিস্ময়', এই একটিমাত্র চাবি-শব্দজোড় পুরো কবিতাটাতে Foil হিসেবে কাজ করেছে। বিপন্ন বিস্ময় হয়তো শুধু মানবজাতির রক্তের ভেতরে খেলা করে, কীটপতঙ্গ-পশুপাখির রক্তে এর বালাই নেই। তাই ওরা হাঁপিয়ে ওঠে না, তাই বেঁচে থাকাই ওদের একমাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ ক্লান্ত হয় বৈচিত্র্যহীনতায়, ব্যর্থতায়, নিচ্ছিদ্র সুখে বা নিচ্ছিদ্র দুঃখে। মানুষ মোহিত হতে চায়, চমকে যেতে চায়, জীবনের প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে টান অনুভব করতে চায় – এসব কিছুকেই হয়তো জীবনানন্দ দাশ বিপন্ন বিস্ময়ের নাম দিতে চেয়েছেন। জীবনের প্রতি সেই নিচ্ছিদ্র আকুতি, গভীর অভাববোধ হয়তো মৃতের ছিল না। তাই কবি বলছেন–"কেন নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই, বিবাহিত জীবনের সাধ কোথাও রাখে নি কোন খাদ.....তাই লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে!" এই একই Idea'র সমান্তরালে কবি আর একটি Contrast Idea'র অবতারনা করেছেন। বক্তা যখন বলছে– "অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল", তখন পাঠকেরাও অনুমান করে, হয়তো জেগে থাকা বা বেঁচে থাকা তাকে কেবলি ভারাক্রান্ত করেছে। তাই উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা জানালার ধারে এসে তাকে বলেছে– "কোনদিন জাগিবে না আর"। হয়তো মৃত ব্যক্তি অনুভব করেছিল মানুষের জীবন পশুপাখি-পোকামাকড়ের জীবন থেকে অনেক বেশি আলাদা এবং জটিল। এভাবে জীবনানন্দ দাশ জীবনের একঘেয়ে, নিচ্ছিদ্র দুঃখ-বেদনা-ভারের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যখন আত্মহননেচ্ছা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কিন্তু পুরো কবিতাটিতে কবি মৃত্যুকে বীভৎস ও জীবনকে

কোমল থেকে কোমলতর রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। এ যেন কবির জীবনবিমুখ সকল পঠককে জীবনমুখি করে তোলার গুপ্ত প্রচেষ্টা। রক্তফেনামাখা মড়কের ইঁদুরের ঘাড় গুঁজে আধার ঘুঁজির বুকে পড়ে থাকার গল্প পড়ে পাঠক কোনদিন হয়তো ওভাবে মরতে চাইবে না।কবিতার শেষ স্তবকে এসে আমরা দেখি, সমস্ত যুক্তি-তর্ক ছাঁপিয়ে কবিতার Narrator জীবনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। সে তার প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচার মত বুড়ো হতে চায়, জীবনের ভাঁড়ার শূন্য করে যেতে চায়। পুরো কবিতাজুড়ে জীবনমুখিতা ও আশাবাদিতার যে আভাস পাওয়া যায় শেষ স্তবকে এসে কবি তাতে পূর্ণতা দান করেছেন। 'আট বছর আগের একদিন' প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে কবিতাটিকে আত্মহননেচ্ছার কবিতা বলাতে কবি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। হ্যাঁ। আমরা জানি কবিতাটি কতখানি জীবনলোলুপ করে তোলে আমাদের! কবির মত পাঠকেরও জীবনকে শেষ বিন্দু অব্দি শুষে নিতে ইচ্ছে হয়। লাশকাটা ঘরে অন্ধকারে মড়কের ইঁদুরের মত পড়ে থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যাত হতে হয়। অন্ধকার যেমন আলোকে মহিমান্বিত করে, সেভাবেই নিত্য দিনের দুঃখ-গ্লানির বিপরীতে জীবনের প্রতি আকুলতা আর আশাবাদীতা অনেক বেশি স্পষ্ট আর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধু তাঁর 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাতেই নয়, একই চিত্র দেখা যায় আরও অসংখ্য কবিতায়।কবি বাংলার মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তর ভালবেসেছিলেন। তাই বারবার আমরা তাঁর কবিতায় কার্তিকের নবান্নের দেশকে খুঁজে পাই। বাংলার রূপ-প্রকৃতি হয়তো কালের বিবর্তনে পলটে গিয়েছে, পালটে যাচ্ছে। শুধু জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতার খাতায় জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার সবুজ করুণ ডাঙ্গাটিকে ধরে রেখেছিলেন বলেই তাঁর পাঠকেরা যুগে যুগে রূপসী বাংলার রূপে কল্পনাকাতর হবে। কবি সবাইকে বলেছেন যেখানে খুশি চলে যেতে, তিনি এই বাংলার প'রে র'য়ে যাবেন। মানব জীবন ফুরালে তিনি আবার শঙ্খচিল, শালিখের বেশে ধানসিড়িটির তীরে বাংলাতে ফিরে আসবেন।কবি তাঁর কবিতায় মৃত্যুর কথা পেড়েছেন বহুবার। 'দূর পৃথিবীর গন্ধ' কবিতায় কবি বলেছেন একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে অচেনা ঘাসের বুকে ঘুমিয়ে যেতে বলে তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন মউরির মৃদু গন্ধে ভ'রে র'বে।

কবি মৃত্যুকে কোমল, সুখকর রূপ দিতে চেয়েছেন। 'যেদিন সরিয়া যাব' কবিতায় কবি বলেছেন সরিয়া যাবার দিন তার মনে কোন ক্ষোভ র'বে না। কারণ বাঙালির ভীড়, কীর্তন-ভাসান-গান-রূপকথা-যাত্রা-পাচালীর নরম নিবিড় ছন্দে তিনি তৃপ্ত হয়েছেন। 'হে হৃদয়' কবিতায় মৃত অরণ্যেরা জিজ্ঞাসা করছে— "কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে"। উত্তরে পরের স্তবকে Narrator বলছে—

"আমি তবু বলি: এখনো যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি", "ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার শত শত জলঝর্নার ধ্বনি"। 'সুচেতনা' কবিতায় কবি লিখেছেন— "পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন; মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে।" জীবন ও পৃথিবীর প্রতি কবির সুগভীর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে লাইনগুলোতে।

এই সমস্ত কবিতা বিশ্লেষণে জীবনানন্দ দাশের প্রবল জীবনমুখীতাকেই বারবার ফিরে পাই আমরা। জীবনানন্দ দাশ আমাদের দূর্বোধ্য, একাকি কবি। সমসাময়িক যুগের সমালোচকদের আক্রমণ কখনো তিনি তাঁর রসবোধ, wit, আর সহৃদয় বিশ্লেষণ দিয়ে প্রতিহত করেছেন, আবার কখনো চুপ থেকেছেন। কবির জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতা যেন তাতে কর্তব্যচেতনা, নগর জীবনের জটিলতা আর প্রাণহীনতার নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তিনি "ঊনিশশো চৌত্রিশের" কবিতায় লিখেছেন, 'আমরা যেন পিছনের জিনিস, এই মোটরকার অগ্রদূত'। কোটি কেটি মোটরকার তাঁর জীবনের স্থিরতা, অবসর, শান্তি ও অপেক্ষাকে নষ্ট করতে পারবে না, তিনি বলেছেন। নিজেকে পেছনের জিনিস ভাবতে ভালো লেগেছে তাঁর। এটা আরও স্পষ্টভাবে হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন, "আমি অতো তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাই না; আমার জীবন যা চায় সেখানে হেঁটে হেঁটে পৌঁছুবার সময় আছে, পৌঁছে অনেকক্ষণ ব'সে অপেক্ষা করবার অবসর আছে।" বার বার তাঁর এই পেছনে ফেরার চেতনা আমরা আরও অনেক কবিতায় দেখতে পাই। বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন' এও এই চেতনার প্রভাব রয়েছে। সেখানে ফিরে ফিরে আসছে কোন এক আদিম মানুষের কথা যে হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হাঁটছে। ঐতিহাসিক কোন জগতে, ঐতিহাসিক কেন যুগে তার বিচরণ

বারবার অনূরণিত হয়েছে– ‘সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে...’।

কবির ব্যক্তিগত জীবনেও আমরা দেখি শহরের যান্ত্রিকতায় কবি হাঁসফাঁস করেছেন। কবির বোন সুচরিতা দাশের ভাষায়, কবির কাছে ভাল সব কিছুর মানে ছিল বরিশালে তাঁর গ্রাম্য জীবনের মত। তবু শহর জীবনের হতাশা, জটিলতা, তাঁর কবিতাকে সার্বজনীনতার দিকে আরও একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

কবিতায় কবি তাঁর নিজের যুগকে উপস্থাপন করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর সময়কে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। সমসাময়িক কালের সমালোচক ও সাহিত্যিকেরা হয়তো এ কারনেই তাঁর লেখার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি। যে ব্যাখ্যা তাঁরা করেছেন কবি তার এক চতুর্থাংশও সমর্থন করেন নি।

বুদ্ধদেব বসু তাঁর ‘কালের পুতুল’ গ্রন্থে এভাবে লিখেছেন—

বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর(জীবনানন্দ দাশ) আসনটি ঠিক কোথায় সে বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তার কোন প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেইসব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করেছে।

কবি বুদ্ধদেব বসুর ঈর্ষাভাজন সেইসব নাবালকদের পক্ষ থেকে বলা যায়, জীবনানন্দ দাশ হয়তো বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান কবি। তাঁকে ছাপিয়ে বাংলার নদী-মাঠ-শ্বশান-ফণীমনসার ঝোপ-শটিবন পেরিয়ে নতুন কোন কবির আবির্ভাব ঘটতে বহু দিন-মাস-ঋতুর আবর্তনের প্রয়োজন হবে বোধ করি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধিন্দ্রনাথ দত্ত প্রায় একই সময়ের জাতক। একজন ১৯০৪ সালে; আরেকজন জন্মগ্রহণ করেন ১৯০১ সালে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনান্দ দাশের মত প্রায় কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই ঘোষণা দিলেন: ‘আমি কবি,- সেই কবি-/ আকাশের পানে আঁখি তুলি হেরি ঝরা পালকের ছবি।এই কাব্যগ্রন্থে গ্রন্থিত কবিতার মধ্যে- নীলিমা, ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার কুমার, একদিন খুঁজেছিনু যারে-, কবি, সারাটি রাত্রি তারাটির সাথে তারাটিরই কথা হয়- কবিতাগুলো

শিরোনাম বিচারে যেমন, তেমনি বয়ন ও বয়ানকৌশলেও সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে। তার মানে- পাঠকপ্রিয়তা বেড়ে গেলো এমন নয়; তবে বোদ্ধা পাঠক (বিশেষত তরুণরা) একটু নড়েচড়ে বসলো। সাগর থেকে ফেরা কবিতাটি গ্রন্থিত হওয়ার আগে সকলে কল্লোল গোষ্ঠীর এই নতুন লেখক এর আবেগ নিয়ে চিন্তিত ছিল।

কিন্তু সকলে দেখলেন -কাব্যগ্রন্থটি কবির খ্যাতির দ্যোতক হয়ে উঠলো না। সেখানে সুধিন্দ্রনাথ কাব্যলক্ষ্মীকে যেন একটু বেশিই পক্ষপাতিত্ব করলো। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থিত কবিতার মধ্যে-অক্রেষ্ট্রা, সংবর্ত, ক্রন্দসী, দশমী, উত্তর ফাল্গুনী পাঠকপ্রিয়তা লাভ করলো। মানবী কাব্যের নায়িকা মানবী হয়ে উঠলো বাংলার ভূমিজ মানুষের অতি চেনা রূপের একটি শৈল্পিকবর্ণনাঋদ্ধ আদরীয়া কেউ; আবার একই সঙ্গে হয়ে উঠলো চিরায়ত বাংলার বিরহিণী বাঙালি নারীর প্রতিরূপ। জেসন কবিতা তো বাংলা কবিতায় প্রথম দীর্ঘ এলিজি এবং ড্রামাটিক মনোলগ-এ রচিত নতুন কাব্যরূপ। কবির খ্যাতির স্মারক হয়ে উঠলো এই কবিতা (যা কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগেই কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে মানুষের মুখে মুখে ফিরে)

অন্য দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্য মহিমা প্রকাশ করতে লাগল। পত্র-পত্রিকায় বের হতে থাকলো তাঁর অসাধারণ কিছু কবিতা। ‘জনাকি মন ’ ও ‘দশানন’ শিরোনামের কবিতা দুটো তার মধ্যে অন্যতম। আর লিখে চললেন গোপনে গল্প, গদ্য, আত্মকথন (ডায়েরি)। সুধিন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন ‘অক্রেষ্ট্রা’। ১৯৩৫ সালে। এবারও যথারীতি গুরুঠাকুরের আশীর্বচন চাইলেন। পাঠালেন এক কপি রবীন্দ্রনাথের নিকট। সঙ্গে লিখলেন ভক্তিপূর্ণ একটি দীর্ঘ চিঠি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যুত্তরে লিখলেন চিরকুট টাইপের একটি চিঠি : ‘কল্যাণীয়েষু, তোমার কবিতা পড়ে খুশি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। ইতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। খুবই সঙ্গত কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্র আনন্দিত হওয়ার মতো কিছুই ছিলো না এ চিঠিতেও। তাকিয়ে দেখার আনন্দ বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন-তা আজো এক বড় প্রশ্ন। দশানন কবিতায় এমন অনেক কথা আছে-যা বাংলার আর কোন কবি এভাবে লিখিতে পারতেন কিনা সন্দেহ।দশাননে কবি দেশের

পুরাতন রত্নভান্ডারকে নতুনভাবে উদ্ধার করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে আগত রাজ্যের বার্তা নিয়ে এসেছেন।

জীবনানন্দের জীবদ্দশায় (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রকাশিত হয় (জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলনসহ) মোট সাতটি কাব্যগ্রন্থ। প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) কাব্য, কাহিনীকাব্য, উপন্যাস, গীতীনাট্য, আত্মজীবনী, সঙ্গীত, অনুবাদ, ভ্রমণকাহিনি, শিশুতোষগ্রন্থ, সম্পাদিতগ্রন্থসহ প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ঊনচল্লিশের অধিক। কবিতায় মূলত সুধিন্দ্রনাথ ছিলেন নাগরিকবোধ সম্পন্ন নিসর্গ প্রেমিক । আর জীবনানন্দ ছিলেন প্রাকৃতবোধ সম্পন্ন প্রকৃতিপ্রেমিক। উভয়জনই কবিতায় নতুনের আমদানি করেছিলেন- যা পাঠকচিত্তকে দোলা দিয়েছে তাতে কোনো বির্তক নেই; তবে একজন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বীক্ষা উভয়কে কবিতায় স্থান দিলেন-রাবীন্দ্রিক ভাব-চেতনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। আরেকজন তথা প্রেমেন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করেও পাশ্চাত্যবীক্ষণকে মননে ধারণ না করে-সোজা হাঁটলেন গ্রামের মেঠোপথে; তবে তাতেও থাকলো রবীন্দ্রবিমুখতা- এই ছিলো মিল। উভয়ের কাব্যভঙ্গিমা একটু ধরা যাক :

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,-
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার,-রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,
চুল যার শাঙনের মেঘ,- আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে,- স্বপ্নে-কতদিন। (ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল, ঝরাপালক; জীবনানন্দ দাশ)

যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল- প্রেমেন্দ্র মিত্র

কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “প্রথমা” (১৯৩২) থেকে নেওয়া |

যাযাবর হাঁস নীড় বেঁধেছিল বন-হংসের প্রেমে,
আকাশ-পথের কোন্ সীমান্তে থেমে ;
সে কবে আমার মনে,
ডুবেছে বিস্মরণে |

আজি শুধু তার শূন্য নীড়টি ঘিরি,

হতাশ আশার উদাস অলস মৌমাছি মরে ফিরি |

বেদিয়ার মেয়ে মরু ছেড়ে হ'ল, মোতি-মহলের বাঁদী,

চঞ্চল চোখ বোরখাতে দিল বাঁধি ;

সে কবে আমার মনে,

ডুবেছে বিস্মরণে ;

আজি শুধু তার ত্যক্ত জীর্ণ ঘরে,

পুরানো স্মৃতির শ্রীহীন শুকানো পল্লব কেঁদে মরে |

শুক্‌নো চড়ায় সারাদিন করে শকুনিরা কলরব,

ঘাটে ভেসে লাগে শেফালি শিশুর শব |

আমার পরানে আজি,

উৎসব বেশে সাজি,

হৃদয়ের পথে কঙ্কালগুলি চলে |

বাসর-রাতের দীপ নিভে গেছে বিধবা-নয়ন-জলে |

... গেয়ে যায়; সুপ্ত পল্লী-তটিনীর তীরে

ডাহুকীর প্রতিধ্বনি-ব্যথা যায় ফিরে।

-পল্লবে নিস্তব্ধ পিক,-দিক হ'ল ম্লান,

ফুরায় না তবু হায় হুতাশীর গান! (ডাহুকী, ঝরাপালক; জীবনানন্দ দাশ)

ভবিতব্য' কবিতায় শেষের চারটি চরণও উল্লেখ করা যায় -"স্মৃতি পিপীলিকা তাই

পুঞ্জিত করে /আমার অন্ধে মৃত মাধুরীর কণা /সে ভুলে, ভুলুক কোটি মন্বন্তরে /আমি

ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।" অথবা "মোর কণ্ঠনালী / বদ্ধ যেন অগোচর যূপে;/

মৃত্যুর প্রবেশপথ রোমকূপে,/হৃদয়ের মহাশুন্য কম্পমান নির্বাণের শীতে;। কবিতাঃ

পুনর্জন্ম (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত)

এখানে বলে রাখি, ১৯২৯ সালে (১৩৩৬ বঙ্গাব্দে) প্রগতি'র ভাদ্র সংখ্যায় জীবনানন্দের

পূর্বাপর সব কবিতাকে ছাপিয়ে একটি কবিতা ছাপা হয় (পরে যা তাঁর 'ধূসর

পান্ডুলিপি'তে গ্রন্থাকারে অন্তর্ভুক্ত হয়)। কবিতাটিতে দৃশ্যমান হয় তাঁর জৈবনিক নৈরাশ্য-আত্মগ্লানি; না প্রাপ্তির অব্যাখ্যাত শিল্পিত তৃষা। তিনি বলেন :

[...] ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
অবহেলা ক'রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,
ঘৃণা ক'রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে;
আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,
আসিয়াছে কাছে,
উপেক্ষা সে করেছে আমারে,
ঘৃণা করে চ'লে গেছে-যখন ডেকেছি বারে-বারে
ভালোবেসে তারে; [...]

আর প্রেমেন্দ্র ও সুধিন্দ্রনাথের প্রকাশিত কবিটা গুলি জীবনানন্দের কাব্যগ্রন্থের উল্টো চিত্র :

প্রেমেন্দ্র মিত্র-

আমি কবি যত কামারের
আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
--- আমি কবি যত ইতরের !
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তার ভাই,
সমর যে হায় নাই !
মাটি মাগে ভাই হালের-আঘাত,
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,

নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী

সময় নাই যে হায় !

মাটির বাসনা পূরাতে ঘুরাই

কুম্ভকারের চাকা,

আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি

দুঃসাহসের পাখা,

অভ্রংলিহ মিনার-দন্ত তুলি

ধরণীর গূঢ় আশার দেখাই উদ্ধৃত অঙ্গুলি |

জাফ্‌রি-কাটানো জানালায় বুঝি

পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,

প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ

ঘনায় নিশীথ মায়া |

দীপহীন ঘরে আধো-নিমীলিত

সে দুটি আঁখির কোলে,

বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের

মধুর মিনতি দোলে |

সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,

বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে

সেথা যে চারণ চাই !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির

আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,

----আমি কবি যত ইতরের |

কামারের সাথে হাতুরি পিটাই

ছুতোরের ধরি তুরপুন,

কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই

জোয়ারের মুখে টানি গুণ !

পাল তুলে দিয়ে কোন সে সাগরে,

জাল ফেলি কোন দরিয়ায় ;

কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,

কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার-ঘায় |

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি

আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,

স্বপ্ন বাসরে বিরহিণী বাতি

মিছে সারারাতি পথ চায়,

হায় সময় নাই

তারপর জীবনানন্দ দাশ তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত নগরমানসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে যেভাবে প্রকৃতিমগ্নতার ধ্যান করেছেন-সুধিন্দ্রনাথ ঠিক সেভাবে করেননি।

সে জন্যই হয়তো সে সময়ের তরুণ কবিযশঃপ্রার্থী। মূলত- আমি মনে করি, তিনি যে ধারায় বাংলা কবিতাকে আধুনিকায়নের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সমুদ্যত হয়েছিলেন- সে ধারায় সত্যিকার অর্থেই আর কেউ অগ্রসর হয়নি। সে অর্থে তিনি যথার্থই পৃথিবীর শেষ কবি। অপরদিকে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যচৈতন্যকে ঠিক যে প্রেক্ষণসীমায় নিয়ে যেতে কৃতপ্রতীজ্ঞ ছিলেন- তা আজো অনেকের কাছে অনুসরণ্যই শুধু নয় অনিবার্যও কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্তু তাই বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অপাঠ্য হয়ে ওঠেননি। উঠবেনও না এই প্রতীতী রাখতে পারি।জীবনানন্দ অবশ্যই চিত্রের কবি। সেই চিত্রের মধ্যে বাংলাদেশই প্রধান, যে বাংলার নাম দিয়েছেন তিনি রূপসী বাংলা। রূপসী, কিন্তু সোনালি নয়, সোনার নয় আদৌ। এই বাংলা জাতীয়তাবাদী নয়, অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্ট, সঙ্কীর্ণ ও আস্ফালনকারী বাংলা নয় কোনো মতেই। এ বাংলা বরং নম্রতার, কৃষিকার্যের এবং বলা যায় অবক্ষয়েরও, যেখানে পচা শসা আছে, আছে হোগলা, আছে আঁশটের ও পেঁচার ঘ্রাণ, অথচ যার মুখ মায়ের মুখের মতো, যার সঙ্গে আমাদের যোগ প্রাণের, যোগ আবহমান কালের। জীবনানন্দ দাশ অনেক দূর দূর দেশে গেছেন, তাঁর

আমি হাজার বছর ধরে হাঁটছেন, কাল পার হয়ে, পার হয়ে স্থান, পার হয়ে মিশর, ব্যাবিলন, নিনেভ, কাবেরী, জাভা, ইন্দোচীন। কিন্তু সেইসব দেশ ও কাল যেন বাংলাদেশেরই সম্প্রসারণ। যেন চিরকালেরর বাংলাদেশই বিস্তৃত হয়ে, ব্যাপক হয়ে, সম্প্রসারিত হয়ে গেছে নানান বিন্দুতে নানান নাম ধরে। (জীবনানন্দ দাশের কবিতা, উত্তরাধিকার, জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা; এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৯৯)।

প্রেমেন্দ্র ও সুধীন্দ্র- যাঁদের চিত্তভূমির ভিত প্রোথিত গ্রামে, আধুনিক কবিতা পাঠে যাঁরা স্বস্তি পান না, দেখেন সেখানে অপরিচিত অনুভব, কৌশল দক্ষ হাতের, সংশয় ও বক্রোক্তি নানা প্রকারের, তাঁরা প্রভূত আনন্দ পান এই দুজনার কবিতা পড়ে। একদিকে তাঁরা ফিরে পান এই কবিতায় তাঁদের লুপ্ত অথবা অপসৃয়মাণ ছেলেবেলাকে, অন্যদিকে স্বস্তি পান এর পরিচিত ও বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে। মনে করেন গভীর কিছু, নির্ভরযোগ্য কিছু পেলেন। অর্থাৎ শহরের যে মধ্যবিত্ত পুঁজিবাদী সভ্যতার অনুরাগী, উদারনীতির সেবক, তিনিও পড়েন প্রেমেন্দ্র ও সুধীন্দ্র, কম পড়েন যদিও; আবার শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত, সামন্তবাদ শাসিত মানুষও পড়েন, অধিক পরিমাণে, অধিকতর আনন্দের সঙ্গে। তুলনায় কম শিক্ষিত গ্রামের মানুষ তো পড়েনই।

১৪.২ বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, ও অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

"অতন্দ্রিলা

ঘুমোও নি জানি

তাই চুপিচুপি গাঢ় রাত্রে শুয়ে

বলি শোনো,

সৌরভতারা ছাওয়া এই বিছানায় সুক্ষজাল রাত্রির মশারী

কতদীর্ঘ দুজনার গেলো সারাদিন,

আলাদা নিশ্বাসে- - -

এতক্ষণে ছায়া ছায়া পাশে ছুঁই

কি আশ্চর্য দুজনে দুজনা

অতন্দ্রিলা

হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পড়ে জোৎস্না

দেখি তুমি নেই" (দ্বিতীয় দ্রোহি)

হ্যা অতন্দ্রিলার এ কবিই আসলে অমিয়। ত্রিশোত্তর কবি হিসেবে পরিচিত বুদ্ধুদেব, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে পাশ্চাত্য অনুসঙ্গে বাংলা ভাষায় কলাকৈবল্যবাদি কবিতা রচনা করে নিজস্ব অস্তিত্বকে করেছেন অনুরণিত। ঐ কালপর্বে গণজাগরণের ঐক্যে বিভেদের ফলে সামাজিক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে; সমাজসচেতন কবিরা আশ্রয় গ্রহণ করেন রোমান্টিক স্বপ্নলোকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ২য় পর্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠেন গভীর দুখিবাদী। আর তাই সামাজিক বাস্তবতার পর, অস্তিত্ববাদী ধারায় কাব্যরচনা করেন বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) , অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), এবং বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮১) প্রমুখ কবিরা। ভারতের ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গের যুগে, হতাশা ও অনৈক্যের সময় এ কবিরা তাঁদের আদর্শ খুঁজে পান, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী (১৯১৯-১৯৩৩) ইউরোপের আত্মবাদী কবিদের মাঝে। ইউরোপিয় কবিদের ধারা অনুসরণ করে, অস্তিত্ব সংকটের ও মনোবেদনার চিত্র অঙ্কন করেন তাঁরা এক নতুন অর্কেস্ট্রায়। রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও উপস্থিতিতে ডেনমার্কের শ্বেতাঙ্গি ললনা হিওর্ডিস সিগোর (Hijordis Sigguard) সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন কবি। তারই প্রেম লাবণ্য মাখা স্পর্শ উপহার-এ লক্ষণীয়।প্রেমবোধে উজ্জীবিত হয়ে এ কবি আশ্রয় গ্রহণ করেছেন প্রকৃতিতে। বিষ্ণু দে – টি এস এলিয়টের লন্ডন ও বোদলেয়ারের প্যারিসের প্রতিধ্বনি শোনা যায় এ কবির কলকাতায়। কিন্তু এ পর্বে মফস্বলের দু কবি অমিয় চক্রবর্তী (গৌরিপুর, আসাম) ও বুদ্ধদেব বসু (নোয়াখালি কুমিল্লা) প্রকৃতি চেতনার সাথে ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সচিব থাকাকালীন (১৯২৬-১৯৩৩) সময়ে রচিত উপহার এ প্রাকৃতিক পরিবেশ,প্রকৃতিচেতনা ও প্রেমচেতনায় এসে মিশেছে অমিয় চক্রবর্তীর আধ্যাত্মিকতা। 'মহাকাল প্রণমিত বাণী' পূজা ঘর, চেতনায় ছোঁওয়া পুণ্য, ধেয়ান

উদয়াচলে, তাপস হৃদয়তলে, মরমে চেতনা সম, জ্যোতির শিখা, প্রভাত সূর্য্য আঙন, নিবেদিতা, ফুলের গীতা, আলোকের শুভ্র দৃষ্টি, প্রভৃতি শব্দব্যবহারে বিধৃত হয়ে আছে তাঁর আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ। কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে অবিনাশী আশাবাদে।অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে টমাস হার্ডির কাব্যের উপর ডি.ফিল গবেষণা পর্বে (১৯৩৪-১৯৩৭) খসড়া (১৩৪৫) রচিত --- এখানে তাঁর স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতায় এসে জড়িত হয়েছে বিজ্ঞানচেতনা। এ সময়েই স্পেন্ডার, অডেন, সিসিল ডে লুইস, লুই ম্যাকনিস প্রমুখের কবিতায় প্রবল হয়ে ওঠে বিজ্ঞান, যুক্তি আর যান্ত্রিকচেতনা। কবির মতে, বিজ্ঞান শুধু যে আমাদের প্রজ্ঞাই বাড়াচ্ছে তাই নয়, সে বিস্তৃত করছে সৌন্দর্যের সীমানা, উন্মুক্ত করছে নতুন রসের দিগন্ত। অুনবীক্ষণ যন্ত্র কেবল রোমান্টিকের সহজ বিস্ময়কে বিনষ্ট করেনি, অনেক অজানা সৌন্দর্যের সন্ধানও দিয়েছে। শুধু ফলিত বিজ্ঞান নয়, বৈজ্ঞানিক চিন্তাও (theories) অমিয় চক্রবর্তীকে নাড়া দিয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর মতে, সমষ্টির বিসঙ্গতি সমস্যার সমাধান হলেই ব্যষ্টির বিসঙ্গতি-সমস্যার সমাধান হয় না; সমষ্টিরি জন্য চাই বিজ্ঞানে কল্যাণ সন্ধি। আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) মতো কবি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও বিজ্ঞানচেতনার সমন্বয়ে পূর্ণদর্শন গড়ে তুলতে চেয়েছেন কিন্তু তা রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথকধর্মী হয়েছে।নতুনের প্রবর্তনায় অমিয় চক্রবর্তী 'অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম রহস্যে' সঞ্চরণ করেছেন। নতুন কালের বেদনা ও প্রেরণাকে তিনি ভাষারূপও দিয়েছেন স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বুর্জায়া বাস্তবতার ভাঙন, অনিশ্চয়তা, উল্লম্ফন ও বিপর্যয়কে রূপ দিতে ব্যবহার করেছেন টেলিস্কোপিয় শব্দ। শব্দার্থতত্ত্বে বিপর্যয়, মিতব্যয়িতা, উল্লম্ফন, পরিভাষার বহুল ব্যবহার ও যান্ত্রিক চিত্রকল্প ব্যবহারে, নুতন যুগের প্রবর্তনা লাভ করেছে আঙ্গিক সাফল্য। আইজেনস্টাইনিয় দ্বান্দ্বিক সিনেমার ধরনে কবি আপাত অসংলগ্ন এমনকি পরস্পরবিরোধি শব্দ প্রতিস্থাপন করে, সংঘর্ষজাত সিনথেসিস তৈরি করেছেন। উল্লম্ফনের কৌশলে পূর্বাপরতা, ক্রমবিন্যস্ততা রক্ষিত হয়নি; রূপায়িত হয়েছে যুগীয় চাঞ্চল্য ও যুক্তিহিনতা। বাকরীতি ও কাব্যরীতির মিশ্রণ করতে গিয়ে বুদ্ধদেব পংক্তিতে এনেছেন বিস্তৃতি, অমিয় চক্রবর্তী ভাঙা পয়ার ব্যবহার করেছেন। গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে পদ্যের ঝিলিক দেয়া প্রচ্ছন্ন মিলের রচনাতে-কবি বোধ

করেছেন স্বাচ্ছন্দ্য। আর তাই কবি কখনো অতন্দ্রিলার খোঁজে চষে বেড়িয়েছেন 'নদী' বলছেন-

কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না !দুটোকথা শোনা দিকি
এই নাও -এই চকচকে ছোটো, নুতন রূপোর সিকি
ছোকানুর কাছে দুটো আনি আছে, তোমারে দেবো গো তা-ও,
আমাদের যদি তোমার সঙ্গে নৌকায় তুলে নাও।
নৌকা তোমার ঘাটে বাঁধা আছে -যাবেকি অনেক দূরে?
পায়ে পড়ি, মাঝি, সাথে নিয়ে চলো মোরে আর ছোকানুরে
আমারে চেনো না? মোর নাম খোকা, ছোকানু আমার বোন
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা মেঘনা-পদ্মা-শোন।
দিদি মোরে ডাকে গোবিন্দচাঁদ, মা ডাকে চাঁদের আলো,
মাথা খাও, মাঝি, কথা রাখো !তুমি লক্ষী, মিষ্টি, ভালো!
বাবা বলেছেন, বড় হয়ে আমি হব বাঙলার লাট,
তখন তোমাকে দিয়ে দেব মোর ছেলেবেলাকার খাট।
চুপি-চুপি বলি, ঘুমিয়ে আছে মা, দিদি গেছে ইস্কুলে,
এই ফাঁকে মোরে-আর ছোকানুরে -নৌকোয়া লও তুলে।
কোন ভয় নেই – বাবার বকুনি তোমাকেহবে না খেতে
যত দোষ সব, আমার -না, আমি একা ল'ব মাথা পেতে।
নৌকো তোমার ডুবে যাবে নাকো, মোরা বেশি ভারি নই,
কিচ্ছু জিনিস নেবো না সঙ্গে কেবলঝন্টু বই।
চমকালে কেন !ঝন্টু পুতুল, ঝন্টু মানুষ নয়,
একা ফেলে গেলে, ছোকানুরে ভেবে কাঁদিবে নিশ্চয়।
অনেক রঙের পাল আছে, মাঝি? বাদামী? সোনালী? লাল?
সবুজও? তা হলে সেটা দাও আজ, সোনালীটা দিয়ো কাল।
সবগুলো নদী দেখাবে কিন্তু। আগে চলো পদ্মায়,

দুপুরের রোদে রূপো ঝলমল সাদা জল উছলায়

শুয়ে' শুয়ে' – মোরা দেখিব আকাশ -আকাশ ম-স্ত বড়,

পৃথিবীর যত নীল রঙ -সব সেখানে করেছে জড়।

মায়ের পূজোর ঘরটির মত, একটু ময়লা নাই,

আকাশেরে কে যে ধোয় বারবার, তুমি কি জানো তা ভাই?

কালো-কালো পাখি বাঁকা ঝাঁক বেঁধে উড়ে চলে যায় দূরে,

উঁচু থেকে ওরা দেখিতে কি পায় মোরে আর ছোকানুরে?

রূপোর নদীতে রূপোর ইলিশ -চোখ ঝলসানো আঁশ,

ওখানে দ্যাখো না -জালে বেঁধে জেলে তুলিয়াছে একরাশ।

ওটা চর বুঝি? একটু রাখো না, এ তো ভারি সুন্দর।

এ যেন নতুন কার্পেট বোনা !এই পদ্মার চর?

ছোকানু, চল রে, চান ক'রে আসি দিয়ে সাত-শোটা ডুব,

ঝাঁপায়ে-দাপায়ে টলটলে জলে নাইতেফুর্তি খুব।

ইলিশ কিনলে? আঃ, বেশ বে তুমি খুব ভালো, মাঝি

উনুন ধরাও ছোকানু দেখাবে রান্নার কারসাজি।

খাওয়া হ'লো শেষ -আবার চলেছি, দুলছে ছোট্ট নাও,

হাল্কা নরম হাওয়ায় তোমার লাল পালতুলে দাও।

আমর দু'জন দেখি ব'সে ব'সে আকাশ কত না নীল,

ছোট পাখি আরো ছোট হ'য়ে যায় -আকাশের মুখে তিল

সারাদিন গোলা, সূর্য লুকালো জলেরতলার ঘরে,

সোনা হ'য়ে জ্বলে পদ্মার জল কালো হ'লো তার পরে।

সন্ধ্যার বুকে তারা ফুটে ওঠে -এবার নামাও পাল

গান ধরো, মাঝি; জলের শব্দ ঝুপঝুপ দেবে তাল।

ছোকানুর চোখ ঘুমে ঢুলে আসে -আমি ঠিক জেগে আছি,

গান গাওয়া হ'লে আমায় অনেক গল্প বলবে, মাঝি?

শুনতে-শুনতে আমিও ঘুমাই বিছানা বালিশ বিনা-

মাঝি, তুমি দেখো ছোকানুরে, ভাই, ও বড়োই ভীতু কিনা

আমার জন্য কিচ্ছু ভেবো না, আমিই তো বড়োই প্রায়,

ঝড় এলে ডেকো আমারে -ছোকানু যেন সুখে ঘুম যায়।

১৪.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর

১- বাংলার পাঁচ কবি হিসাবে কারা পরিচিত?

বাংলার পাঁচ কবি হিসাবে যথাক্রমে- জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু,প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, এবং অমিয় চক্রবর্তী।

২- বাংলা সাহিত্যে দুখিবাদী কবি হিসাবে কে পরিচিত?

বাংলা সাহিত্যে দুখিবাদী কবি হিসাবে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পরিচিত।

১৪.৪ অনুশীলনী প্রশ্ন

১- বাংলা কবিতায় দার্শনিক বিপ্লবের সূত্রপাতের বিবৃতি তুলে ধর।

২- বাংলা কবিতায় সাম্যবাদ এর বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

করোক পত্রিকা,

বংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।